প্রচ্ছদ-পট

এক

আজ দু'মাস ধরে' শ্রীপর্ণা ভাবছে—ভুগছে ভাবনার পৌনঃপুনিক অসহমানতা থেকে। এক মুহূর্ত্তও তার স্বস্তি নেই। উঠতে-বসতে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে সব সময় সে ভাবছে : করা কি না-করা, হওয়া কি না-হওয়া—মানুষের সেই আদিম, অনধিগম্য জিজ্ঞাসা। মেঘলা করে' আছে তার সমস্ত মন চিন্তার ঘোলাটে কুয়াসায়, মুখে-চোখে স্বাভাবিকতার আভা থাকলেও অন্তরের অগোচর অন্ধকারে সে পুড়ছে, পুড়ছে তার ভয়াবহ নির্জ্জনতায়। পায়ের নিচে যেন আর তার সমতল মাটি নেই, দুলছে সে সন্দেহে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে প্রতি মুহূর্ত্তের চূড়ায়, চলে' এসেছে তার চেতনার একটা আতঙ্কিত অস্পষ্টতার মধ্যে। দৈনন্দিন কাজের অবিরমমাণ স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সে তার শরীর—যেন রাশীভূত নির্জ্জীবতার ভার, কিন্তু মন তার অনুপস্থিত। দিনের প্রায় সমস্তটা কাটে তার স্কুলে, একটানা কাজের লাইন ধরে', এবং প্রতিক্ষণেই মনে হয় কতোক্ষণে সে বাড়ি ফিরতে পাবে তার নির্ম্মল কর্ম্মহীনতায়, সম্পূর্ণ দেখতে পাবে নিজেকে নিজের

বিশাল পরিব্যাপ্ত প্রশান্তিতে; কিন্তু বাড়ি ফিরে এসেই সে হাঁপিয়ে ওঠে তার এই ভয়ঙ্কর আলস্যে, দেয়ালের পরিধি দিয়ে ঘেরা ছোট ঘরটা একটা ঠাণ্ডা, পরিত্যক্ত গুহার মতো মনে হয়—টিঁকতে পারে না সে, নিজেকে নিয়ে নিজের এই উন্মুক্ত উদ্ঘাটনে। কাজ, আবার কোনো কাজের জন্যে, কাজের মাঝে নিজেকে টুকরো-টুকরো করে' ভেঙে দেবার জন্যে—আবার সে পাহাড়ের কোটরে বন্দী ঝর্ণার জলের মতো ফেনিয়ে উঠতে থাকে। সইতে পারে না সে তার এই অব্যাহত সম্পূর্ণতা। তার আত্মার আতীব্র নগ্নতার সামনে দাঁড়াবার যেন তার সাহস নেই। তাই সে কাজের মাঝে আশ্রয় খোঁজে, কাজের আঘাতে নিজেকে খণ্ড-খণ্ড করে' দিতে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে কাজের নিষ্ঠুর নিশ্ছিদ্রতায়। কিন্তু কাজ এসে ফের সমাপ্তি খোঁজে অসহায় ক্লান্তির অন্ধকারে, সমস্ত খণ্ড-খণ্ড, হারানো ব্যক্তিত্ব তখন, সে-অন্ধকারে, একে-একে আবার সুষীমায় সাবয়ব হ'য়ে ওঠে। শ্রীপর্ণার মুক্তি নেই নিজের অখণ্ডতার থেকে। রাতগুলিই শ্রীপর্ণা বইতে পারে না, সইতে পারে না নিজের কাছে নিজের এই ধরা পড়ে' যাওয়ার লজ্জা। সে-লজ্জা ঢেকে দেবার জন্যে শরীরের উপরে নিয়ে আসে সে ঘুম, ঘুমের জড়িমা, কিন্তু ঘুমেরো শেষ আছে রূঢ় জাগরণে, রৌদ্রে শোনা যায় রাতের হাহাকার। দিনের পর দিন শ্রীপর্ণা এমনি একটা অব্যবস্থার মধ্যে বাস করছে কী যে করা যায় কিছুই সে ঠিক করতে পারছে না। এমন কেউ নেই যে তার থেকে সে একটা পরামর্শেরো সান্ত্বনা পেতে পারে—এরা তার নৈকট্য পেতে পারে, কিন্তু সান্নিধ্য কেউই নয়—তা ছাড়া

এ-সমস্যাটা পরের পরামর্শে সমাধেয় নয় মোটেই—এ তার নিজের হওয়া বা না-হওয়া নিজের নিভৃত একাকীত্বে। এ তার নিজের মাঝে নিজের ফুটে-ওঠা, নিজের নিগূঢ় অন্ধকারে, শাখায় নয়, শিকড়ে, উৎসারে নয়, গভীরতায়। জনতার মুখের দিকে চেয়ে অরণ্যে পুষ্পোদ্রেক হয় না।

আসলে ঠিক করবার কিছুই নেই, শ্রীপর্ণার সাধ্য কী সে নিজে ঠিক করে? সে বাহিত হ'য়ে চলেছে তার অশরীরী আত্মদৈত্যের দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে, তাকে অতিক্রম করবার তার শক্তি কোথায়, কী-বা তার অধিকার? তাকে যেতেই হ'বে তার পরিপূর্ণতার সন্ধানে, অলক্ষ্য মৃত্যুর আশ্চর্য্য ক্রমসন্নিহিততায়: সময়ের পরিপ্রবাহের কাছে তার ইচ্ছা আর কতোটুকু? সে প্রেরিত, নির্ব্বাচিত, উৎসর্গীকৃত: যেতেই হ'বে তাকে তার পরমতম প্রশ্নের প্রণিধানে, দু' হাত ভরে' নিতেই হ'বে তাকে তার বাঁচবার দায়িত্ব, তার সম্পূর্ণ হ'বার ভার, জীবনের ঐশ্বর্য্যের প্রচুরতা। বিচার করবার কিছু নেই, জীবন মৃত্যুর চেয়েও দুর্দ্ধর্ষ, মৃত্যুর চেয়েও অপ্রতিরোধ্য, অবশ্যম্ভাবী অবসানের চেয়েও অনস্বীকার্য্য। মৃত্যু যদি আমরা বাছতে পারি না, জীবনকেও করতে পারি না নির্ব্বাচন, তাকেও দিতে পারি না খর্ব্বিত একটা সীমা, নিয়ে আসতে পারি না নির্দ্দিষ্ট কোনো নমুনায়। তার কাছে বিনিঃশেষ সমর্পণই আমাদের বাঁচা, ইচ্ছাটা সেখানে ক্ষতের মতোই গ্লানিকর, কী তোমার ইচ্ছে আছে কেমন করে' তুমি মরবে? যেমন তোমার পরিপার্শ্ব, তেমনি তোমার প্রতিক্রিয়া: যেমন তোমার আলো, তেমনি তোমার প্রসারণ। ভেবে কী

তুমি ঠিক করবে—ঠিক করবার আছে কী? আকাশে যদি সূর্য্য উঠে থাকে, তবে তোমার ঘরের দুয়ার-জানলা খুলে দাও; যখন সূর্য্য আবার অস্তমিত, বন্ধ করে' দাও একে-একে, ঘন তপ্ত করে' তোলো তোমার বিগলিত অন্ধকার। স্বীকার করো, গ্রহণ করো, আহরণ করো জীবনের মর্য্যাদা, তপ্ত, সঙ্ক্ষিপ্ত ক'টি মুহূর্ত্তে। শ্রীপর্ণাও কিছু ঠিক করতে পারলে না। নিরঞ্জনের কাছ থেকে বৃথাই সে আরো ক'টা দিন সময় চেয়েছে।

নির্জ্জন, নির্জ্জন—প্রতি নিশ্বাসে শ্রীপর্ণা নিঃসঙ্গ। শীতের শুকনো, ধারালো রাতে বারান্দায় চেয়ার টেনে শ্রীপর্ণা একা বসে' ছিলো। তীক্ষ্ণ তারায় কালো আকাশ ইস্পাতের পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। হাওয়া নেই, কুয়াসা নেই, একটা নিরবয়ব, প্রেতায়িত ঠাণ্ডা। দূরে-দূরে সাদাটে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভিজছে, ছাইয়ের একটা ফোঁটার মতো দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের একটা ঢিপি। শালগাছের শুকনো পাতা ঝরছে স্তব্ধতার নিশ্বাসের মতো। সমস্ত রাত্রি সমর্পিত, প্রশান্ত, অনুভূতিহীন বিরাট শূন্যতায় প্রক্ষিপ্ত। আকাশ গলে' পড়ছে শিশিরে, সুকোমল ঘুমের মতো অন্ধকার—শীতে কুঁকড়ে, হাঁটু দু'টো বুকের কাছে গুটিয়ে শ্রীপর্ণা যেন তার অস্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা মুছে ফেলতে চাইছিলো। তার ভয় করছে আকাশের এই বিশাল উন্মোচনে, রাতের এই শব্দময় স্তব্ধতায়। কিন্তু সত্যি কিসের ভয়, এই ভয়ই তো সকল বিস্ময়ের স্বাদ, আলোর পিছনে ছায়ার মতো ভালোবাসায় এই ভয়ই তো আনে সম্পূর্ণতা, জীবনের শেষে মৃত্যুর সান্ত্বনার মতোই তো এই ভয়ের রহস্য—

প্রচ্ছদ-পট

কিসের তার ভয়, যতোক্ষণ আকাশে আছে এতো তারা, পৃথিবীতে এতো জায়গা, যতোক্ষণ নিরাপদ আশ্রয়ের মতো দূরে ঐ বন আছে দাঁড়িয়ে। শ্রীপর্ণা চঞ্চলতায় ঝলমল করে' উঠে দাঁড়ালো ধূসর পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদের চকিত উন্মীলনের মতো। হ্যাঁ, কিসের তার ভয়, সত্যি এতোদিন সে কিসের ভয় করছিলো? শ্রীপর্ণা হাতড়ে বেড়াতে লাগলো মনের অন্ধকার। এক—আদিত্য,—ও! তার জন্যেই সে এতো ভয় করছে নাকি? শ্রীপর্ণা অন্ধকারে নিজের মনে হেসে উঠলো। আর? আবার কী? লঘুতায় শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর যেন কুয়াশার মতো উড়ে চলেছে। আদিত্য,—আদিত্যর জন্যে, তার আবার কিসের ভাবনা?

দুই

শ্রীপর্ণার বিয়ে হয় চোদ্দ বছর বয়সে, একমুঠো মেয়ে তখন শ্রীপর্ণা, স্তিমিত মোমের আলোর মতো নরম, মিঠে তার শরীর, গোধূলির প্রথম তারাটির মতো গা ভরে' তার কৈশোরের নতুন ধূসরতা, দু'টি বড়ো-বড়ো চোখ নিরীহ নির্ম্মলতায় সব সময়েই একটু সজল, সমস্ত মুখখানি গ্রামের দুপুরের মতো কেমন যেন একটু উদাস, ছায়াভরা। শরীর বেয়ে কৃশতার ধারাটি বালির বিছানায় পাহাড়ি নদীর মতো আঁকাবাঁকা রেখায় ঝির্‌ঝির্ করে' বয়ে' চলেছে। ঘুঘুর পাখার মতো লঘু, নরম দু'খানি পায়ে সব সময়েই সে উড়ে' বেড়াচ্ছে। হাতের উপর যেমন জল ধরে' রাখা যায় না, তেমনি সে আঁটছে না তার শরীরে, থেকে-থেকে উছলে পড়ছে পিছল চঞ্চলতায় [illegible] খুসিতে তখন সে প্রায় একটি ঝিঁঝিঁ পোকা, অকারণ খুসিতে। শ্রীপর্ণার যখন বিয়ে হয়, তখন সে ধানের শীষের মতো সবুজ, নতুন বৃষ্টির মতো নির্ম্মল, ঘরের কোণে মাটির বাতির মতো মিটিমিটি।

বিয়ে হয় তার ভালো ঘরে, বংশ ও অর্থের গৌরবে যে-ঘর

ভালো। প্রিয়লালবাবু সে-বছর সাব্‌জজি থেকে রিটায়ার করে' বাড়ি ফেঁদেছেন কল্‌কাতায়, তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে ক্ষীরোদ সে-বছর গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে বেরিয়ে ল-তে ঢুকেছে। তার আর-আর দাদারা মোটা মাইনেতে ঝক্‌ঝক্ করছে, কেউ কল্‌কাতায়, কেউ বরোদায়, কেউ-বা কুচবিহারে। শ্রীপর্ণার বাবা পশুপতি ঘোষ নীলফামারিতে টিম্‌টিম্ করে' ওকালতি করে, একদিন তাঁরই বৈঠকখানায় শ্রীপর্ণাকে প্রিয়লালবাবু খামোকা দেখে ফেললেন। শ্রীপর্ণা তখন ফ্রক ছেড়ে নতুন সাড়ি ধরেছে, কিন্তু গা ভরে' তখনো তার বহুলীকৃত বিশৃঙ্খলাকে শাসন করতে শেখে নি। এলোমেলো আঁচলের ভারে মেয়েটি যেন ঘন বনের আড়ালে সূর্য্যের অস্ত যাওয়ার মতো করুণ। পৌষের নতুন আমের বোলের মতো কচি, মিঠে তার মুখখানা প্রিয়বাবু অনেক দিন ভুলতে পারেন নি। তাঁর রিটায়ার করে' কল্‌কাতায় এসে থিতিয়ে বসা পর্য্যন্ত। তারপর ক্ষীরোদের বিয়ে করার সময় হ'লে—সময়টা অবিশ্যি প্রিয়বাবুরই সূক্ষ্ম চোখে ধরা পড়লো—বলা-কওয়া-নেই হঠাৎ তিনি পশুপতিকে স্মরণ করলেন। সম্মান-পুরঃসর, সবিনয়ে লিখলেন, যদি বাধা বা কোনো আপত্তি না থাকে, শ্রীপর্ণাকে তিনি নিজের খরচায় প্রথামতো একবার দেখে আসবেন, এই আসচে ইষ্টারে। পশুপতি ঢেউয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো। শ্রীপর্ণার মা মারা যাবার পর সে আবার বিয়ে করেছিলো বটে, কিন্তু তার প্রথম প্রেমের পরিপূর্ণতম পরম-পরিণাম হিসেবে শ্রীপর্ণাই ছিলো তার কাছে বেশি মূল্যবান। এ-পক্ষপাতিতা তার শ্রীপর্ণাকে ততো নয়, যতো তার যৌবনের প্রথম শিহরায়মানতাকে। শ্রীপর্ণা তার

জীবনে প্রথম ভোর হওয়া, তার প্রথম উত্তরণ: তাকে যে সে অনাহূত এতো খুসি করতে পারবে এ-কথা সে ভাবতেও পারতো না। ইষ্টারের ছুটিতে প্রিয়বাবু দেখতে এলেন শ্রীপর্ণাকে—লেফাফাদুরস্ত দেখা। শ্রীপর্ণা এসে দাঁড়ালো ঠাণ্ডা, সাদা একখানি সাড়িতে, সাড়ি এবার তার গায়ে সঙ্কীর্ণ, সঙ্ক্ষিপ্ত হ'য়ে এসেছে, একমেটে প্রতিমার মতো নির্ব্বাপিত, প্রশান্ত সেই শ্রীপর্ণা—কিন্তু এক্ষুনি সেখান থেকে পালাতে পারলেই যেন সে বাঁচে, ঘন বর্ণের মাঝে হাওয়ার কাতরতার মতো তার সর্ব্বাঙ্গে দ্রুততা ফেলছে দীর্ঘশ্বাস। আগের চেয়ে অনেক সে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে, জল পেয়েছে স্রোত, রূপ পেয়েছে রেখা; কোণে-কোণে কৃশতা উঠেছে ধারালো হ'য়ে। এক-কথায় প্রিয়বাবু মত দিয়ে ফেললেন, শুকনো গলায় পশুপতি দীর্ঘ একটা ঢোঁক গিল্‌লো। তার মনে হ'লো, আগেই সে ভেবে রেখেছিলো, অভ্রান্ত ভেবে রেখেছিলো, শ্রীপর্ণা তার সঙ্গে করে' ভাগ্যের দক্ষিণ মুখের প্রসন্নতা নিয়ে এসেছে, জীবনে এক দিকে যে ক্ষতি ঘটে, সেটা একটা প্রতিবেশী পরিপূরণেরই সঙ্কেত ছাড়া কিছু নয়। পাঁজির পৃষ্ঠা বেশিদূর এগোতে হ'লো না, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই দিন রয়েছে ক'টা পাশাপাশি। যদি বাধা বা কোনো আপত্তি না থাকে, প্রিয়বাবু নিকটতম তারিখের উপর আঙুল রাখলেন, তাঁরা সদলবলে এসে পড়েন নীলফামারি। দাবি-দাওয়া কিছু নেই পশুপতির আবার আপত্তি! থ্যাঁদা নাকে আবার নথ!

ব্যাপারটা যে কী হ'লো, শ্রীপর্ণা প্রথমটা কিছু দিশে করতে পারলো না। ভারি-ভারি গয়নায় সারা গা তার গরম হ'য়ে

উঠেছে, সাড়ি-ব্লাউজের বোঝায় হেঁট হ'য়ে বসে' থাকার নীরব নিপীড়নে। বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে' কালবোশেখীর শুকনো একটা ঝড় উঠেছিলো, সিঁদুরে আমের বাগানে কতো আম পড়েছে না-জানি। এ-সব ফেলে-ছড়িয়ে রান্নাঘর থেকে কালি-পড়া লণ্ঠনটা কুড়িয়ে নিয়ে পাছ-দুয়ার দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়তে পারলে—যেন সে রক্ষা পায়, তার গায়ে বাতাস লাগে। কতো রাতে যে সে ছাড়া পাবে তার ঠিক নেই, এদের ঘ্যানর-ঘ্যানর আর ফুরোয় না। কোঁচড়ে করে' আমগুলি কুড়িয়ে এনে পরে এসে পিঁড়িতে বসলে কী ক্ষতি হয়েছিলো! ঘরে যেতে পারলো রাতের প্রায় একযুগ পরে, অন্য দিন যখন সে এর মধ্যে দিব্যি এক ঘুম দিয়ে নিরুদ্বেগে পাশ ফিরেছে। বাড়িতে এতো ধুমধাড়াক্কা—আর কিনা তাকে নিয়েই এতো, অথচ এক ফোঁটা জলও সে এ-পর্য্যন্ত ঠোঁটে ঠেকাতে পায় নি! এতোক্ষণে মা তার মুখে একটা সন্দেশ ভাঙলেন, কাচের গ্লাশে করে' আনলেন একটু ঘোলা ডাবের জল। যথেষ্ট। সহর-শুদ্ধ সবাই এসে দল বেঁধে দিস্তে-দিস্তে লুচি উড়িয়ে গেলো, আর কী অপরাধ করেছে সে, সে শুধু রইলো উপোস করে'। মেঝের উপর কা'র-না-কা'র একটা মস্ত বিছানা ছিলো ঢালা, শ্রীপর্ণা তার উপর ভেঙে পড়লো ঘুমে, জড়িমায়। এতোতেও তার শ্রান্তি নেই। ওখানে সে শুতে পাবে না, তার জন্যে বার্নিশ-করা নতুন খাটে মোটা জাজিমের উপর পুরু, নরম তোষকে ধব্‌ধবে বিছানা করা হয়েছে—ভাঙা-ভাঙা ঝাপসা ঘুমের মধ্যে তাকে সবাই একরকম ধরাধরি করে' টেনে নিয়ে গেলো। খাটের আধখানা জুড়ে আরেক জন কে

এরি মধ্যে শুয়ে আছে এক পাশে। তাকে চিনতে শ্রীপর্ণার দেরি হ'লো না, খানিক আগে পিঁড়িতে চড়ে' তারি গলায় সে একটা মোটা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলো। বিছানাটা সে একলা ভরে' তুলতে পারে নি, তারি ধার ঘেঁসে শ্রীপর্ণার জন্যে রয়েছে অনেক জায়গা, অনেক আলস্য। ভয়ে তো শ্রীপর্ণা কুঁকড়ে এতোটুকু হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এই নাকি নিয়ম, এরি জন্যেই এতো ঢাক-ঢোল, এতো হৈ-হাঙ্গামা—চাঁদের চিকণ ফালিটির মতো শীতল, স্তিমিত শীর্ণতায় শ্রীপর্ণাকে কে বিছানায় এঁকে দিলে। চোখের পাতায় তার রাজ্যের ঘুম, সে গেলো ডুবে, মুছে, আপনাতে আপনি হারিয়ে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ব্যাপারটা সে বোঝবারো একটু সময় পেলো না। কিন্তু লোকটি বেশ ভালো বলতে হ'বে, গা ভরে' দিব্যি তাকে ঘুমুতে দিলো, ইচ্ছেমতো এঁকে-বেঁকে মাটির অন্ধকারে গাছের শিকড়ের মতো, মাথার থেকে বালিস সরে' গেলে বারে-বারে লাগলো তুলে দিতে, মুখের থেকে খোঁপা-খসা ছেঁড়া চুলের টুকরো, যাতে খাট থেকে না [illegible]য় মাটিতে পড়ে' যায় মাঝে-মাঝে হাত বাড়িয়ে টেনে আনতে [illegible]গা বিছানার নিভাঁজ মাঝখানে। ঘুমের জলে আগাগোড়া সে [illegible] যাচ্ছিলো বটে, কিন্তু অস্পষ্ট টের পাচ্ছিলো তার ঘুমের কিনারে [illegible] প্রতীক্ষা [illegible]ছে প্রখর হ'য়ে—বন্ধ ঘরের ছোট জানলা থেকে দেখা আকাশের নীল দূরত্বের মতো। ঘুমের ঢেউ দিয়ে বারে-বারে লোকটিকে সে ছুঁয়ে যেতে লাগলো। রাত যতো ঘনিয়ে আসে, ঘুমের নিভৃত তলা থেকে শ্রীপর্ণার ততোই যেন কেন মনে হয়, একে আমার আর

কোনো ভয় নেই, একে আমি চিনি, একে আমি যেন কোথায় দেখেছি।

তবু, এখানেও শেষ হ'লো না। তাকে কল্‌কাতায় যেতে হ'বে। সবাইকে ছেড়ে যেতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো বটে, কিন্তু যাচ্ছে সে কল্‌কাতায়, 'গলি-গলিতে এলোমেলো, বিশাল কল্‌কাতায়, শব্দ ও ধুলোর উড়ন্ত একটা ঝড়ের মধ্যিখানে, ভাবতে তার কিশোর-কল্পনা দুই চোখে উদ্দাম পাখা মেলে দিয়েছিলো। এবং এই সুযোগে সে প্রথম এবার ট্রেন চড়বে। নিরবয়ব, অনিশ্চিত একটা ভয়ের মধ্য দিয়ে যে-সুখ ভীরু চোখে থেকে-থেকে উঁকি মারছে, তার আকর্ষণের বুঝি তুলনা নেই। লটবহরের সে কী একটা পাহাড় এসে জমলো প্ল্যাটফর্মে, কামরাটা বোঝাই হ'য়ে উঠতে লাগলো ট্রাঙ্ক-বাক্সে, বালিসে-বিছানায়—একপাশে, বেঞ্চির শেষ কোণে জানলার ধারে পা গুটিয়ে সাড়িতে-সেমিজে জড়োসড়ো হ'য়ে বসলো এসে শ্রীপর্ণা, অপরাধীর মতো। আশ্চর্য, ঘুমের অন্ধকারে চেনা সেই লোকটি কখন ভিড় সরিয়ে ঠিক তার পাশটিতেই এসে বসেছে। শ্রীপর্ণা যেন আর বিদেশীদের মুখে পড়ে' নেই, যেন হাতের কাছেই আছে তার আপনার [illegible] এমন লোক যার সঙ্গে কথা না কইলেও কথা বলা হয়, যে [illegible] বসে' থাকলেই মনে হয় কোথাও [illegible] এতোটুকুও ভয় নেই। গাড়ি ছেড়ে দিলো, কোথায় না-জানি শ্রীপর্ণা চলেছে, ফেলে তার এই ঘরে-ফিরে-যাওয়া সবুজ সন্ধ্যাকাল, বাড়ির পিছনে বিশাল তাদের সেই আমবাগানের ছায়া, শীতে সেই ভোররাতে উঠে পুকুর-ঘাটে গিয়ে তার কলার খোলা ভাসানো। তার চোখের

সামনে দিয়ে মাঠের পর মাঠ যাচ্ছে ঘুরে, বেণীর ফাঁকে-ফাঁকে আঁকাবাঁকা ফিতের মতো বনের ফাঁকে-ফাঁকে ছোট-ছোট নদী, গাছ-পাতার আড়ালে তারি মতো মাথায় ঘোমটা টেনে ছোট-ছোট গ্রামগুলি কেমন নিঝুম হ'য়ে দাঁড়িয়ে। এ-সব ফেলে কোথায় না-জানি সে যাচ্ছে, কেনই বা যে যাচ্ছে তা তাকে কে বলবে? এতোক্ষণে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে উঠোনময় ছুটোছুটি করে' সে ঘরে ফিরেছে, দু' হাতের সঙ্গে হাঁটু জড়িয়ে মা'র কোলের কাছে বসে' বেঁধে নিয়েছে চুল, লণ্ঠনে ভরেছে তেল, সন্ধ্যা দিয়েছে ইঁট-বাঁধানো তুলসীতলায়। এখন যেন তা বিশ্বাস করতেও সাহস হয় না। সে-বাড়ি তার বাড়ি নয়, সেই সন্ধ্যাকালটি তার নিজের জন্যে তৈরি হয় নি, আর কা'র হাতের বাতি পেয়ে তুলসীতলাটি তেমনি ঝক্‌ঝক্ করে' উঠেছে। শুধু সে-ই সেখানে নেই, শুধু তারই সেখানে বাসা নয়।

এতোটা শ্রীপর্ণা ভাবতেও পারতো না। তাকে নিয়ে যেন একশো হাতে কাড়াকাড়ি পড়ে' গেলো। ক্ষীরোদসমুদ্র থেকে লক্ষ্মী উঠে এসেছে। কী সে উপহারের ঘটা, তার শোবার ঘরটা দাঁড়িয়ে গেলো একটা মিউজিয়মে। সমস্ত ব্যাপারটা শ্রীপর্ণার চোখে একটা ভীমকায় সম্পৎশালিতার চেহারা নিয়ে বসলো। ছেলেবেলায় কোনকালে বাবা তাকে এক বাক্স সাবান এনে দিয়েছিলেন, সাবানগুলি ফুরিয়ে গেলেও বাক্সটা সে অনেকদিন রেখে দিয়েছিলো লুকিয়ে, যখনই লোভ হ'তো, সে বাক্সটার গন্ধ শুঁকতো—সে-ই ছিলো তার এতোদিনের একমাত্র ঐশ্বর্য্য। আজ তার উপরে সমস্ত আকাশ যেন

ছড়িয়ে পড়েছে। লোকে সাধে কি আর কল্‌কাতা বলে? কল্‌কাতা না হ'লে কি কেউ এতো ভালোবাসে, এত জিনিস দেয়, সব সময় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে? বাড়িতে সে এক হাতে বড়ো-বড়ো বালতি করে' জল তুলে আনতো, লাট্টুর মতো ঘুরে বেড়াতো কাজের লেপ্‌তিতে, কিন্তু এখানে সামান্য পান সাজতে বসে' আঙুলের ডগাগুলো চুনে-খয়েরে রঙিন করাও তার বারণ। তাই, তাই সবাই বিয়ে করে, তাই বিয়ের নামে মেয়েরা সবাই মধুর হ'য়ে ওঠে—এতোদিনে শ্রীপর্ণা বুঝতে পারলো। সত্যি, শাড়িগুলির কী কামদার পাড়, গয়নাগুলির কী অসম্ভব চেকনাই! এতো জিনিস সে রাখবে কোথায়? শ্বশুরমশাই কিনে নিয়ে এলেন প্রকাণ্ড একটা আলমারি, আয়না দেয়া, চাবি দিয়ে গেলেন তার নিজের আঁচলে বেঁধে। পেয়ে-পেয়ে সমস্ত পৃথিবী যেন সে ফুরিয়ে দেবে! এতোতেও কি শেষ আছে পাওয়ার? তারপর রাত্রের অন্ধকারে আবার তার পাশে জেগে ওঠে নতুন সূর্য্য, আলোয় তার সমস্ত আকাশ আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। রোদ পেয়ে পাখির মতো সে এখন চোখ খুলতে পেরেছে। আগে-আগে তার ভীষণ লজ্জা করতো, কিন্তু লজ্জায় যে এতো মধুরতা, এতো অসহ্য মাধুর্য থাকতে পারে, তা শ্রীপর্ণার আগে আর কে জেনেছে? মুখে তার আগে কথা ফুটতে চাইতো না, কিন্তু এমন একজন তার পাশে শুয়ে আছে যার সঙ্গে কথা না বলে' বেশিক্ষণ চুপ করে' থাকে তার সাধ্য কী। আর, কী-বা সব কথা! তার কি ভাষা আছে না কেউ তার মানে বুঝতে পারে?

এমন দুষ্টু লোক শ্রীপর্ণা ত্রিভুবনে কোথাও দেখে নি। তার

এতো-যত্নে-বাঁধা ফাঁপানো খোঁপাটা খুলে-ভেঙে পিঠময় ছড়িয়ে না দিলে তার স্বস্তি নেই। ঘুমে চোখ আসছে ভারি হ'য়ে, ফুলের পাপড়ির উপর প্রজাপতির পাখার মতো, কিন্তু এমন সুন্দর, ঠাণ্ডা অন্ধকার, এমন সুন্দর সবাই এখন চুপ করে' গেছে, এমন সুন্দর বাইরে শিশির ঝরে' পড়ছে ঘাসের উপর, এর মধ্যে কেউ কি কখনো ঘুমোয়? ওঠো, ওঠো পর্ণা, বৃষ্টি আসছে, আকাশে ছাড়া পেয়েছে শুঁড়-দোলানো বুনো হাতির দল, কালো অন্ধ একটা শকুনের মতো আকাশ পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে, জাহাজের ডেকের মতো দুলে উঠছে পৃথিবী, ওঠো, জানলায় বসে' এমন বৃষ্টি দেখবে না, বৃষ্টির এই ধারালো, দীর্ঘ ধারা? যদি কোনো রাতে চাঁদ উঠতো বড়ো হ'য়ে, আকাশ গলে' যেতো নগ্ন[illegible], বিছানাটা পেড়ে নিয়ে এসো খাট থেকে, দক্ষিণের নিচু জানলার ধারে, কেননা অতোদূরে খাটের উপরে চাঁদ এসে পৌঁছুতে পারে না। খুব গরম লাগছে কি, পা টিপে-টিপে, নিশ্বাস বন্ধ করে' চুপি-চুপি ছাদে, চিল-কোঠায় উঠে এসো। এমন দুষ্টু লোকের সঙ্গে কে পেরে উঠবে? তার পড়ার উপর বাবার কড়া [illegible] একজামিন কাছে এসে পড়েছে, তবু লুকিয়ে-লুকিয়ে, [illegible]শ ও-পাশ তাকাতে-তাকাতে দিনে-দুপুরেই সে পিছলে ঢুকে পড়তো যে-ঘরে শ্রীপর্ণা [illegible] চেয়ারে বসে' একলা সেলাই করছে। নিঃশব্দে পিছন থেকে এসে তার মাথায় একটা টোকা মেরে টুপ করে' নিচে বসে' পড়তো গুড়ি মেরে। শ্রীপর্ণা চারদিকে চাইতো ফ্যাল-ফ্যাল করে', কাউকে দেখতে পেতো না, আবার চোখ নামিয়ে সেলাই করে' যেতো। অমনি আবার পায়ের পাতায়

কে চিমটি কাটলে। শ্রীপর্ণা এবার সারা শরীরে বেসামাল হ'য়ে উঠতে গেলো ধড়মড়িয়ে, কিন্তু চেয়ার নিয়ে পেছন দিকে ছিট্‌কে প্রায় পড়ে আর কি—তার বেণীর বাড়তি ফিতের সঙ্গে চেয়ারের একটা পায়া কে বেঁধে দিয়েছে আলগোছে। হয়তো ক্ষীরোদ পড়ছে তার টেবিলে, বারান্দার রেলিঙে রোদে-শুকোতে-দেয়া তোষকটা এসেছে শ্রীপর্ণা ফিরিয়ে দিতে, অমনি তার মুখের উপর পাকানো কাগজের ছোট একটা গুলি কে ছুঁড়ে মারলো। কাগজটা তাকে নিখুঁত হাত-সাফাই করে' কুড়িয়ে নিতে হ'লে অবিশ্যি। তাতে কতো সব মাথামুণ্ডু, বে-আইনি কথা লেখা থাকতো। লেখা থাকতো: তোমার জন্যে সেই হলদেপান টক লেবেনচুষ কিনে এনেছি, খাবে তো চলে' এসো টুপ করে'। শ্রীপর্ণাকে তক্ষুনি আবার আরেক প্রস্ত জামা-কাপড় শুকোতে দিতে যেতে হ'তো বটে বারান্দায়, কিন্তু ঘরে নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তার হাতের টিপ ভালো নয়, কাগজটা লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছে তার ভীরু হৃদয়ের মতো ঘরের বাতাসে উড়তে থাকতো এখানে সেখানে। আর ক্ষীরোদের পড়া! জালের থেকে মাছের মতো ছিট্‌কে সে বেরিয়ে পড়তো সেই একটুকরো কাগজের টানে, আকাশ থেকে ঝরে'-পড়া সেই একটুকরো নীলিমার মুক্তি, শ্রীপর্ণার সেই ক'টি আঁকাবাঁকা হৃদয়ের রহস্য। আর কী-ই বা লেখা থাকতো অতো! লেখা থাকতো, শ্রীপর্ণা ধরে' ফেলেছে তার দুষ্টুমি, অক্ষরের কোণগুলিতে তার হালকা হাসি ক'টি টল্‌টল্‌ করছে,—লেখা থাকতো: লেবেনচুষই যদি দেবে, তবে তাই একটা ছুঁড়ে না দিয়ে ঐ একটা কাগজ ছুঁড়ে মারলে কেন?

প্রচ্ছদ-পট

শ্রীপর্ণাকে বার কয়েক বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতে হয়েছিলো: অবিশ্যি, বেড়াতেই বটে। কিন্তু কয়েক দিন যেতেই দিনগুলি আর কাটতে চাইতো না, রাতগুলি উঠলো পাথরের মতো ভার হ'য়ে। এখানে তার অনেক জায়গা, অনেক অবকাশ—দালানে বসে' খড়ি দিয়ে ছক্ কেটে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলো, মেঝের উপর শীতল-পাটি বিছিয়ে বালিসে ভিজে চুল ছড়িয়ে বই পড়ো কোনো নাম-না-জানা লেখকের: এখানে এই সবুজ, দীর্ঘায়িত, মন্থর সন্ধ্যাকাল, মাঠময় রৌদ্রদগ্ধ স্তব্ধতা, দু' চোখ খুলে দেখবার মতো এতো অন্ধকার, তারাগুলি সাপের চোখের মতো উজ্জ্বল, কালো মখমলের উপর ছড়ানো কতোগুলি মুক্তো: এখানে এতো আলো, এতো হাওয়া, এতো ঘুম, তবু শ্রীপর্ণার মনে যেন সুখ নেই। তার ভালো লাগতো, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখা, কল্‌কাতার বাড়ির সেই নিঃশব্দ সিঁড়ি, নিচে দেয়ালের ফোকরে পায়রারা বাসা করেছে, বারান্দার উপর পড়েছে ক'টি রোদের বাঁকা, দীর্ঘ রেখা। হয়তো বাসনওলা চলেছে ঘণ্টা বাজিয়ে, মা পা ছড়িয়ে বসে' কাঁথা সেলাই করছেন, রাস্তায় জল দেবার শব্দ আসছে। এখানে তার কিছুই করবার নেই, যতোক্ষণ ইচ্ছে চুপ করে' শুয়ে থাকো, যতোদূর চোখ যায় চেয়ে থাকো ধূসর দিগন্তের দিকে, [illegible]—শক্তিশালী নিঃশব্দতার দিকে, রৌদ্রের পরিব্যাপী রিক্ততার দিকে, অন্যমনস্ক, শিথিল-শীতল। কিন্তু তার ভালো লাগতো, যদি সে এখন রেলিঙ থেকে শুকনো কাপড় তুলে কুচিয়ে-কুচিয়ে ভরে' রাখতে পারতো আলনা, কুঁজোয় ভরতে পারতো জল—এতোক্ষণ নিশ্চয় কলে জল এসে গেছে—কাজ

করবার ফাঁকে যদি হাল্‌কা পায়ে একটু ঘুর-ঘুর করতে পারতো এখানে-সেখানে, তার পড়ার ঘরের আশে-পাশে। সে যেন সাদা, প্রাঞ্জল খানিকটা গদ্য, তাতে ছন্দের বাধা নেই বলে' নেই আর কোনো সঙ্কেত, নয় আর সে কোনো কবিতা। মাথায় ঘোমটা রাখবারো তার এখানে দরকার নেই, আঁচলটা বাতাসে উড়ছে এলোমেলো। চুল বাঁধবার সময় সিঁড়িতে কা'র পায়ের শব্দের ভয়ে বারে-বারে তাকে চম্‌কে উঠতে হয় না, যতোক্ষণ খুসি, যে ভঙ্গিতে সহজ, শুয়ে থাকতে পারো বিছানায়। পুকুর [illegible]কে ভিজে কাপড়ে উঠোনের রোদে উঠে এসে চুল ঝাড়লে তাকে কে বাধা দেয়, কে বাধা দেয় যদি সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে, গাছে ওঠে ডাঁসা-ডাঁসা পেয়ারা পাড়তে। ইচ্ছে মতো বড়ো-বড়ো হাঁ করে' খেতে পারে সে যতো খুসি, গলা ছেড়ে হেসে উঠতে পারে যখন-তখন, সন্ধে হ'তেই ঘুমে জমে' যেতে পারে নিটোল হ'য়ে। কিন্তু ভালো লাগে না তার এই মুক্ত অকৃত্রিমতা, ভালো লাগে না সব সময় নিজেকে এমনি ভুলে থাকতে। সে যেন সে নয়, উপন্যাসে পড়েছে এমন এক অচেনা নায়িকা।

বাঁচতো না সে এখানে, যদি না মাঝে-মাঝে তার চিঠি আসতো, হপ্তায় অন্তত দু'খানা। খস্‌খসে রঙিন খামের উপর পরিচ্ছন্ন ক'টি অক্ষর। শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর বহুতন্ত্রীকা বীণার মতো উঠতো ঝঙ্কার দিয়ে: সেই একটুকরো চিঠি, যেন বনে-বনে বসন্তের সানন্দ আর্ত্তনাদ নিয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ সে-চিঠি সে পড়তো না, সেমিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতো, বাইরে চেষ্টা

করতো দেখাতে কিছুই যেন হয় নি, কিন্তু যেন বদল হয় নি সংসারের। যেন তেমনি করে' আজো সূর্য্য উঠেছে, গাছে ধরেছে পাতা, পাখিরা করছে ডাকাডাকি। কিন্তু শ্রীপর্ণা এমন দিন আর কোথাও দেখে নি, এমন সূর্য্য ওঠা। এতো বড়ো সূর্য্য, অথচ একান্ত করে' আজ শুধু তারই উপর সে ঝরে' পড়ছে, এতো বড়ো আকাশ, অথচ সে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে তার সাড়ির আঁচলে। অনেকক্ষণ সে-চিঠি সে পড়তো না, নিয়ে যেতো শয্যার নিভৃত, আশরীর অসহ্য শিহরণের মতো খুলে ফেলতো সে চিঠির আবরণ, প্রতিটি অক্ষর মদের ঘন, উত্তপ্ত ফোঁটার মতো ঝরে' পড়তো তার মুখের উপর, কোনোটা বা শিশিরের মতো, ঘুমের মতো, অশ্রুর মতো। এ কেমন ধরনের প্রেমপত্র, তার সমবয়সী সখীরা মাথায় হাত দিয়ে বসতো একেবারে, কোথাও একটা প্রেমের কথা নেই। শতকোটি ছেড়ে গুনে' একটা চুমুও সে পাঠায় নি চিঠিতে। খালি যতো খুঁটিনাটি অবান্তর কথা, বাড়িতে নতুন কে চাকর এসেছে—তার কী নাম, গেলো ছুটে ধোবার বাড়ি থেকে তার ক'খানা কাপড় আসে নি, নিজ হাতে টেবিল্ গুছোতে গিয়ে কেমন করে' সে সেই দোয়াতদানটা ভেঙে ফেলেছিলো, কেমন আজকাল তার জানলার মুখোমুখি উঠছে হলদে চাঁদ। সাহিত্য হিসেবে এ-সব কথার কী দাম : সবাই ঘোরতর সন্দেহ করতে লাগলো শ্রীপর্ণাকে তার স্বামী যথার্থ ভালোবাসে কি না। ঐ চার অক্ষরের কথাটার যে কী অর্থ শ্রীপর্ণা ভেবে কিছু বা'র করতে পারে না, তাই সে অনেক কাটাকুটি করে' চিঠির উত্তর লেখে : ছোট-ছোট বৃষ্টির সবুজ

ফোঁটার মতো মাঠে অগুনতি কী ফুল ফুটেছে, কোথা থেকে কাল তাদের গরুর হয়েছে সাদায়-বাদামিতে বিচিত্রিত একটা বাছুর, হ'য়েই কেমন কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো, পুকুরে নতুন মাছ ফেলেছে, দু'পায়ে জল ছিটোতে-ছিটোতে কতোদুর পর্য্যন্ত সে সাঁতার কেটে আসে একলা। ভালোবাসার কথা সে-ও একটি লিখতে পারে না।

জোয়ারের জলের মতো দিনগুলি জোরে বয়ে' যেতে লাগলো, সমুদ্রের উপর দিয়ে পাখির পাখা-ঝাপ্‌টানির মতো। শ্রীপর্ণা প্রথম থামলো, যখন বছর দুই না-পুরতে জঠরে তার সন্তান এসেছে আদিম মাটির প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে অঙ্কুরায়মান বৃক্ষপ্রাণের মতো। পূর্ব্বাপর ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলো না সচেতন হ'য়ে, শুধু ঘন বনে জ্বলন্ত বসন্ত-বিদারণের মতো সে সৌন্দর্য্যে ঝল্‌মল্‌ করে' উঠলো। নিজের দিকে তাকালো সে মুগ্ধ হ'য়ে। সমস্ত শরীরে যেন সুরভিত একটা নেশা লেগেছে। চোখের কোলে ঘুমে-জড়ানো অলস একটি আবেশ, ধূসর একটি স্বপ্ন। তার আর নেই সেই লীলা, নেই সেই লঘুতা : নতুন পাতার মতো সবুজ, বিশীর্ণ সেই শ্রীপর্ণা কেমন গাঢ়, ঘন, নিটোল একটি ফলের মতো ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠছে! তার এইটুকু শরীরে, একতাল কাদার মতো নরম এই শরীরে কিন্তু এতো রহস্য! তা ভাবতেও যেন ভয়ঙ্কর লাগছে। যেন অন্ধকারে কান্নার আগুনের মতো ফুটে উঠছে তারা, কঙ্করে ফুটছে ঘাস। শুধু স্থূল শারীরিকতা দিয়ে যেন এই বিশাল অনুভূতিকে আয়ত্ত করা যাবে না। শ্রীপর্ণা রাতের জানলার কাছে চুপ করে বসে' রইলো।

সে-মোহ লেগেছিলো ক্ষীরোদেরো চোখে। স্নেহে নরম, ভাবে নিবিড় দু'টি চক্ষু দিয়ে সে তার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে' বলতো: তোমাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে পর্ণা, একমাত্র রঘুবংশের কালিদাসই তা বর্ণনা করতে পারেন। সত্যি, আগে তুমি ছিলে মিঠে, হাল্‌কা একটি বাঙলা সুর, এখন হ'য়ে উঠেছ ছন্দোবদ্ধ, ঘনীভূত একটি সংস্কৃত শ্লোক। পৃথিবীতে এতো রূপ আর যেন কোথাও হ'তে নেই।

কিন্তু আকস্মিক, শ্রীপর্ণা যখন প্রায় মাঝপথ ছাড়িয়ে এসেছে, ঘটলো এদিকে দুর্ঘটনা, প্রিয়লালবাবুর সংসারে আকাশ পড়লো ভেঙে। এক সপ্তাহও কাটলো না, ততোদিনের একটা প্রবল, অত্যাগী জ্বরে ক্ষীরোদ নিশ্চিহ্ন নিভে গেলো। মুহূর্ত্তে কী যে কাণ্ড ঘটে' গেলো, কেউ ধারণা করতে পারলো না, শ্রীপর্ণাও না। দেখতে-দেখতে সমস্ত বাড়িটা কেমন হাড়ের মতো শুকনো হ'য়ে গেলো, ভূতের মতো অশরীরী। সবাইকে কাঁদতে দেখে শ্রীপর্ণাও কাঁদলে, এবং আশ্চর্য্য, সে এতো ছেলেমানুষ, নিজের জন্যে না কেঁদে কাঁদলো কিনা যে মরে' গেছে একান্ত করে' তারই জন্যে। কিন্তু বেশি তাকে কাঁদতে দেয়া হ'লো না, বেশি বৃষ্টিতে যদি শস্য যায় নষ্ট হ'য়ে, তারই শরীরে এখনো আছে ক্ষীরোদের উত্তাপ, তারই রক্তের রশ্মিতে ক্ষীরোদের শেষ হোমশিখা। শ্রীপর্ণা আর কাঁদলো না: আর্দ্র, গভীর, সহিষ্ণু মাটির মতো রোপিত সেই বীজকণাটিকে সে পরম স্নেহে লালন করতে লাগলো।

শুকনো, হল্‌দে, ঝরা-পাতার মতো তার গা থেকে খসে' পড়তে লাগলো একেক করে' গয়নার টুকরো; ক্ষণকালিক

সন্ধ্যারাগের পর তার রঙিন, প্রগল্‌ভ সাড়িগুলি অন্ধকারের মতো সাদা, শূন্য হ'য়ে উঠলো এক নিশ্বাসে। কপালটাকে দেখালো অনেকখানি চওড়া, শরীরটা ঢিলে, চুলগুলি কেমন এলোমেলো। আগে তবু-বা ছিলো হাওয়ায়-ওড়া সবুজ একটি পাতা, এখন হ'য়ে দাঁড়ালো মরা, শুকনো একটা শিকড়। শ্বশুর-শাশুড়ি এরি মধ্যে তার ভীষণ যত্ন নিতে লাগলেন—পাথরের কবরের উপর যেন খানিকটা চুণকাম করা হ'লো। তারপর আদিত্য যখন হ'লো, শ্রীপর্ণা একেবারে ভেঙে গেছে—সে তখন একেবারে ব্যর্থ, তার শরীর তখন শস্য-কেটে-নিয়ে-যাওয়া মাঠের মতোই শূন্য, চিহ্নহীন।

আদিত্য হ'বার পর শ্রীপর্ণা বিস্তৃত বিছানা নিলে। ততোদিন সমানে তার ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হচ্ছে, বুকে নেই এক ফোঁটা দুধ, দেহে নেই এতোটুকু শক্তি। শাশুড়ি বিভাবতী আদিত্যকে বুকের উত্তাপে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলেন। দীর্ঘ নয় মাস পর শ্রীপর্ণা যখন প্রথম উঠে বসতে পারলো, আদিত্যও তখন হাঁটু দুমড়িয়ে অল্প-অল্প উঠে বসতে শিখেছে; দেখা গেলো দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে আদিত্য মা-কে ফেলে ঠাকুমার কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই, এবার, দীর্ঘ বিশ্রাম নিতে শ্রীপর্ণা যখন বাপের বাড়ি ফিরে এলো, ছেলেকে বিভাবতী কিছুতেই সঙ্গে দিলেন না, সে তাঁর এতো ন্যাওটা। রোগা শরীর নিয়ে শ্রীপর্ণা তাকে না পারবে সামলাতে, না বা করতে শুশ্রূষা। আদিত্য তাঁদের কী জিনিস, শ্রীপর্ণা তার বুঝবে কী! বিভাবতী তাকে আঁচলে বেঁধে রাখবেন।

খালি হাতে শ্রীপর্ণা বাপের বাড়ি ফিরে এলো। শত আকাশ

ভেঙে পড়লেও আকাশের নিচেকার লোকদের বাঁচতে হয়, শ্রীপর্ণাও চাইলো বাঁচতে। দেয়ালের ফোকরে ইঁদুরের মতো নয়, নয় টবে পোঁতা বন্ধ্যা পাতাবাহার। পশুপতি তাকে পড়াতে চাইলো, চল্‌তি, আধুনিক অর্থে। নইলে দুই রিক্ত, শূন্য হাতে কোন আকাশ সে আঁকড়ে ধরবে? এই নিয়ে দুই পরিবারে বাধলো একটা সঙ্ঘর্ষ, শ্রীপর্ণার উদ্ধত, দুর্নম্য ভঙ্গি তাতে দিলে ধার। পুত্রবধূর এমন পরিণতি প্রিয়বাবু আশা করেন নি, তার উপর তাঁর সংসারের ছিলো আরো অনেক দাবি, যেন বা আরো অনেক দখল। এমন করে' তাকে খরচের ঘরে ঠেলে দিতে তাঁদের মন উঠলো না। ক্ষীরোদ নেই, নেই; কিন্তু সমস্ত ঘর জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তার স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস, তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীপর্ণা তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সেই দীর্ঘশ্বাসটি অমর করে' রাখুক। তার মলিন, ক্ষুণ্ণ মুখে তাঁরা যেন ক্ষীরোদের তিরোভাবের বেদনাটি পড়ে' নিতে পারেন নিশিদিন। তা ছাড়া, শ্রীপর্ণা শুধু ক্ষীরোদের একার ছিলো না, সে ছিলো সমস্ত পরিবারের, বিশাল অবয়বের বিচ্ছিন্ন একটা অঙ্গ: নিজের জন্যে নিজেকে নির্ম্মাণ করা নয়, পরিবারের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করাই হচ্ছে বিয়ের আদর্শ। অন্তত প্রিয়বাবুর তামাক সেজে দেবার জন্যেও হাতের কাছে একটি লোক দরকার। এটা-ওটা, টুকি-টাকি কতো কী জিনিস আগোছাল হ'য়ে আছে।

শ্রীপর্ণা কোনো কথা কানে তুললো না, সোজা চলে' এলো ঢাকায়, ঢুকলো ইডেন্‌এ, লম্বা পা ফেলে ম্যাট্রিকুলেশান্‌টা পার হ'য়ে গেলো। প্রিয়বাবুর সংসার থেকে ক্ষীরোদ যেন সত্যিই গেলো

হারিয়ে, এমন-কি তার স্মৃতির ঘটলো অপমান। আদিত্যকে তাঁরা মায়ের কাছে ঘেঁসতে দিলেন না। এতে আপাততো শ্রীপর্ণার কিছু সুবিধেই হ'লো যা হোক্, খোলা হাত-পায়ে সময়ের সমুদ্রে যথেচ্ছ সে সাঁতার কাটতে পারলো। হস্‌টেলে থেকে আর কোলে-কাঁখে করে' ছেলে মানুষ করা যেতো না। আপাততো এ ভালোই হ'লো বলতে হ'বে। শ্রীপর্ণা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে, বা রাত জেগে-জেগে বলতে পারো, স্বচ্ছন্দে বি-এটা পাশ করলো, চোখ মেলে পৃথিবীতে খুঁজে পেলো যেন অনেকখানি জায়গা। আর বেশিদূর এগোবার তার সাহস হ'লো না, ওদিকে পশুপতির থলির মুখটা কুঁচ্‌কে এসেছে। শ্রীপর্ণা নিজেই নামলো এবার টাকা-রোজগারের পথে, যাই কেননা বলো এবং যে-কোনো অবস্থাতেই না হোক্, টাকাই হচ্ছে সাফল্যের শীল-মোহর। মাষ্টারি নিয়ে চলে' এলো সে গিরিডিতে।

নেমে এসেছে বিস্মৃতির শীত : পবিত্র, প্রসন্ন বিস্মৃতির। ছাড়া কাপড়ের মতো গা থেকে তার খসে' গেছে অতীতের অন্ধকার, বাসি খবরের কাগজের মতো সে তা ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে। সে চলে' এসেছে আরেক নতুন পৃষ্ঠায়, নতুন নিঃসঙ্গতায়—গ্রন্থকারের যেমন আসা এক উপন্যাস থেকে আরেক উপন্যাসে। তার কাছে বাঁচা অর্থ চলা, সময়ের রেখাটাকে অসমাপ্য দীর্ঘায়মান করে' তোলা অগ্রগমনের তীক্ষ্ণতায়, বসে'-বসে' তার উপর মোটা করে' দাগা বুলোনো নয়। সে-জীবন নকল দাঁতের মতোই ঘৃণ্য, শ্রীপর্ণার কাছে মনে হ'লো। স্মৃতিরো একটা আয়ু আছে, যেমন সব-কিছুরই আছে একটা নিখাদ শেষ। আবার এই

শেষের পরেই আরম্ভ। শ্রীপর্ণাও আবার আরম্ভ করলো, কখন আরম্ভ করলো বলা কঠিন—সময় চলেছে থেমে-থেমে ছন্দ মেপে-মেপে নয়, প্রবহমান প্রবল ধারাবাহিকতায়। সময়ের জলে সময়ের দাগ গেলো মুছে : শ্রীপর্ণা আবার শ্রীপর্ণা। দুঃখ সহ্য করবার মধ্যে সাহস আছে প্রচুর, কিন্তু প্রচুরতরো সাহস আছে সেই দুঃখ প্রত্যাখ্যান করায় : এক নিশ্বাসে শ্রীপর্ণা সে-দুঃখ উত্তীর্ণ হ'য়ে এলো। দেখলো, পৃথিবীতে সবই কেবল জল নয়, আছে দ্বীপ, সবুজ, নির্জ্জন, সূর্য্যময়। শ্রীপর্ণা উঠলো এসে তেমনি একটা দ্বীপে, তার অনুভূতির গভীর নিভৃতিতে।

সুতোটা সে তা বলে' একেবারে ছেড়ে দিতে পারে নি, মাঝে-মাঝে তার আদিত্যর কথা মনে পড়তো, বুকটা উঠতো হু-হু করে'। ইচ্ছে করতো, উন্মত্তের মতো ইচ্ছে করতো, তাকে সে তার দুই উষ্ণ, উচ্ছলিত বুকের উপর চেপে ধরে, তার নির্দন্ত, নিষ্পাপ মুখ সে মুখ দিয়ে পান করে অজস্র। সে তারই শরীরের এক কণা স্বপ্ন, তারই আকাশের একটুকরো রামধনু। তারই গূঢ়তম অন্ধকারে আণবিক সেই প্রাণ সে তিলে-তিলে রঞ্জিত রক্তে সঞ্চীয়মান করে' তুলেছে, তারই জন্যে তার সমস্ত শরীর রাতের অরণ্যের মতো কেঁদে-কেঁদে উঠছে। পড়াশোনার ফাঁকে ছুটি-ছাটা মিললেই সে লুকিয়ে চলে' যেতো কল্‌কাতায়, নতুন বালিগঞ্জে, যেখানে তার শ্বশুর ব্যাঙ্ক ঝেড়ে প্রকাণ্ড বাড়ি ফেঁদেছেন। জানতো, তার জন্যে দরজা সেখানে অবারিত নয়, কেননা সে-বাড়ির দেয়াল তাকে ধরে' রাখতে পারে নি, প্রেতায়িত; ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে-ফেলে তাকে জমিয়ে দিতে পারে

নি অস্বীকৃত কঙ্কালে—যেমন হাতের মুঠোয় জল নিয়ে তাকে এঁটে-এঁটে শক্ত করা যায় না : জানতো সে বাঁচবার প্রয়োজনে, আদিম, মহান প্রয়োজনে, অতীতকে করেছে অস্বীকার, এবং সেই কারণে ও-বাড়ির লোকরা তার উপর অনর্গল নয়,—তবু ও-বাড়িতে আদিত্য আছে, তার শরীরের প্রথম একটুকরো স্বপ্ন, তার অন্ধকারে প্রথম সূর্য্যসঞ্চার, তাকে সে একবার দেখে আসবে। রুক্ষ, কৃশ দেহটির উপর বিষাদে-সাদা সঙ্ক্ষিপ্ত সাড়ি জড়িয়ে শ্মশানের স্তব্ধ নিশ্বাসের মতো যখন সে উঠে আসতো দোতলায়, একে-একে প্রণাম করতো গুরুজনদের, তখন কেউ তার উপর আশীর্ব্বাদে অজস্র হ'য়ে উঠতে পারতেন না বটে, তার শ্বশুর ও শাশুড়ি, ভাসুর বা জা-রা, যাঁরা যে-সময়ে যখন থাকতেন,—কিন্তু আদিত্যকে তার লোভী, ক্ষুধার্ত্ত বুকের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো পিষে ধরতে কে তাকে বাধা দেয়? সবাই দূরে সরে' দাঁড়াতো মুখ গম্ভীর করে', কিন্তু যতো অন্যায়ই সে করুক, যতো অপমান, মা'র স্নেহকে কে অপমান করবে? শুধু বাড়ির সারদা-দাসিই উঠতো লিক্‌লিকে জিভে কল্‌কল্ করে' : কেমনতরো মা তুমি গা শুনি, ছেলে পেটে ধরে' সেই ছেলে ফেলে বই নিয়ে সোহাগ করতে বসেছ? এই সোনার চাঁদ ছেলের চেয়ে ছাই-পাঁশ কতোগুলি বই তোমার বেশি হ'লো? তোমার চোখে ঘুম আসে, মুখে তুমি ভাত তুলতে পারো? কী রাক্ষুসি মা, বাবা! সোয়ামি খেয়ে হাত-পা-ছাড়া হ'য়ে কেউ যে অমন করে' নাচতে পারে এমন ধারা বাপের জন্মে দেখিনিকো।

বিভাবতী মুখ টিপে বলতেন : বেঁচে থাকলে আরো কতো দেখবি, সারদা।

শ্রীপর্ণা এ-সব কথা, অনেক সব কথা, কানেও তুলতো না। আদিত্যকে নিয়ে থাকতো সে বিভোর হ'য়ে, চাঁদকে নিয়ে যেমন রাতের সমুদ্র : শুঁকতো তার সমস্ত শরীর, চুমু খেতো তার সমস্ত গা ভরে'—ক্ষীণ, ছোট ক'টি মুহূর্ত্ত শুধু, আদিত্য উঠতো কেঁদে, হাঁপিয়ে, অস্থির হ'য়ে, মা'র কোল ছেড়ে ঠাকুমা'র কোলে যেতে পারলে সে বাঁচে।

বিভাবতী নাকের মধ্য দিয়ে ধারালো একটা শব্দ করে' উঠতেন : কী আদরের ঘটা! ছেলেটা কেঁদে একেবারে হাট বসালো। ছেলে পেটে ধরলেই আর মা হওয়া যায় না।

সারদা-দাসি কাছে-কাছেই আছে। সেও অমনি সুর ধরতো : বাঁচলে কতো দেখবো আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

ছেলের কান্না থামাতে বাক্স থেকে সে রঙ-বেরঙের খেলনা খুলে আনতো, গোড়ায়-গোড়ায় চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি, বিস্কুটের কৌটো—পা-জামা, পাড়-ছেঁড়া রঙিন সুতোয় কাঁথা সেলাই করে'। এবং পর-পর সময়ে ক্রমান্বয়ে টিনের বাঁশি, রবারের বল, লজেন্সের বোতল—জিন বা খাকির হাফ-প্যান্ট। শেষ পর্য্যন্ত একটা ট্রাইসিকেল। জিনিসগুলি আদিত্য হাত বাড়িয়ে নিতো বটে, বিশেষ করে' যেগুলো মুখ বাড়িয়ে নেয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীপর্ণাকে সে গ্রহণ করলে না, কিছুতেই না। কতোক্ষণে ঠাকুমা'র কোলে গিয়ে সে শান্ত হ'বে! শ্রীপর্ণার হাতে পরবে না সে জামা, করবে না সে স্নান, নেবে না সে

দুধের বোতল। সব সময়ে তার ঠাকুমাকে চাই। সেই ক'টি দিন, যে ক'টা দিন থাকতো সে সে-বাড়িতে, রাতে আদিত্য শুতো তার ঠাকুমারই বুকের কিনারে : শ্রীপর্ণা পাশের বারান্দায়, শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা মেঝের উপর, তার নিঘুম, নিরানন্দ নির্জ্জনতায়। মাঝরাতে আদিত্য হঠাৎ কেঁদে উঠতো শ্রীপর্ণার আত্মার আর্ত্তনাদের মতো। শিশুর অবুঝ আবদার রাখতে গিয়ে বিভাবতী মাঝে-মাঝে নাকাল হ'তেন, রেগে গিয়ে দিতেন হয়তো বা ধমক, তাঁর বুক থেকে তার ক্ষুধার্ত্ত মুখটা দিতেন হয়তো বা জোর করে' ঠেলে, আদিত্য আরো বেশি হাঁ করে' তার গলা ছাড়তো। সেই চীৎকার বিঁধতো এসে যেন শ্রীপর্ণার বুকে, ছুরির ফলার মতো। তার মনে হ'তো, সে-ই যেন এখন আদিত্যকে শান্ত করতে পারে, পারে তাকে বুকের নরম গরমে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। এখন তার কাছে এলে আদিত্য নিশ্চয়ই কাঁদবে না, রাতের অন্ধকারে তাকে সে এবার ঠিক চিনতে পারবে। কিন্তু তার মিছিমিছি ব্যস্ত হওয়া, ঠাকুমাই তাকে আবার নিখোঁজ শান্ত করেছেন।

শ্রীপর্ণা বেশি দিন শ্বশুরবাড়ি টিঁকতে পারতো না, ছুটির কয়েকটা সেই ছোট-ছোট হালকা দিনও নয়, সহজেই সে বুঝতে পেরেছিলো, এ-সংসারে তার জায়গা নেই, এ-সংসারে সে ধরবে না। পড়তে গিয়ে সে যে কী বীভৎস অন্যায় করেছে তা সে সবাইর মুখে সামান্য একটা পৃষ্ঠার মতো পড়তে পারে। শুধু আদিত্যর জন্যেই আসা, এ ক'টা মাস পর সে আরো না-জানি কতো বড়োটি হ'লো। হয়েছিলো তো মিরকুটে, একটুখানি,

রোঁয়া-ওঠা বেরালের ছানার মতো, দেখতে-দেখতে কেমন থুব-থুব মাংস গজালো গায়ে, ভুরুতে হ'লো চুল, আঙুলের ডগায় ছোট-ছোট নোখের ঝিকিমিকি। শুধু আদিত্যর জন্যেই আসা। কিন্তু সবাইর চেয়ে সে-ই যেন তার বিরুদ্ধে বেশি প্রতিবাদ করে' ওঠে, আর, তার মাঝে থাকে না একটুও বিনীত প্রচ্ছন্নতা। তাই দু'টি দিন সামান্য একটু নেড়ে-চেড়ে, খেলা দিয়ে, আদর করে', সে আবার শ্মশানের স্তব্ধ নিশ্বাসের মতোই বাড়ি ছেড়ে চলে' যেতো, বাকি ক'টা দিন বেড়িয়ে বেড়াতো এখানে-সেখানে আত্মীয় পরিচিতের আশ্রয়ে।

শুধু সেইবার, যে-বার সে ট্রাইসিকেল কিনে এনে দিয়েছিলো, আদিত্য যেন তাকে চিনতে পেরেছিলো, অস্পষ্ট ক'রে, তার মনোহীন শৈশব অবচেতনায়। সিটে সে উঠতে পারতো কষ্ট করে'—আদিত্য তখন তিন বছরের—কিন্তু পা-দানিতে পা রেখে প্যাড্‌ল্ করবার কৌশলটা সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছে না—শ্রীপর্ণা নিচু হ'য়ে তার হাত-শুদ্ধু হাতলটা ধরে' গুটি-গুটি টেনে নিতো সামনের দিকে, লম্বা টানা বারান্দায়, আর সে শ্রীপর্ণার চোখের দিকে চেয়ে হেসে উঠতো খিল্‌খিল্ করে', যেন বা নতুন পরিচয়ের উদার উল্লাসে। কিন্তু তাই আর তাকে ছাড়া নেই, সে তাকে চিনে ফেলেছে এতো দিনে, শ্রীপর্ণার আঁচলটা সে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো—আবার তাকে চড়াও, আবার তাকে টেনে নিয়ে চলো এখান থেকে ঐখানে। পরের বার শ্রীপর্ণা এসে দেখলো, কারুর আর তাকে টেনে নিয়ে যেতে হয় না, সে নিজেই স্বচ্ছন্দে নিচু হ'য়ে হাতলের সঙ্গে প্রায়

নাক ঠেকিয়ে ঘুরে-ঘুরে লম্বা দৌড় দিতে পারে সাইকেলে; দেখ, দেখ, অতোখানি উঁচু থেকে দেখাতে পারে কী-সব অসম্ভব কসরৎ। শ্রীপর্ণাকে আর তার সাহায্যে আসতে হয় না বটে, কিন্তু তাকে আদিত্য নির্ভুল চিনতে পেরেছে, ছুটে এসে তার আঁচল ধরে' বলে: আমার জন্যে এবার কী এনেছ, বলো? কাছেই তার এক জেঠিমা বাটি করে' সাবানের জলে গয়না বুরুস করছিলেন, উঠলেন মুখ বেঁকিয়ে: ছেলের খাঁই যে আর মেটে না দেখছি। দাদা-জ্যাঠারা দিন নেই রাত নেই ভারে-ভারে এতো রাজ্যের জিনিস এনে ছেলের কপালে জড়ো করছেন, তাতেও তার মন ওঠে না, বাড়িতে যে কেউ এলো অমনি হাঘরের মতো তার কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়া—আমার জন্যে কী এনেছ? ও তোর জন্যে কী আবার আনবে রে? আদিত্য কিছুতেই বিশ্বাস করতো না: সত্যি শ্রীপর্ণা যেন তার জন্যে কী এনেছে।

তবু যা-হোক সে লেখাপড়া করছিলো, পাশও না-হয় নেহাৎ করলো ঘটে তার কিছু বুদ্ধি ও মাথায় তার কিছু ঘিলু ছিলো বলে', কিন্তু পাশ করে'ই পেখম মেলে একেবারে নিতে গেলো একটা চাকরি, তা-ও মাষ্টারি, তার শ্বশুরবাড়ির কেউ আর সেটা সহ্য করতে পারলো না। এতো বড়ো ঘরের পুত্রবধূ হ'য়ে সামান্য ক'টা রূপোর চাকতির জন্যে তাকে চাকরি করতে হ'বে, এটা যেন ক্ষীরোদের মৃত্যুর চেয়েও মর্ম্মান্তিক। সামান্য একবেলা আলো-চাল ও কাঁচকলা খেয়ে যার জীবন কাটাবার কথা, তার আবার কিসের জন্যে টাকা চাই, অতোগুলি টাকা দিয়ে সে

করবে কী ? তাঁর টাকা কতোগুলি বাজে উড়ে গেলেও প্রিয়বাবুর গা-টা অমন চড়চড় করতো না। কিন্তু কী আর তাঁরা পারেন শ্রীপর্ণার মুখের উপর তাঁদের বাড়ির দরজা বন্ধ করে' দেয়া ছাড়া ? কে আর কী করতে পারে ?

আদিত্য তখন ছ' বছর পেরিয়ে গেছে, দস্তুরমতো আজকাল সে সুতোয় ঢিল বেঁধে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঢিল-নোঙর খেলে, পিলে-জেত্তাল, ছোট-ছোট মুঠি ঘুরিয়ে হাত-লেপ্‌তি করে। শ্রীপর্ণাকে ভাসা-ভাসা সে চিনে ফেলেছে, কিসে যে তার রুচি, গুলি আর ঘুণ্ডি-ফল, রঙিন চক্‌ আর লাল-নীল পেন্সিল, দিয়াশালাইর খোল আর সাবানের বাক্স, সোনা-দানা জরি-মখমলের চাইতেও যে এগুলি বেশি মূল্যবান, আদিত্য দেখলো, এ-কথা কেবল শ্রীপর্ণাই বুঝতে পেরেছে, শ্রীপর্ণাই তার খেলা-ঘরের সঙ্গিনী, তাকে সে ভালোও বেসেছে শিশুর বিশ্বাসে, যদিও তাকে মা না বলে' ডাকতো ছোট-বৌ। এবং পরে এমনো একদিন এসেছিলো, যখন রাতে শোবার সময় ছাড়া আদিত্য তার ছোট-বৌর কাছ-ছাড়া হ'তে চাইতো না—ছোট-বৌর চোখে জ্বলছে এতো নতুন-নতুন খেলা, তার আঁচলের তলায় লুকিয়ে আছে, এতো সব অদ্ভুত আবিষ্কার! ছোট-বৌ তাকে কতো রকম গল্প বলে—সেও একরকম মজার খেলা, ডানাওলা ঘোড়ায় চড়ে' মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে রাজপুত্র, ছোট একটা কৌটোর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ রাক্ষসীর প্রাণ, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিতেই কেমন রাজকন্যা উঠলো জেগে ; তারপর কোনো দিন বা বাঘ-সিংহের গল্প, আদিত্য কেমন একদিন

গাছে উঠে তার এয়ার-গানটা দিয়ে মেরে ফেললো আস্ত একটা বাঘ, ডোরা-কাটা হলদে-হলদে দাগ, আগুনের গোলার মতো চোখ, তার গর্জ্জনে সমস্ত জঙ্গল গমগম করছে,—ওঃ, কী মজা, আদিত্য জোরে হাত-তালি দিয়ে উঠতো, তার এয়ার-গানের এক আওয়াজেই বাঘটা একেবারে মরে' গেলো! তারপর ছোট-বৌ তাকে কতো মজার-মজার কবিতা মুখস্ত করাতো, কখনো বুক চিতিয়ে, বা চোখ পাকিয়ে, মুঠি উঁচিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, গম্ভীর মুখে, একটুও না হেসে সে-সব বীররসের অভিনয় করতে কী যে ভালো লাগতো তার! এতো আমোদ সে আর কোথাও পেতো না, সত্যি করে' বলতে, ঠাকুমার বাটি-বাটি পিঠে-পায়েস খাওয়ানোর মধ্যেও নয়। এটা সে স্পষ্ট বুঝতো ছোট-বৌ এ-বাড়ির কেউ নয়, মিনি বেড়ালটা যেমন এ-বাড়ির এমন কি সে অর্থেও নয়, সে দু'টি দিন শুধু এখানে বেড়াতে এসেছে, আবার চলে' যাবে তার আরেকটা বাড়িতে, পরীর মতো, আরেক ছেলের কাছে, এমনি গল্প বলতে, ছবির বই দিতে, কবিতা মুখস্ত করাতে। তাই শ্রীপর্ণার যাবার সময় আদিত্য তার হাত ধরে'-ধরে' বাড়ির ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে আসতে-আসতে মলিন মুখে জিগ্‌গেস করতো: আবার কবে আসবে, ছোট-বৌ, এবার কী নিয়ে আসবে বলো? তাকে বুকে তুলে নিয়ে গালে-গলায় চুমু খেতে-খেতে শ্রীপর্ণা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতো: শিগ্‌গির চলে' আসবো; এবার নিয়ে আসবো, নিয়ে আসবো—সে একটা ভীষণ জিনিস, দেখবে কী নিয়ে আসি। এতো বড়ো বুড়ো ছেলে কোলে উঠে চুমু খাচ্ছে, রাস্তার লোক দেখছে

ভাববে কী, আদিত্য জোর করে' নেমে আসতো মাটির উপর, বলতো: আচ্ছা, নিয়ে এসো মনে করে'। বলে' কতক বা তার অসমাপ্ত খেলার কথা মনে করে' প্যাণ্টের আলগা-হ'য়ে-আসা বেল্‌ট্‌টা দু' হাতে আঁকড়াতে-আঁকড়াতে সোজা ছুটে যেতো সে বাড়ির মধ্যে, ফিরেও দেখতো না।

মাষ্টারি নেবার পর সে প্রিয়বাবুকে, একটা চিঠি লিখেছিলো, আদিত্যকে চেয়ে: চিঠিতে ছিলো বা কোথায় প্রচ্ছন্ন একটি দাবির স্বর। প্রিয়বাবু সে-চিঠির সবিস্তার জবাব দিলেন। দীর্ঘ জীবন ধরে' তিনি শুধু আইনের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করেছেন, তামাদি আর ছানি, কবলা আর খতিয়ান: এতোদিন পরে পেলেন একটু সাহিত্য করবার সুযোগ। তেজী, জোরালো ভাষায় বহু অকথা-কুকথা বলে' শ্রীপর্ণাকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে' দিলেন। শুদ্ধ করে' মোদ্দা কথা ছিলো তাঁর এই: যে-মেয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিপথগামিনী হয়, তার সঙ্গে স্বামীর পরিবারের, তার স্মৃতিসম্বলিত কোনো কিছু পরিচয়ের সঙ্গে তার সংশ্রব থাকতে পারে না। আদিত্য তাঁদের ছেলে, তাঁদের বংশধর, তাঁদের কুলপ্রদীপ, তার উপর শ্রীপর্ণার কোনো অধিকার নেই, মাইনে-করা সামান্য শিক্ষয়িত্রী হিসেবেও নয়। সে মা নামের অযোগ্য, তার সংস্পর্শ আদিত্যের পক্ষে বিষতুল্য, আদিত্য জানে, তার মা-ও কবে মরে' গেছে।

চিঠিটা মুড়ে রাখতে-রাখতে শ্রীপর্ণা মনে-মনে হাসলো। এতোতেই এতো, তবু সে এখনো নিরঞ্জনকে বিয়ে করেনি।

তিন

নিরঞ্জনের সঙ্গে শ্রীপর্ণার আলাপ—কী করে' কে বলবে কোথায় এবং কখন তাদের প্রথম আলাপ, কতো লোকের সঙ্গেই তো তার আলাপ হয়েছে এ-পর্য্যন্ত, কে মনে রেখেছে তার খুঁটিনাটি ইতিহাস—গোড়া থেকেই কেমন আত্মার অনমুভূয় গভীরতার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলো। নিরঞ্জন সভ্য জার্ম্মানি থেকে ফিরেছে কী কতোগুলি দুরুচ্চার উপাধি নিয়ে, কী সব ফের ব্যবসা ফেঁদেছে কল্‌কাতায়, গিরিডিতে এসেছিলো সেই সম্পর্কে, কয়লা আর আবের সন্ধানে, প্রায় দেড় বছর আগে। এবং সেইখানেই শ্রীপর্ণার সঙ্গে তার আলাপ, নভেলি কোনো গুণ্ডার কাছ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নয়, নয় বা উশ্রীর বিগলিত রাজত নির্জ্জনতায়, —কোনো ঔপন্যাসিক বর্ণনার সঙ্গেই তাকে খাপ খাওয়ানো যাবে না; আলাপ হয়েছিলো যেমন করে' সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত মানুষের আলাপ হ'তে পারে, ধরা যাক্, পথে, কোনো চায়ের নেমন্তন্নে, বা স্কুলের কোনো প্রাইজ-বিতরণের সভায়—এতোদিনে সে-সব কথা তাদের মনেও নেই। এতোদিন, কেননা আলাপ

হ'বার পর থেকে একেকটি দিন তারা একেকটি নিশ্বাসের মতো উড়িয়ে দিয়ে এসেছে, দিনগুলি কাটছিলো তাদের বর্ষমান নির্ঝর-জলের উপর দিয়ে। এ আলাপ হ'তোই, এ আলাপ তাদের বহু আগের থেকেই নির্বাচিত, তাই এর কোনো পশ্চাৎপটের দরকার হয়নি, নয় কোনো দৃশ্যসংস্থানের। তারা কে ও কী সেটা পরের কথা, তাদের আলাপটাই হচ্ছে মুখ্য, প্রধানতরো।

সংসারে নিরঞ্জন একেবারে একা, তার বাবার বিস্তীর্ণ ব্যবসার সে একক উত্তরাধিকারী। বাপের জীবদ্দশায়ই সে ইউরোপ গিয়েছিলো ব্যবসা-সংক্রান্ত কী সব জটিল বিষয়ে পারঙ্গম হ'তে, দেশে ফিরতে-ফিরতেই বাবা গেলেন মারা, প্রকাণ্ড ব্যবসাটা তার হাতে এসে পড়লো। ব্যবসাটা সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কিনা সেটা পরের কথা, মরতে-মরতেও সেটা যে নিরঞ্জনের মানবিক আয়ু ছাপিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আসলে তার এই সম্পৎশালিতা যতো নয়, যতো নয় তার এই ইউরোপীয় চাকচিক্য, এই বিশাল বিস্তীর্ণ একাকীত্বই ছিলো তার একমাত্র অহঙ্কার। সেই একাকীত্বে সে যেন আরণ্য একটা পশুর মতো শক্তিশালী। দুই হাতে তার অজস্র আশ্রয়, দুই পায়ে তার অবারিত স্বাধীনতা। তার কঠিন, প্রসারিত কপালটা যেন এই একাকীত্বের তেজে জ্বলছে, নাকে তার দম্ভ, চিবুকে তার দৃঢ়তা, সমস্ত শরীর যেন তার সেই একাকীত্বের স্পর্দ্ধিত, উচ্চণ্ড বিজ্ঞাপন। শক্তি যদি শোভা হয়, তবে নিরঞ্জন পৃথিবীর একজন সুন্দর পুরুষ, সে-সৌন্দর্য তার আকাশের নীল রৌদ্রের মতো স্পষ্ট, গুহাহিত গূঢ় অন্ধকারের মতো ভয়ঙ্কর। তার

সৌন্দর্য্যে কোথায় যেন একটা তীব্র নিষ্ঠুরতা আছে: তার উঁচু হাসিতে, কথা বলার তেজস্বী উলঙ্গতায়, তার প্রতিটি ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অনাগরিক অকাপট্যে। শ্রীপর্ণার সামনে এসে যে যখন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াতো, বলীয়ান দীর্ঘ চেহারা, তাকে তার মনে হ'তো নির্জ্জন, দিগন্তপ্রসারী, ঘুমন্ত মাঠের উপর বিশাল এক বনস্পতি, কর্কশ স্তব্ধতায় সর্ব্বাঙ্গে সে নিশ্চল, শক্তিমান, অথচ প্রতি স্নায়ুতে চলেছে তার প্রচ্ছন্ন প্রাণের আয়োজন, সূর্য্যের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তার সমস্ত শাখা, সমস্ত শিকড় তার মাটির গভীর আর্দ্রতার দিকে—আর, শ্রীপর্ণা গভীর আবিষ্ট চোখে তার দিকে চেয়ে থাকতো, আর শ্রীপর্ণাই হচ্ছে তার এই মাটি, আর্দ্র, আহিম, অবাঙ্মময়।

নিরঞ্জনেরো ভালো লেগেছিলো এই শ্রীপর্ণাকে। তার শরীরময় উদাস কৃশতাটিকে। সমস্ত শরীরে সে যেন সব সময়েই কেমন অনুপস্থিত, তার রুক্ষ চুলে, নম্র দু'টি চোখে, সাড়ির বিষণ্ণ শুভ্রতায়—কোথাও যেন সে নেই, তার এই মধুর, পলায়মান অশারীরিকতাটিকে। তার ক্লিষ্ট, রুক্ষ কৃশতার করুণ দীর্ঘশ্বাসটি তাকে মুগ্ধ করেছিলো: হাতের দু'টি অসহায় রিক্ততা, চোখের দু'টি কোমল কাতর্য্য। তার হাসিটি যেন বৃষ্টির পর বনের শিয়রে বাঁকা একটুকরো চাঁদ উঠেছে। খাঁচার থেকে পাখি দিয়েছে ছেড়ে, আড়ষ্ট পাখায় ভালো সে উড়তে পাচ্ছে না, তেমনি তার কথা, ভাঙা-ভাঙা আকাশের স্বপ্ন-মাখানো। যেন তার নিহিত আত্মা শরীরের এই ক্লিশ্যমান রুক্ষতায় পেয়েছে উদাত্ত উচ্চারণ। পুরুষে যদি দেখতে হয় শক্তির বিস্ফার, নারীর [illegible]

এই আত্মার পরিচ্ছায়া। শ্রীপর্ণাকে যেদিন সে প্রথম ছুঁলো, তার হাতের মুঠোয় সে যেন নরম একতাল মোম, নিরঞ্জনের মনে হ'লো, সে যেন কোন মন্দিরের গহ্বরে ঢুকে দেবতার বিগ্রহকে স্পর্শ করছে, পাথরের মতোই ঠাণ্ডা, পাথরের মতোই নিঃশব্দ।

ঔপন্যাসিক ধরনে তাদের মাঝে কখনোই কোনো প্রেমের অভিনয় হয় নি, তাদের প্রেম ছিলো মৃত্যুর মতোই অবশ্যম্ভাবী, নিয়তির মতোই দুর্ব্বার। কখনো কেউ মুখ ফুটেও কাউকে বলে নি বা বলতে দেয় নি কে কা'কে কতো ভালোবাসে : যখন চারদিকে দিন দেখা যাচ্ছে, তখন বাইরে গিয়ে কে আর আকাশের দিকে তাকায়, সত্যি সূর্য্য উঠলো কিনা। তাদের দুয়ের মাঝে প্রেমের বিচ্ছুরণ হিসেবে কোনো খুচরো স্পর্শেরো দরকার ছিলো না, ছেলেমানুষি মিষ্টপ্রিয়তা : দক্ষিণ থেকে যখন বসন্তের হাওয়া দিয়েছে তখন গাছের পাতা নড়ছে কিনা দেখে কী হ'বে। তাদের দুয়ের মাঝে প্রেম ছিলো উহ্য, পরিব্যাপ্ত, সময়ের মতো, মৃত্যুর মতো, মানুষের অন্তিমতম ব্যর্থতার মতো। যেন তাদের সামনেকার দেয়ালে স্পষ্ট লেখা আছে : তাদের দু'জন দু'জনকে চাই, তারা পরস্পর পাহাড় ও সমুদ্রের মতো নির্জ্জন পাহাড় তাই পাঠিয়ে দিয়েছে নদীর নীল একটি ধারা সমুদ্রের বিস্তারের দিকে। কী হ'বে কথা বলে', কী হ'বে বা কথা দিয়ে পরীক্ষা করে', এই অগ্নিময় মুখর স্তব্ধতায়? তাদের দু'জন দু'জনকে চাই এ-কথা ঈশ্বর পর্য্যন্ত জানেন। সমস্ত আকাশ সেই কথা বলছে।

গোড়ায়-গোড়ায় শ্রীপর্ণা পরিবর্ত্তনটা কিছু লক্ষ্য করতে পারে নি, তার নিজের এই নতুন পরিবর্ত্তন, সাড়া দিতে তার লেগেছে অনেক দেরি। নিরঞ্জন যখন চলে' যেতো এখান থেকে, সে চিঠি লিখতো ঘন-ঘন, নির্বাষ্প, পরিচ্ছন্ন চিঠি,—প্রত্যেকটি অক্ষর হীরের টুকরোর মতো কঠিন, প্রত্যেকটি অক্ষরে তার ব্যক্তিত্ব থাকতো প্রতিফলিত : দ্রুত, দীপ্ত, দীর্ঘ সে কতোগুলি অক্ষর—শ্রীপর্ণার উপর মুঠো-মুঠো ঝরে' পড়তো যেন শব্দের তারকা। এমন সে-সব চিঠি যাদের জবাব না লিখে থাকা যেতো না তেমনি উজ্জ্বল, কুজ্ঝটিকাহীন প্রাঞ্জলতায়; ভাষা যেখানে ঢেকে দিতে পারতো না ইঙ্গিতের তীক্ষ্ণতা; এমন সে-সব চিঠি যাদের উত্তরে ফের সে চিঠি না-চেয়ে চেয়ে পাঠাতো সেই লোককে যে এমন সব চিঠি লিখছে। তারো কোনো চিহ্নিত দিন ছিলো না, ছিলো না কোনো ভূমিকার পৃষ্ঠা, শ্রীপর্ণা যখন নিজেকে উদ্ভাবন করলে : তার অজায়মান শূন্যের থেকে বিশাল এই সৃষ্টি। বুঝতেই পারলো না কী করে' হঠাৎ একদিন আকাশে এলো এতো আলো, মুহূর্ত্তগুলিতে এতো ধার, শরীর উঠলো মৃত্যুর মতো সুস্বাদু হ'য়ে। শ্রীপর্ণা বুঝতেই পারলো না : তাঁর জীর্ণ ক'খানি হাড় দিয়ে যেন কী বাজনা তৈরি হ'য়ে উঠেছে। সে-বাজনা শুনতে পেতো সে রাতের মূর্চ্ছিত অন্ধকারে, তরবারির মতো চমকিত দিনের দীপ্ত দীর্ঘতায়। সে যেন নিজেকে নতুন করে' পেলো, করলো নিজেকে নতুন করে' রচনা, অযান্ত্রিক, মৌলিক রচনা। সে কিছু করলো না, সে হ'য়ে উঠলো : তার দেহের বৃন্তে আত্মার ফুল, দীপাধারে উজ্জ্বলন্ত একটা শিখা, উর্দ্ধায়মান, জ্যোতির্ম্ময়।

শ্রীপর্ণার মনে হ'লো, এতোদিন সে মরে' ছিলো, আত্মান্ধতার কবরের তলায় : এটা তার জীবন ছিলো না, ছিলো একটা বিধিবদ্ধ, যান্ত্রিক অনুবর্ত্তন। নিজেকে সে এতোদিন ধরে' ছলনা করে' এসেছে, চারদিকে চেয়ে নিজেকে নিয়ে এসেছে সে একটা নির্দ্দিষ্ট নমুনায়, প্রাণহীন প্রথার প্রতিচ্ছায়ায় ; সমস্ত সংসারে সে যে একা, সে যে নিজে, এই কথাই সে ভুলে' ছিলো। পাঁচ-জনের মতো হ'তে গিয়ে সে একজনও হ'তে পারে নি। শ্রীপর্ণা ভেবে দেখলো, ভেবে দেখলো কি, আয়নায় তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, দুঃখ যেন তাকে মানায় না, মানায় না তাকে এই অর্থহীন ব্যর্থতা। সে এর জন্যে আসে নি, এমনি জানতে আর করতে, হ'তে নয় : এমনি জীবনের ভারে জড়ীভূত হ'য়ে থাকতে, বাঁচতে নয়। আজ হঠাৎ শ্রীপর্ণার মনে হ'লো, যেন বহু ঢেউ ঠেলে প্রথম পেলো সে মৃত্তিকার আশ্রয়, বাঁচতেই সে এসেছিলো, রোদের মতো, বৃষ্টির মতো, বসন্তের মতো। আর এই বাঁচা কেবল মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে নয়, রক্তে, লাল রক্তে, সিঁদুরের চেয়েও যা লাল, সন্ধ্যারাগের চেয়েও যা গাঢ়। ভাঙা হৃদয় নিয়ে পালকের বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে মাটিতে পড়ে' থাকাও ভালো। শ্রীপর্ণাও এই রক্তেই উঠেছে প্রতিধ্বনিমান হ'য়ে, তার মূলে, তার আদিমতম আণবিকতায়, মায়ের গর্ভে শক্তিমান, স্বসম্পূর্ণ ভ্রূণের মতো। যা জীবনের সত্যিকারের অভাব, সেই অভাব অন্যান্য হিতৈষীদের চাইতে শ্রীপর্ণাই ভালো বিচার করতে পারবে, তার পরিপূরণের নামই হচ্ছে জীবন। যা আমি চাই, এই মুহূর্ত্তে যা চাই, তীব্রতম দুঃসহতম

পিপাসায়, তার দিকে হাত বাড়াতে পারলেই আমি বাঁচলাম। শ্রীপর্ণা এমনি করে'ই বাঁচবে, তার মতো করে' : পৃথিবী তার নিজের চরকায় তেল দিক্, শ্রীপর্ণা তার দিকে ফিরেও দেখবে না। সে ভালো হ'তে চায় না, সে সুখী হ'তে চায়, এবং এই তার চরম ভালো।

তবু শ্রীপর্ণা সহজে সাড়া দিতে পারে নি, আদিত্যর কথা মনে করে' মেরুদণ্ডটা তার সির্‌সির্ করে' উঠছে। কিন্তু আদিত্যর জন্যেই বা তার কিসের এতো ভাবনা? সমাজ স্পষ্ট বলে' দিয়েছে শ্রীপর্ণা তার কেউ নয়। আজ পুরো এক বছর সে সে-বাড়ি যেতে পায় নি, তাতে কারুই কিছু ক্ষতি হয় নি, না তার, না আদিত্যর; বরং সেখানে, তার সমরক্তবাহী আত্মীয়দের ছায়ায়, সে ভালোই আছে, সুখে ও সমৃদ্ধিতে। এতোদিনে হয়তো অক্ষর চিনে-চিনে, বানান করে'-করে' বই পড়ছে, গাছের ডালে ষ্টাম্প বানিয়ে ন্যাকড়ার বলে খেলছে হয়তো ক্রিকেট, হয়তো মাঝে-মাঝে প্যাণ্ট ছেড়ে পরছে এখন ধুতি। এতোদিনে ছোট-বৌর কথা তার মনেও নেই। সত্যি, আদিত্যকে দিয়ে তার কী হ'বে, কে সে তার? সে তার একটা নির্ম্মাণ, সৃষ্টি নয়; মাত্র একটা আবিষ্কার, যা ছিলো : নয় এমন একটা উদ্ভাবন, যা ছিলো না। আদিত্যর চেয়েও বড়ো তার এই প্রেম, এই তার অভীপ্সা। এই তার মহত্তরো উদ্ঘাটন। তাকে মিছিমিছি বিব্রত, বিচলিত করে' লাভ কী? থাক্ সে বিস্মৃতির কুয়াসায়, সব যাক্ বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত হ'য়ে। শ্রীপর্ণা, নতুন, শ্রীপর্ণা প্রথম, শ্রীপর্ণা আবার শ্রীপর্ণা।

ঘরের মধ্যে উঠে গিয়ে শ্রীপর্ণা তক্ষুনি চিঠির কাগজ নিয়ে লিখতে বসলো নিরঞ্জনকে :

শিগ্‌গির চলে' এসো, আমি রাজি। যতো শিগ্‌গির পারো। আমি কাল সকালেই কাজে ইস্তফা দেবো। আর একটুও দেরি কোরো না।

চার

ট্যাক্সির ঝক্‌ঝক্ শুনে শ্রীপর্ণা বাইরে বেরিয়ে এলো। কাজে যখন সে ইস্তফা দিয়েছে, তখন সটান তার বাড়িতে এসে অতিথি হ'তে কোনো বাধা নেই।

শ্রীপর্ণা গম্ভীর, হয়তো-বা একটু মলিন গলায় বল্‌লে,—এতো দেরি করলে কেন ?

—মানে, আসতে ? নিরঞ্জন তার স্বাভাবিক, বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে উঁচু গলায় হেসে উঠলো : তুমি যে তোমার কোয়ার্টার বদ্‌লে নতুন বাড়িতে এসে উঠেছ কী করে' তার ঠিক করবো বলো ? ট্যাক্সিওলা এ বিষয়ে আমাকে মোটেই সাহায্য করতে পারলো না। তারপর ঘুরতে-ঘুরতে, একে-ওকে জিগ্‌গেস করতে-করতে—

—বাড়ি না বদলালে তোমাকে রিসিভ করতুম কী বলে' ? শ্রীপর্ণা মলিন একটু হাসলো : সে-কথা বলছি না। গিরিডিতে আসতে দেরি করলে কেন ? আমি ক'দিন থেকে রোজ সন্ধে হ'লেই উনুনে তোমার জন্যে ডেকচি ভরে' জল চাপিয়ে রাখছি।

—তার চেয়ে রোজ এই সময়টায় ষ্টেশনে বেড়াতে গেলেই পারতে। নিরঞ্জনের হাসি আরো এক পর্দা উপরে উঠে গেলো : ষ্টেশনে আমার জন্যে একটু প্রতীক্ষা করলে আমি বাড়ি বসে' স্বচ্ছন্দে তোমার গরম জলের জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারতুম।

শ্রীপর্ণার হাসি এবার শব্দে ছিটকে পড়লো ; কোলের কাছে হাত দু'টি গুটিয়ে শরীরটাকে সঙ্কীর্ণতরো করে' বল্‌লে,—দেখছ না কী শীত! আর তোমার বুদ্ধি কী একখানা! দিন লিখলে না, ক্ষণ লিখলে না, সারা দিনরাত আমি ষ্টেশনে বসে'ই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই আর কি।

নিরঞ্জন মুখে-চোখে চঞ্চলতার দীপ্তি এনে বল্‌লে,—কাজ, ভীষণ কাজ পড়েছে। এক মুহূর্ত্তও সময় পাচ্ছিলুম না, পেট ভরে' একদম খাওয়া হয় নি ক'দিন থেকে। সময়ে-অসময়ে হোটেল থেকে কতোগুলি খাবার কিনে এনে—বিশ্বাস করো, পর্ণা, সে একটা কী ভীষণ ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে কয়েকটা দিন।

গায়ের উপর আলোয়ানটা ছোট করে' এনে শ্রীপর্ণা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—চান করবে নাকি? নয়তো হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-জামা বদ্‌লে একটু বোসো, আমি লুচি ভেজে আনছি। আর যা পারি দু'টো যেমন-তেমন করে' রেঁধে আনতে।

—না, না, লুচি নয়, আমি ভাত খাব, গরম ভাত। নিরঞ্জন চীৎকার করে' উঠলো : আর কিছু তোমার রাঁধতে হ'বে না, আমার ভাত চাই, আমার রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে, তুমি জানো না আমি কী সাজ্ঘাতিক খেতে পারি। তোমার ঐ বাবু, ফিন্‌ফিনে, ফুলকো লুচিতে আমার কুলোবে না। গলাটা সে আরো

চড়িয়ে দিলে : তার আগে চা চাই, চা, দুধ নয়, চিনি নয়, র চা, রক্তের মতো কালো চা।

নিরঞ্জন বাড়ির ভিতর এসে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো ঘুরে-ঘুরে ; বল্লে,—শেষকালে এমন প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ভাড়া করে' বসলে ?

—কী আর করবো ? শ্রীপর্ণা সামনে বঁসে' চা করতে-করতে বল্লে,—হাতের কাছে এক দিনের নোটিশে আর বাড়ি পেলুম না যে। ক'টা দিন যেন এই বাড়িটারই মতো প্রায় দম বন্ধ করে' ছিলুম। স্কুলের দাইটা রাতে এসে কাছে থাকতো বলে'ই রক্ষে। চায়ের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : নতুন বাড়িতে' এসে কী মুস্কিলেই যে পড়লুম, কোথায় পাই বাসন-কোসন, কোথায় বা শিল-নোড়া! রান্নাঘরে গিয়ে আমার সংসারের চেহারাটা যদি দেখ! তবু ভীষণ ভালো লাগছে, কাঁচা হাতে প্রথম কবিতা লিখতে গেলে যেমন লাগে।

নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার মুখের দিকে তৃপ্ত চোখে চেয়ে বল্লে,—বেশ লাগছে, যেন প্রকাণ্ড ডুবন্ত জাহাজের ডেকের এক কোণে আমরা নিরাপদে বসে' আছি। বল্লে'ই সে হেসে উঠলো ঘর কাঁপিয়ে : কই, তোমার চা কই ?

—নিচ্ছি। চোখ নামিয়ে ঠোঁট দু'টি ফুরফুরে করে' শ্রীপর্ণা পেয়ালার কিনারে চুমুক দিলো।

সমস্ত বাড়িতে বিশেষ কোথাও আলো নেই, শ্রীপর্ণার পড়বার টেবল্-ল্যাম্পটা ছাড়া একটা মাত্র আর হারিকেন, সেটাও রান্নাঘরে। তবু, ঘরময় নরম অন্ধকারটি নিরঞ্জনের চোখে ভরি

ভালো লাগছে, ভালো লাগছে সেই অন্ধকারে পাশের ঘরটিতে তার জন্যে শ্রীপর্ণার বিছানা করা, অন্ধকারের মধ্যে তার এই অকায়িক চলা-ফেরা। কোথাও আসবাবের কোনো ছিটে-ফোঁটা নেই, দু' পাশের দুই ঘরে পুরু করে' খড় বিছিয়ে তার উপর বিছানা পাতা হয়েছে, যা একটা মাত্র শ্রীপর্ণার টেবিল আর চেয়ার, পেরেকে-পেরেকে দড়ি টাঙিয়ে তার উপর শ্রীপর্ণা তার সাড়ি-সেমিজ ঝুলিয়ে রেখেছে, ও-ধারে চামড়ার একটা স্যুটকেস, দেয়ালে বসানো প্রকাণ্ড আলমারিটার উপর-দিকের তাকে ছোট একটা টাইম-পিস। মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে এসে তারা ক্যাম্প করেছে। সমস্ত শূন্য যেন তবু শূন্য নয়, সমস্ত অন্ধকার নয় যেন তবু অন্ধকার।

কলার পাতায় শ্রীপর্ণা ভাত দিয়ে গেলো। বেশি কিছু সে রাঁধতে পারে নি রাত করে', কিছু ভাজা আর সিদ্ধ, ডাল আর বড়া—যার জোগাড় ছিলো তার দৈনিক খাদ্য হিসেবে, দু' চামচ ঘি আর এক বাটি দুধ। মহার্ঘতম উত্তুঙ্গ কোনো হোটেলেও নিরঞ্জন এমন আয়োজন দেখে নি, জীবনে খায় নি সে কোনোদিন এমন তৃপ্তি, এমন পবিত্রতায়। অমৃত-নামক কথাটা এতোদিন সে শুধু বইয়েই দেখে এসেছে।

শ্রীপর্ণা সামনেই বসেছে। খেতে-খেতে নিরঞ্জন বললে,—তুমি কী খাবে?

—আমার জন্যে দুধ আছে।

—কেন, নিরঞ্জন পাতের থেকে চোখ তুললো: তুমিও বসে' খাও-না এই সঙ্গে।

—থাক্, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হ'বে না। প্যানের থেকে হাতায় করে' আরো দু'টি ভাত দেবার জন্যে এগিয়ে আসতে-আসতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—ভারি তো খাওয়া, তায় আবার ভাগীদার ডাকছো। নিশ্চয়ই তোমার পেট ভরলো না কিচ্ছু।

—না, তুমিও খাবে এসো, গরস পাকিয়ে নিরঞ্জন প্রায় তার মুখে তোলে আর-কি : আমি বসে'-বসে' গিলবো, আর তুমি উপোস করে' থাকবে, এ কিছুতেই হ'তে পারে না। ভাগীদার নয় তো কী!

তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—রাতের বেলা ও-সব আমি কিছু খাই নাকি?

নিরঞ্জন আস্তে-আস্তে হাতটা গুটিয়ে আনলো। বল্‌লে,—কিন্তু কেনই বা খাবে না? আর কিসের বাধা?

—না, আজ নয়। শ্রীপর্ণা ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

রাতে আর তাদের সে-সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা হয় নি মুখোমুখি। বাইরের বারান্দার অন্ধকারে সেই প্রচণ্ড শীতে খানিকক্ষণ তারা এসে চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলো। অন্ধকার যে এতো কালো, এতো দুর্ভেদ্য কালো হ'তে পারে, নিরঞ্জন এর আগে স্বচক্ষে কখনো দেখে নি, আকাশ যেন সেই অন্ধকারের ভারে একেবারে কাছে নেমে এসেছে। তারায়-তারায় আকাশ একেবারে ছেয়ে গেছে, কালো পিন্-কুশানে বেঁধা কতোগুলি আলপিনের মাথার মতো ঝক্‌ঝকে। সবুজ তারা, নীল তারা এই সে প্রথম দেখলো, এতোদিনে চিনলো কা'কে বলে ধ্রুবতারা, কোথায় সপ্তর্ষি, কোথায় দাঁড়িয়ে কালপুরুষ। কলকাতায়

ফিরে আবার সে-সব ধোঁয়ায় যাবে হারিয়ে, আকাশের বিবর্ণ একঘেয়েমিতে। শুকনো, শাণিত শীত রক্তে এনে দেয় ধার, মদের তীব্রতার মতো। প্রতি নিশ্বাসে তারা টেনে নিচ্ছে এই শীত ঝাঁজালো গন্ধের মতো, সমস্ত শরীর যা নেশার মতো বিভোর করে' তুলছে। মৃদুতম একটি নিশ্বাস পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, এমন অপরূপ স্তব্ধতা।

স্বগতোক্তির মতো নিরঞ্জনের মুখে জায়গাটার কী একটা প্রশংসা শুনতে পেয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আর দেখবে চলো কতো রাজ্যের ফুল ফুটেছে আমার উঠোনে। বাড়িটা যখন আমার, তখন উঠোনটাও আমারই।

—আর ফুল দেখতে হ'বে না। নিরঞ্জন ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—এবার আমি সটান লেপের নিচে। আর যাই হোক পর্ণা, শীত নিয়ে প্র্যাক্‌টিক্যাল কবিত্ব করা যায় না। আমি এখন খানিকটা আগুন পেলে বাঁচতুম। যাই বলো, ওর চেয়ে কল্‌কাতা আমাদের স্বর্গ, হাত-পা মেলে যা-হোক তবু দুয়েকটা কাজ করা যায় ভদ্রলোকের মতো।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আমার তো এ-জায়গাটাই বেশি ভালো লাগে।

—রক্ষে করো। নিরঞ্জন সারা শরীরে শিউরে উঠলো: আমি তো ভাবছি কালকের সকালের ট্রেনেই পালাবো।

—বলো কী?

—ভয় নেই, একলা পালাবো না। নিরঞ্জন সশব্দে হেসে উঠলো।

—তা নয়, শ্রীপর্ণা কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—কিন্তু কালকেই া হয় কী করে' ? গোছগাছ সব বাকি।

—ভারি তো তোমার জিনিস-পত্র, তার আবার গোছগাছ! রঞ্জনের গলা আবেগে একটু গম্ভীর হ'য়ে এলো : এ-সব জিনিস, শানের কতোগুলি ছাই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তুমি কী করবে ? -সব ফেলে দাও, উড়িয়ে দাও হাওয়ায়।

শ্রীপর্ণা আবদারের সুরে বল্‌লে,—বা রে, এতো কষ্ট করে' ামি এমন সুন্দর একটা বাড়ি নিলুম—

—কল্‌কাতায় এর চেয়েও ঢের সুন্দর বাড়ি আছে।

—থাক্‌। ছেলেমানুষের মতো ভুরু তুলে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—সেখানে এমন পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, শালবন আছে ? সেখানে এমন আকাশ-ভরা তারা দেখতে পাও ? শ্লেটের নদী আছে সেখানে ? অনুনয়ে সে প্রায় একটা কান্নার সুর বা'র করলো : না, ক'টা দিন এখানে থাকো, এই চমৎকার নিরিবিলিতে।

—কল্‌কাতায়ো আমরা এমনি নিরিবিলি, পর্ণা। নিরঞ্জন সাদা, নির্বাষ্প গলায় বল্‌লে,—কিন্তু কী করে' এখানে থাকি বলো। ভীষণ কাজ, আপিসে রাজ্যের কাগজ-পত্র জমে' আছে, আমাকে গিয়ে সব ক্লিয়ার করতে হ'বে। এই পচা শীতে এখানে কেউ টিঁকতে পারে নাকি ভদ্রলোক ? নিরঞ্জন মুখ যথাসাধ্য গম্ভীর করবার চেষ্টা করলো : শীতে দেয়ালগুলো যেন সব গলে' যাচ্ছে মনে হচ্ছে—কী রট্‌ন্‌ জায়গা এ গিরিডি!

শ্রীপর্ণা হেসে ফেললো। বল্‌লে,—কিন্তু একেবারে কালকেই যাবে ? ইস্কুলে যে আমার কিছু পাওনা-পত্তর ছিলো।

—রেখে দাও তোমার ইস্কুল। ক' টাকা বলো, আমি দিয়ে দিচ্ছি। নিরঞ্জন হেসে ফেল্লো : কালই গেলে ভালো হ'তো, পর্ণা। আচ্ছা কাল না হোক, পর্শু, কী বলো? নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি ঘরের কোটরের দিকে পা বাড়ালো : এবার শুয়ে পড়ো গে, পাৎলা ঐ একটা র‍্যাপার জড়িয়ে আর তোমার আকাশ-ভরা তারা দেখতে হ'বে না। রাতে তো আর ভাত খাও নি, ঘুম পাবে কোত্থেকে? নিরঞ্জন আবার আরেকটা হাসির আওয়াজ করলো।

রাতটা কেটে গেলো অতলস্পর্শ ঘুমের মধ্য দিয়ে, পরদিন সকালে তারা চায়ের টেবিলে এসে বসেছে : নিরঞ্জন চেয়ারে, শ্রীপর্ণা দূরে, তার সুটকেসের উপর। কোনোদিন সকালবেলা ঘুম-থেকে-উঠে-আসা, রুক্ষ, একটু-বা অগোছাল শ্রীপর্ণাকে সে দেখে নি, সে যে কতো সুন্দর, এতোদিন, আজকের আগে পর্য্যন্ত, কোনো কিনারাই পায় নি সে। সুটকেসে বসার দরুণ তার ভঙ্গিটা কেমন নিচু, হাঁটুর উপর দু' কনুই রেখে কেমন সে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে, ঢালু পিঠে কেমন একটি অলস কোমলতা : হাত দু'টি কৃশতায় কেমন দুর্ব্বল, পায়ের ঢেউ দু'টি কেমন শিথিল। এতো সুন্দর যেন সে তাকে কোনোদিন দেখে নি, এই তার ঘুমের শিশিরে ফোটা শরীরের শেফালিকায়। শুধু চা-ই আসতে লাগলো জুড়িয়ে।

নিরঞ্জন চায়ের বাটিতে মুখের আধখানা ঢেকে জিগ্‌গেস করলে : তুমি এতো তাড়াতাড়ি মন ঠিক করলে কী করে'? তুমি তো চেয়েছিলে আরো ছ' মাসের সময়।

এ-সব কথা চিঠিতে লেখা কতো সহজ, শ্রীপর্ণা মেঝের উপর চোখ নামিয়ে কথার সুরে প্রচ্ছন্ন একটি হাসি মিশিয়ে বল্‌লে,—ছ' মাস সময় চেয়েছিলুম বলে' একেবারে শেষ তারিখেই মতামত দিতে হ'বে এমন কোনো কথা আছে নাকি? আমার মনের কতো ছ' মাস পেরিয়ে গেছি।

—ভালোই করেছ শেষ পর্য্যন্ত মত দিয়ে। নইলে আমি বাঁচতুম না। তোমার ঐ সব বেয়াড়া, অবৈজ্ঞানিক প্রিন্সিপ্‌লে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। নিরঞ্জন হেলানো পিঠটা খাড়া করে' উঠে বসলো: শরীর থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে' নেয়ার মতো অসম্ভব আর কিছু হ'তে পারে না। আপ্রাণ ভালোবাসতে পারবো অথচ আশরীর রোমাঞ্চিত হ'তে পারবো না, এটা নিতান্ত অবমানবের ফিলজফি। তা, বিয়েটা আমাদের কোন মতে হ'বে? ব্রাহ্মধর্ম্মটা পছন্দ করো?

শ্রীপর্ণা মুখ তুলে ধূসর একটুখানি হাসলো। দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে পায়ের উপর আস্তে সে আরেকটি পা তুলে দিলে। বল্‌লে,—আমাদের বিয়েতে আবার ধর্ম্মমত কী, একমাত্র মানুষের মত। ধর্ম্মের চাইতে আইনই আমাদের কাছে বড়ো, তেমনি একটা সম্মানজনক, সহজ আইনেরই আমরা শরণ নেবো।

—বেশ, তবে কল্‌কাতা গিয়েই আমরা রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে দেখা করছি। নিরঞ্জন গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো: আর দেরি নয়, পর্ণা, লোহা গরম থাকতে-থাকতেই আঘাত করা উচিত। নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে একটু পাইচারি করে' নিলো; বল্‌লে,—আদিত্যর সম্বন্ধে কী ঠিক করলে?

শ্রীপর্ণা নড়লো না। পরিচ্ছন্ন, একটু-বা প্রখর দৃষ্টি মেলে বল্‌লে,—তার কী ঠিক করবো? সে থাকবে তার আপন বাড়িতে, বংশের বাতি জ্বালিয়ে। তার কথা আমি আর ভাবি না।

নিরঞ্জন তার গলার স্বরে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। অথচ এতোদিন এই আদিত্যর কথা ভেবেই শ্রীপর্ণা শান্তি পাচ্ছিলো না।

শ্রীপর্ণা আবার বল্‌লে—যেন তার অস্তিত্বের কোন দূর, গভীর অন্ধকার থেকে : আমার সন্তানের চেয়েও আমার জীবনে কোনো বড়ো সত্য থাকতে পারে, কোনো মহত্তরো ঐশ্বর্য্য। আমি তা অস্বীকার করতে পারবো না, তা অস্বীকার করবার আমার অন্যায় সাহস নেই।

নিরঞ্জন যেন সমস্ত শরীরে স্নিগ্ধ হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,—বেশ তো, ইচ্ছে করলে তাকে তোমার কাছে আনিয়ে নিলেই হ'বে।

—তারা তাকে ছেড়ে দেবে কি না আমার কাছে? মাষ্টারি নিতেই কতো কথা বললো, তারপর তো স্পষ্ট বিয়ে করে' বসলুম।

—কেন দেবে না? তোমারই তো ছেলে। একশোবার দিতে বাধ্য।

—থাক্ গে। শ্রীপর্ণা জোর করে' উঠে পড়লো : তাকে দিয়ে আমার কী হ'বে? সে আমাকে এতোদিনে ভুলে'ও গেছে নিশ্চয়। যখন একবার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি। যা গেছে, তা গেছে। ও-সব কথা তুমি তুলো না।

—তাই। নিরঞ্জন তার দীর্ঘায়মান দেহের বৃন্তের দিকে চেয়ে বিহ্বল গলায় বল্‌লে,—শ্মশানে তুমি ফুটে উঠেছ একটি ফুল।

আপন ঐশ্বর্য্যে ফুটে ওঠাই হচ্ছে জীবনের শেষ সত্য। চলো; ত বাড়িয়ে নিরঞ্জন তাকে ধরতে গেলো: চলো, কোথাও এক বেড়িয়ে আসি। চমৎকার রোদ উঠেছে।

নাগালের বাইরে কৌশল করে' চলে' গিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তোমার কী সব আবদারের কথা! আমার এখন রান্না চাপাতে হ'বে না?

—উঃ, কতো আমার আপিসের বেলা বয়ে' যাচ্ছে একধার থেকে! নিরঞ্জন হেসে উঠলো: আমার এগারোটার মধ্যে ভাত চাই একেবারে! বেশ তো, চলো না, ফেরবার পথে বাজার করে' ফিরবো'খন। ফিরতে যখন মন চাইবে। তারপর দু'জনে রাঁধবো, দু'জনে খাবো।

—তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু কী এতো বাজার করে' ফিরবে তুমি?

—কেন, তুমি কি আজো আমাকে নিরিমিষ খাওয়াতে চাও নাকি?

দড়ির থেকে সাদা আলোয়ানটা পেড়ে গায়ের উপর গুছোতে-গুছোতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—হ্যাঁ, আজো।

পাঁচ

কল্‌কাতায় বিড্‌ন্‌-ষ্ট্রিটে তার পৈতৃক বাড়িটা ভাড়া দিয়ে নিরঞ্জন উঠে এসেছিলো পার্ক-সার্কাসে, প্রায় একেবারে পূবের সীমান্তে, যার পরে আর সহরের কোনো চিহ্ন নেই—মাঝারি, দোতলা, নতুন বাড়ি দেখে। উঠে এসেছিলো, ভাড়াটে হিসেবে নয়, এক রকম থোক কিনে নিয়ে। আদ্ধেক যখন বাড়িটা উঠেছে, তাদের কোম্পানিকে, মানে, তার কাছে সেটাকে রেহান দেয়া হয়—বাড়িওয়ালার থাক্-যাক্ টাকার দরকার। বলা বাহুল্য, সে-টাকা আর শোধ করা হয় নি, বাড়িটার নিরঞ্জন কায়েমি দখল নিয়ে বসেছে। তবু ভাগ্যিস, উপরটা এখনো বাকি ছিলো, তারি মধ্যে, যথাসাধ্য, ঘর-দোরের সে একটা ছক আঁকলে। সব শুদ্ধু মন্দ দাঁড়ায় নি চেহারাটা: শ্রীপর্ণা তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

সত্যি, সাবেকি পৈতৃক বাড়িটা যেন শূন্যতার ভূতে-পাওয়া, স্থানের বিশালতায় সে উঠছিলো হাঁপিয়ে। কেমনতরো যেন সে ছড়িয়ে পড়ছিলো এলোমেলো, নিজের মাঝে নিজে সে আঁট, ঘন

হ'য়ে উঠতে পারছিলো না। তার চারপাশের দেয়ালগুলো দূরে-দূরে সরে' থাকলে তার নিজেকে যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, যে-ঘরগুলিতে কোনো লোক নেই, আসবাব নেই, অথচ যে-গুলির জানলা-দরজা খোলা, তাদের শূন্যতা যেন সব সময়ে তাকে হানা দেয়। একরকম পালিয়েই তাকে আসতে হয়েছে। তা ছাড়া বাড়িটাতে জায়গার কোনো লেখাজোখা ছিলো না বলে' কে যে কখন উড়ে এসে সবান্ধবে জুড়ে বসতো, তার ঠিক ছিলো না: তাদেরো আক্রমণ থেকে নিজের নিভৃতিটা অব্যাহত রাখা দরকার। পালিয়েই সে এলো তার আত্মার ঘন, তপ্ত সন্নিহিততায়: চারদিকে সে পরিমিত, ছন্দোবদ্ধ; নেই আর এতোটুকু অপচয়, এতোটুকু বিশৃঙ্খলা। সব পারস্পরিক সঙ্গতিতে কেমন উঠেছে সংহত হ'য়ে। জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির প্যাটার্নটাও বদ্‌লে নেয়া দরকার।

ঢুকেই সিঁড়ির দু'ধারে বড়ো দু'টো ঘর, একটা সদর ড্রয়িং-রুম, অন্যটা নিরঞ্জনের মফস্বল-আপিস, বাড়িতে বসে' আপিসের কাজ করবার। সিঁড়ির গা ঘেঁসে ছোট এক ফালি গলি বেরিয়ে বড়ো একটা বারান্দায় গিয়ে পড়েছে, তারই পাশে আরো দু'টো ঘর, একটাতে না-হয় ভাঁড়ার করা গেলো, আরেকটাতে রইলো খাবার টেবিল পাতা—রান্নাঘরটা আলাদা, পাশেই। শ্রীপর্ণা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। বাঁ পাশে বিস্তীর্ণ শোবার ঘর, ফরাসী জানলা, ইচ্ছে করলে দু'ধারে অনায়াসে দু'টো সিঙ্গ্‌ল্ খাট পাতা যায়, দরজা খুললেই লম্বা একটা বাথরুম, সকল রকম অনুষঙ্গে একেবারে আধুনিক,

দাড়ি কামানো থেকে সুরু করে' চুল বাঁধা পর্য্যন্ত—একেবারে অগোচর। ও-পাশেরটা নিরঞ্জনের লাইব্রেরি, যতোদিন পর্য্যন্ত না বাবা গতাসু হ'ন, ততোদিনকার তার পুস্তকপ্রীতির নিদর্শন—ওটাকে শ্রীপর্ণা অনায়াসে তার ষ্টাডি বানাতে পারবে। ওটার প্রতি নিরঞ্জনের আর কোনো লোভ নেই, লোভ করবার সময়ো নেই—সকালে সে নিচে, তার আপিসের গ্রীন-রুমে, দুপুরে সে লায়ন্‌স্‌ রেঞ্জে, তার আপিসের প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চে, আর রাত্রে সে একেবারে তার বিছানায়। ঘর—কতোগুলি ঘর দিয়ে সে কী করবে? উপরের বারান্দা পেরিয়ে আরো যে দু'টো ঘর আছে, তাদের একটাতে জিনিস-পত্র, ট্রাঙ্ক-বাক্স, দেরাজ-তোরঙ্গ, আলমারি-আলনা সব থাক্ টাল হ'য়ে, যতোরকম হিজিবিজি : বাকিটা শ্রীপর্ণা তার ইচ্ছে মতো যে-কোনো কাজে লাগাক্। ইচ্ছে করলে সেটাকে সে তার একটা আন্তঃপুরিক ড্রয়িং-রুম বানাতে পারে, ইচ্ছে করলে করতে পারে তার ড্রেস করবার বুডোয়ার, কিম্বা ইচ্ছে করলে রাখতে পারে এমনি খালি—যা তার খুসি। আর ঐ যে দেখছ কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা দক্ষিণের জমির সীমানার ধারে টিনের একটা ছাউনি, ঐটেই আমার গারাজ্, আপাততো আমার টু-সিটারটার; শিগ্‌গিরই একটা শেভ্রোলে কিনবো দু'জনের জন্যে, সেই সঙ্গে ওটাকেও আপাদমস্তক পাকা করে' তুলতে হ'বে।

শ্রীপর্ণা সত্যিই এতোটা আশা করে নি। জানতো নিরঞ্জন অনেক টাকার মধ্যে এসে পড়েছে, তার শিরায় নীল রক্ত, চোখে রূপোলি স্বপ্ন, কিন্তু কৃত্রিম সম্পদ যে এতো সুন্দর হ'তে পারে,

মানুষের বিত্ত যে হ'তে পারে মানুষের ব্যক্তিত্বের এমন অভিজ্ঞান এ-কথা সে আর আগে কোনোদিন শোনে নি। মুখের গ্রাস আচ্ছাদন করে' যে-বিত্ত আমাদের হাতে থাকে সেই উদ্বৃত্তিতেই আমাদের পরিচয়, আমাদের আসল উদ্‌ঘাটন। এ-সব যেন কাঠ ও কাচের প্রাণহীন কতোগুলি জিনিস নয়, ঘরের চারদিকে নিরঞ্জনের আত্মা যেন পড়েছে বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত হ'য়ে। এদের সুমিত অনুপাতে নিরঞ্জনকে আরো তার বেশি সুন্দর লাগলো। ঘরের প্রত্যেকটি ইঁট, প্রত্যেকটি বায়ুকণা যেন তাকে এমনি সুন্দর, প্রচুরতায় এমনি সুন্দর হ'য়ে ওঠবার জন্যে ইসারা করছে।

শ্রীপর্ণা প্রত্যেকটি জিনিস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেলো, নেড়ে-চেড়ে দেখলো, যেন এর পরেই ছিলো তার আদিম অধিকার, এমনি সমৃদ্ধ, এমনি উদ্বেল সম্পূর্ণতায়। দুঃখ সে চায় নি, দুঃখ একটা আভরণ নয় জীবনের, বরং তা পাপ, বরং তা দারিদ্র্য, মানুষের অধিকারই হচ্ছে সুখী হ'বার, নিজের-নিজের মাপে। আর, দুঃখকে সব সময়েই পরিহার করা যায়, অতিক্রম করা যায় : দুঃখের চেয়েও মানুষ অনেক বড়ো, দুঃখের বাইরেও তার অনেক জায়গা। শ্রীপর্ণা যতোই ভাবতে লাগলো এ বাড়ি তার, তাঁর নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যেই এ-সব উপকরণ, ততোই সে যেন প্রচ্ছন্ন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। দাঁড়ালো গিয়ে বা একটু আয়নার কাছে, বাথরুমে গিয়ে খামোকা একবার কল খুললে, ঘাঁটলে দু'টো বই, আর কখনো বা জানলা দিয়ে রাতের বিশাল, অস্পষ্ট কল্‌কাতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তবু আরো দু'টো দিন দেরি হ'লো, এদিক-ওদিক বন্দোবস্ত করতে, এখানে-ওখানে টুকিটাকি দু'টো-একটা জিনিস কিনে আনতে। এ দু'টি দিনের জন্যেও শ্রীপর্ণা তার খোলসটা খুলে ফেললো না, শরীর থেকে ঝরিয়ে দিলো না শুকনো পাতার বিশীর্ণ হাহাকার। এখনো যেন মেঘ কেটে যায় নি, শুধু ঘোলাটে একটু আভা, পীত, প্রেতায়িত: এখনো চাঁদ আসেনি বেরিয়ে তার উদগ্র উন্মুক্তিতে। এখনো শুধু মৃদু-মৃদু দু'টি জলকণা, নদীর নিঝুম একটি ধারা: এখনো নয় ময়ূরের মতো সমুদ্র। এখনো শ্রীপর্ণা চুল বাঁধে না, ছাড়ে নি তার সেই সাদা থান, বন্দী হ'য়ে আছে তার উদাসীন, বিবর্ণ কৃশতায়। এখনো নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পারছে না; কোণের ঐ খালি ঘরটাই সে আপাততো বেছে নিয়েছে। ভোর হ'বার আগের প্রহরটাই বেশি অন্ধকার। তারপর ভোর যখন হ'বে, সূর্য্যের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে আসবে তার অন্ধকার কোটর থেকে। শুধু এই দু'টি দিন, আরো দু'টি দিন।

ঘুম থেকে উঠে, আড়মোড়া প্রায় না ভেঙে, ড্রেসিং-গাউনটা তাড়াতাড়ি গায়ে চাপিয়ে নিরঞ্জন বারান্দা ধরে' চললো সেই কোণের ঘরের দিকে—শ্রীপর্ণাও দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে প্রদীপ্ত চঞ্চলতায়। তাকে দেখেই নিরঞ্জন যেন উথলে উঠলো দুই চোখে, শ্রীপর্ণাকে এখন দেখাচ্ছে ঠিক স্বপ্নের মতো। নিরঞ্জন কথাগুলি যেন তার গায়ের উপর ফুলের পাপড়ির মতো ছিটিয়ে দিলো: আজ, আজ পর্ণা, কতো যুগ পরে আমাদের ঘরে আজ সেই দিন এসেছে।

শ্রীপর্ণা স্মিত, স্নিগ্ধ মুখে বল্‌লে,—আজই? ক'টার সময়?

—ছ'টো থেকে চারটে। আমি সব ঠিক করে' এসেছি নিরঞ্জন হয়তো তাকে একটু স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়ালো।

মুখের উপর চমকিত, দ্রুত একটি হাসির রেখা টেনে শ্রীপর্ণা দেয়ালের দিকে নিজেকে একটু সঙ্কুচিত করলে। বল্‌লে,—ছ'টো থেকে চারটে। কিন্তু তুমি আজ আপিস করবে না?

—আপিস? তুমি বলো কী, পর্ণা? নিরঞ্জন হাসিতে ফেটে পড়লো: আজ আমার বিয়ে, আর আমি যাবো আপিস করতে? জীবনে একটা বিয়ে, তা-ও শান্তিতে করতে পাবো না?

—কী জানি, শ্রীপর্ণাও তার ছোট-ছোট মসৃণ দাঁতে ঝক্‌ঝকে হেসে উঠলো: আমি তো ভাবছিলুম এতো তোমার কাজের তাড়া যে কখন্‌ হয়তো বিয়ের কথাটাই ভুলে' গেছ।

—কাজ, কাজ, নিরঞ্জন হাল্‌কা গলায় বল্‌লে,—কাজ কি আমার কাঁধে ভূত হ'য়ে বসেছে নাকি? আমি কারুর কাজের বোঝা বয়ে' বেড়াই না, কাজটা আমার হাতের সুড়সুড়ি, থামিয়ে দিলেই হ'লো একদিন। আপিসটা আমার—ইচ্ছে করলে দিলেই হ'লো উঠিয়ে।

—পারো তুমি উঠিয়ে দিতে?

—যে-কোনো মুহূর্তে। কিন্তু তখন দেখবে তোমারই আবার ভালো লাগবে না। সমর্থ পুরুষ হ'য়ে কী কেবল দিন-রাত পড়ে'-পড়ে' ঘুমোয়!

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো শব্দ করে'।

নিরঞ্জন ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—থাক্‌, এখন আর কোনো কাজের

থা বলতে হ'বে না। এসো, চা হয়তো তৈরি হ'য়ে গেলো এতোক্ষণ। আজ একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

শ্রীপর্ণা চমকে উঠলো : সে কী, তুমি এই উপলক্ষে লোক-জন খাওয়াবে নাকি ?

নিরঞ্জন হেসে বল্‌লে,—এই উপলক্ষে অন্তত আমাদের দু'জনকে তো খেতে হ'বে। আমাদের দু'জন ছাড়া আর লোক-জনই বা কই পৃথিবীতে ?

—সে তো সন্ধের পর, ব্যাপারটা চুকে গেলে।

—কেন, দিন কি দোষ করলো ? দিনে কি আমরা উপোস করে' থাকবো নাকি ?

—পাগল ! তুমি আবার উপোস করে' থাকবে !

—আর তুমি ?

লজ্জায় চোখের পাতা দু'টি একটু কাঁপিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আজ আমার বিয়ে না ?

একটা বাজতে-না-বাজতেই নিরঞ্জন শ্রীপর্ণাকে তাড়া দিতে লাগলো। না, তার আর কিছু ভয় করছে না, বাথরুমে ঢুকে অনেক জল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে' সে স্নান করলে। এতো জল দিয়ে এতোক্ষণ ধরে' সে অনেক দিন স্নান করে নি—ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে শরীরের যে এতো আনন্দ সে-সম্বন্ধে তার যেন কোনো ধারণাই ছিলো না। স্নান করে' দীর্ঘ, আর্দ্র চুলে, সমস্ত শরীরে স্নিগ্ধ পিচ্ছিলতা নিয়ে শ্রীপর্ণা ড্রেসিং-টেব্‌লের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। বন্ধ করে' দিলো ঘরের দরজাটা। আজ কেউ আর তাকে সাজিয়ে দিতে এলো না, সে নিজেই সাজ করলে।

চিরুনিতে চুলের জট যেন সহজে ছাড়ানো যাচ্ছে না,—তার যে এতো চুল ছিলো, একসঙ্গে এতো তার ভার ও মুক্তি, তাই বা কে জানতো এতোদিন? সিঁথির দু' পাশে লতানো চুলের মসৃণতায় তার মুখকে কেমন ধারালো, কেমন-বা একটু প্রগল্‌ভ দেখাচ্ছে। খোঁপার চূড়াটা যেন একটা উচ্চণ্ড বিহ্বলতা। শ্রীপর্ণা ফের নতুন করে' খোঁপা পরলে, কিছুতেই তার মনমতো হ'লো না, কিছুতেই যেন আনতে পারলো না একটা শান্ত শালীনতা। মুখে একটু স্নো ঘস্‌লো, তাতে মুখটাকে যেন আরো উগ্র, ক্ষুধার্ত্ত দেখালো, উচ্চারিত হ'য়ে উঠলো যেন তার উদ্ধত স্পর্দ্ধা। পছন্দ করে' নিরঞ্জন যা একখানা সাড়ি কিনে এনেছে তা কোনো ভদ্রলোকে পরতে পারে না। শ্রীপর্ণা একখানা অনুচ্চারিত, সাদা রঙের সাড়িই কিনতে চেয়েছিলো; তার এই অহৈতুক শুভ্রতাপ্রিয়তার জন্যে নিরঞ্জন তাকে অকাণ্ডেই কী-সে একটা ধমক দিলে। বল্‌লে: সাদা হচ্ছে প্রাত্যহিকতার রঙ, উৎসবের রঙ হ'বে লাল, রক্তের মতো, আগুনের মতো। তেমনি একটা লেলিহান লাল রঙের সাড়ি সে কিনে দিয়েছে। এ-সাড়ি পরা মানে সকলকে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকারণ সচেতন করে' তোলা—গোড়াতে শ্রীপর্ণার কিছুতেই মন ওঠে নি—কিন্তু নিরঞ্জন কথায় প্রচণ্ড জোর দিয়ে বলেছিলো: তাই তো চাই, প্রতি চক্ষুতে প্রচারিত করে' দেয়া যে তুমি আজো বেঁচে আছো, আজো সুন্দর হ'য়ে বেঁচে আছো। অন্তত আজকে এই উৎসবের দিনে তোমার ঐ মৃত্যুর শুভ্রতা ধুয়ে ফেলে দিয়ে জীবনের রোমাঞ্চে লাল হ'য়ে উঠতে হ'বে। লাল আর সাদা, সাড়ির আবার কিসের মূল্য, শেষ

ছয়

কয়েকটা দিন, কয়েকটা মাস কেটে গেলো দীর্ঘ একটা চুম্বনের মতো।

সমস্ত আকাশ যেন গেছে ফুরিয়ে, পৃথিবী ছোট হ'তে-হ'তে এই ঘরে, এই চারটি দেয়ালের সীমাবদ্ধতায় উঠেছে ঘন হ'য়ে। দিন না রাত্রি, কিছু তাদের কোনো খেয়াল নেই, শুধু অবারিত একটি প্রবাহ, তপ্ত দিন আর তীব্র রাত্রি, অবিচ্ছিন্ন ছন্দোময়তা। সমুদ্রের জলে জলে যেই আলো, সেই নির্জ্জন, দুর্নিরীক্ষ্য আগুন উঠেছে জ্বলে', প্রথম মৃত্তিকাকে পৃথিবীতে রূপান্তরিত করবার সময় বিধাতার হাতে ছিলো যেই স্নেহ, সেই স্নেহ যেন তাদেরো হাতে। চারদিকের বাতাস পর্য্যন্ত যেন একটা জ্বলন্ত তরলতা। এ শ্রীপর্ণা কোথায় এসে পড়েছে, তার জীবনের কী অনাবিষ্কৃত মহাদেশে! জীবনে এমন কতোগুলি সুখ আছে, এতো সমাপ্ত, এতো সুদুঃসহ, যে, তারপর আর মানুষের বাঁচা উচিত নয়,—শ্রীপর্ণাও কেন মরে' গেলো না সেই শীতল তীব্রতায়? ভালোবাসায় যে এতো রোমাঞ্চ আছে, নতুন পাতায়

বৃক্ষ-মর্মরের মতো, ভয়ে যে এতো আকর্ষণ আছে, অন্ধকার রাত্রে পর্বতচূড়ার মতো, তা কে জানতো পৃথিবীতে? শ্রীপর্ণা যেন তার নির্জ্জন সমুদ্রে সাইরেনের ডাক শুনতে পাচ্ছে। যেন দেবতা প্যানের অন্বেষণে চলেছে সাইকি।

মুঠো-মুঠো করে' তারা সোনার মুহূর্তগুলি ছড়িয়ে দিতে লাগলো তাদের অবকাশের মরুভূমিতে। ক্লান্তিহীন, প্রশান্ত একটি অশ্রান্তি। জানলার কাছে ভোরের সূর্য্য যখন এসে দাঁড়ায়, শ্রীপর্ণা বুঝতে পারে তার অভ্যুদয়ের ঐশ্বর্য্য; মথিত দুধের কণার মতো রাত্রে যখন বিন্দু-বিন্দু তারা ফুটে ওটে, বুঝতে পারে বিদীর্য্যমান সেই অন্ধকারের শিহরণ। সমস্ত শরীর দিয়ে সে ঈশ্বরকে প্রণাম করে যে তার অনিঃশেষ সৃষ্টির অপরিমেয়তায় সঙ্গে-সঙ্গে তারো জীবনে নিয়ে এসেছে দ্যুতিমান সম্ভাবনা। তারা যেন সৃষ্টির শৈশবে চলে' এসেছে, পৃথিবীর আদিমতম স্বর্গে, আদম আর ইভ্-এর মতো, যেদিন ছিলো না এই নগর, এই কোলাহল, এই মোটর-মুখরিত সভ্যতা। সুস্থ, প্রফুল্ল, আরণ্য শৈশবে। যেদিন ছিলো না মন নিয়ে হীন দার্শনিকতা, ক্ষুদ্র, বিকৃত মনোবিকলন নিয়ে: যেদিন শরীরের উপর ছিলো না রাশি-রাশি লজ্জা, আত্মার অহৈতুক অত্যাচার। জীবনের সেই উদার উচ্ছৃঙ্খলতায়। ঈশ্বর যেন আগে এসেছিলো এ ঘরে, পরে এসেছে দেহের এ সিংহাসনে, আহিত অগ্নির মতো দীপ্যমান এ দেহ! পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের মতো এ সুন্দর। এতো ঐশ্বর্য্য যেন শ্রীপর্ণা কোনোদিন স্বপ্নেও দেখে নি।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে, ক্রমে-ক্রমে, শ্রীপর্ণা নেমে এলো

তার শীতল স্বাভাবিকতায়, প্রাত্যহিক সংসারের সমতলে। আগে-আগে ক'টা দিন নিরঞ্জন সমানে আপিস কামাই করেছে, কোনোদিন যদিও বা গেছে, দু'-এক ঘণ্টার জন্যে; ইদানি তার আপিসের ঘণ্টাগুলি দীর্ঘতরো হ'য়ে আসতে লাগলো। তবু কী ভালো লাগে যখন সে আপিস থেকে ফিরে আসে,—কখন ফিরবে তার কোনো অনুমেয় সময় বাঁধা নেই, যখন ইচ্ছে সে চলে' আসতে পারে, আসেও তাই: যখন হয়তো বই নিয়ে পড়তে-পড়তে চাঁদের আলস্যে শ্রীপর্ণা ঘুমিয়ে পড়েছে ইজি-চেয়ারে, যখন হয়তো বা কোলের উপর একটা সেলাই নিয়ে বসেছে, যখন হয়তো বা, বিকেলের ধার ঘেঁসে, দাঁড়িয়েছে সে এসে জানলায়, ম্লান-হ'য়ে-আসা কল্‌কাতার মুখোমুখি। নিরঞ্জন যখন ফেরে, যেন সে কতো যুগ পরে ফিরলো, বিচ্ছেদের পর পরিচয়টি আবার নতুন করে' পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে। কী সুন্দর করে' তাদের ভোর হয়, কী সুন্দর করে' তাঁদের রাত আসে, যেন সমস্ত তাদের চোখের উপর দিয়ে, অনুরণিত রক্তের মধ্যে।

সংসারের মধ্যে ছাড়া পেয়েই শ্রীপর্ণা প্রথম বাবুর্চ্চি তুলে দিলো, রূঢ় সাহেবিপনাকে নিয়ে এলো একটি বিশৃঙ্খল বাঙালিয়ানার ছন্দে, মধুর একটি এলোমেলো কবিতায়। নইলে সে করবে কী, সমস্তটা সকাল, যদি না রান্নাঘরে গিয়ে সে হাঁড়ি ঠেলে, যদি না সেই সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃদয়কেও সে জ্বাল দেয়? শ্রীপর্ণা হেসে উঠতো, তা হ'লে তাকেও আপিস করতে হয়; অথচ বিয়েটা মেয়েদের কাছে, ধর্ম্ম না হোক, নিদেনপক্ষে ভালো-মাইনের চাকরি তো একটা বটেই। নইলে সে-ও বা তার ছন্দ খুঁজে

পাবে কোথা থেকে? নিরঞ্জনকে খাইয়ে, আপিসে পাঠিয়ে, তবে তার অন্য কথা। বা রে, এখনো তার স্নানই হয় নি, রান্নাঘরটা হ'য়ে আছে একহাঁটু, সে এরি মধ্যে এই সঙ্গে খেতে বসবে কী? খাওয়ার চেয়ে খাওয়ানোতে যে কী আনন্দ, শ্রীপর্ণা আবার হেসে উঠতো, এ-কথা বাঙালি মেয়ের চেয়ে আর কে বেশি জানে বলো? আচ্ছা হ'বে, হ'বে, রাতে খাবো এক সঙ্গে বসে', তখন খেতে-খেতে গল্প কোরো, এখন গল্প করতে-করতে খাও। নিরঞ্জন যখন আপিসে যাবার জন্যে তৈরি, নিচে নেমেছে, তখনো শ্রীপর্ণা ছুটি নেয় নি, সে নিজেই নিজের বাড়িয়ে চলেছে কাজ—এখন আবার ভাড়ার ঘরে গিয়ে তাক সাজাতে বসেছে। নিরঞ্জন স্নেহে একটা ধমক দিয়ে উঠলো :

তুমি এমনি সমস্ত দিন খেটে মরবে নাকি? চান-টান করে' খেয়ে নিতে হ'বে না?

মিট্-সেফ্‌টা নতুন করে' গুছিয়ে রাখতে-রাখতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—হ'বে'খন আস্তে-আস্তে।

—আস্তে-আস্তে মানে? ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে?

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : তোমার ঘড়ি আর আমার ঘড়ি সময়ের একই শাসনে চলে না।

—তোমার ঘড়িতে তো এখনো ভোর হয় নি। নিরঞ্জন ঈষৎ বিরক্ত মুখে বল্‌লে,—কিন্তু এমনি অসময়ে খেলে শরীর মাটি হ'য়ে যাবে যে দু'দিনে।

যেন কী ভীষণ অবিশ্বাস্য কথা, এমনি সরলতায় শ্রীপর্ণা খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো।

—কী যে তোমরা ছেলেমানুষি করতে পারো এই সব তুচ্ছ টুকিটাকি নিয়ে, শিশি আর কৌটোর দোকান, কোথায় রইলো তোমার কালোজিরে বা কোথায় রইলো তোমার তেজপাতা, কী যে শান্তি পাও তা দেবতারাও বলতে পারেন না।

—দেবতারাও বা এমনি টাকা রোজগার করে' কী সুখ পান, তাই বা কে জানতে আসছে!

অগত্যা নিরঞ্জনও হেসে উঠলো। অল্পক্ষণ। পর মুহূর্ত্তেই মুখে গম্ভীর প্রভুত্বের ভাব ফুটিয়ে বল্‌লে,—কিন্তু তুমি এ-সব ছাই-মাথা নিয়ে খাটতে যাবে কেন? ইচ্ছে করলে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে অনায়াসে আরো দু'টো চাকর রেখে দিতে পারি।

—লুটের সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে বাড়ির মধ্যে শেষকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হ'য়ে যাক্।

—কিম্বা, নিরঞ্জনকে আবার হেসে উঠতে হ'লো: পেয়ালার সঙ্গে যেমন হাতলের, তেমনি তাদের ভাবও হ'য়ে যেতে পারে গলায়-গলায়।

—তবেই দেখতে পারছো কেন খাটছি।

—নিক্ না, কতো নেবে চুরি করে'? ধরো, ওটাও না-হয় আমি ওদের মাইনেই দিলাম। ইচ্ছে করলে আজই বিকেলে—

হাসিতে স্ফুরিত, চঞ্চল দু'টি চোখ তুলে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—ইচ্ছে করলে অনায়াসে তুমি তো আর-কাউকেও বিয়ে করে' আনতে পারতে!

অসম্ভব। অশ্রুত গজ্‌গজ্ করতে-করতে নিরঞ্জন বাইরে তার মোটরে গিয়ে বসলো।

নিচেটা গোছগাছ করে’ উপরে আসতে-আসতে শ্রীপর্ণার অনেক দেরি। শরতের নীল দুপুরটি নিঃশব্দতায় ঝলমল করছে। শ্রীপর্ণা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, লতানো আঙুলে শুকনো বেণীটা খুলে ফেলতে থাকে। আয়নাটা ছেড়ে অনেকক্ষণ তার সরে’ যেতে ইচ্ছে হয় না, আয়নাতে সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার সুখ, তার ঐশ্বর্য্য, তার আশরীর পরিপূর্ণতা। নিজেতেই নিজে সে বিভোর হ’য়ে ওঠে। ঠোঁট দু’টি কেমন ঘন, ভুরু দু’টি কেমন তীক্ষ্ণ, চিবুকটি কেমন সাহসী হ’য়ে উঠেছে। তার বাহুতে এসেছে নিটোল ডৌল, চামড়ায় নতুন মসৃণতা, চুলে কালো ঔজ্জ্বল্য। কেমন সে এখন ক্ষিপ্র, লীলায়িত, পিচ্ছিল। নিজেকেই নিজের তার ভারি ভালো লাগে—যেন কোন ছেলেদের-বইয়ে-পড়া স্বপ্নে-দেখা রাজকুমারী।

স্নান ক’রে আরো অনেক পরে সে খেতে যায়, খাওয়া সম্বন্ধে সে যেন এখনো বিশেষ উৎসাহ সঞ্চয় করতে পারে নি। চর্চ্চার অভাবে রুচিটা তার এখনো মার্জ্জিত হ’য়ে উঠতে পারে নি, জিভটা যেন এখনো কেমন ভারি ঠেকে। এটাকে নিরঞ্জন নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত রুচি বলে’ মেনে নিতে পারে না কেন, প্রাণহীন একটা অভ্যাসের অসহায়তা বলে’? তবু তো দিনের বেলা পাতের পাশে সে একটা বেড়াল নিয়ে বসে—পাড়ার কোন একটা হতচ্ছাড়া বেড়াল এরি মধ্যে তার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছে, যতোক্ষণ সে খেতে না নামে বেড়ালটা নিচে থেকে মিহিসুরে তাকে খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু রাতে এক টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসে’ নিরঞ্জনের সেন্টিমেন্টকে সম্মান রক্ষার

জন্যেই তাকে মাছ ভেঙে মুখে তুলতে হয়। নিরঞ্জন এ-সব বিষয়ে যেমন ভক্ত, তেমনি আবার স্বদেশী। বলে: মাছই হচ্ছে এয়োতির চিহ্ন।

তেমনি আরো একদিন সে তাকে ডেকে বললো: সিঁথিতে তুমি সিঁদুর দাও না কেন?

শ্রীপর্ণা হেসে বললে,—এই তো সিঁদুরের টিপটা কপালের ওপর জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তোমার চোখ খারাপ হ'য়ে গেলো নাকি?

—ও তো কপালে, সিঁথেয় সিঁদুর কই?

—সিঁথেয় দিয়ে কী হবে?

—না, সিঁথেয় সিঁদুর দিলে ভারি সুন্দর দেখায় মেয়েদের। চেহারায় চমৎকার একটা মহিমা আসে।

—ছাই আসে। শ্রীপর্ণা অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠলো: সিঁদুর দিতে-দিতে কপালের সামনেটায় ছোট একটা টাক পড়ে' যায়। যদি বা একবার সিঁথির রেখাটা বদলে দিতে ইচ্ছে করে তো এই সিঁদুরের জ্বালায় পারা যাবে না।

নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বল্‌লে,—কেন, প্রত্যেক বিবাহিত হিন্দু মেয়েই তো সিঁদুর দেয় সিঁথিতে।

শ্রীপর্ণা বলে' উঠলো: আমাদের হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছে নাকি?

নিষ্ঠুর যুক্তিটা যেন নিরঞ্জনকে আর পলক ফেলতে দিলো না। গুটিয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে' বল্‌লে,—তা হিন্দুধর্ম্ম ভয়ানক উদার, এক অর্থে আমরা তো হিন্দুই।

—সেই উদারতা আমার ললাটে শোভা পাক্। শ্রীপর্ণা অপরূপ হেসে উঠলো।

—না, নিরঞ্জন আবার তার জায়গায় এসে বসলো, তার স্বামীত্বের আসনে: না, সিঁদুর পরলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাবে, তুমি জানো না। একটা শিখার মতো সুন্দর। কালো মেঘের মাঝে অচঞ্চল একটি বিদ্যুৎ।

—ভারি সুন্দর দেখাবে ! শ্রীপর্ণার দুই চোখ ম্লান হ'য়ে এলো : এমনিতেই আমি সুন্দর নই ? আমার প্রেম তোমার ঐ সিঁদুরের চেয়ে বেশি রক্তিম নয় ?

নিরঞ্জন আর কোনো কথা বলতে পারলো না ! শ্রীপর্ণার মুখের কথা কটা তাকে যেন সেই মুহূর্তে অবশ করে' দিলে। তার যুক্তিতে সে মুগ্ধ হ'লো বটে, কিন্তু যুক্তিতে কেউ তৃপ্ত হ'তে পারে না। নিরঞ্জন উঠে পড়লো তার জায়গা ছেড়ে, নেমে এলো বন্ধুতার সমতায়, শ্রীপর্ণাকে কাছে টেনে এনে বল্‌লে,—কিন্তু কাব্যে সিঁদুরকে বলেছে শৃঙ্গারভূষণ—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রীপর্ণা হাসিতে লুটিয়ে পড়লো। বল্‌লে—কী তোমার চমৎকার রসবোধ! ও-সব লোহা-লক্কড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাগজে-কলমে তুমি তো এখন কবিতা লিখতে বসলেই পারো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্রীপর্ণা যখন এবার উপরে উঠে আসে, তখন চারদিকের ঘন দেওয়ালগুলো যেন অনেক দূরে সরে' দাঁড়ায় অনেকখানি শূন্যতা। হাতের কাছে সে আর তখন কোনো কাজ পায় না, কোনো আশ্রয়। দুপুরটা যেন তার বুকের মধ্যে

খাঁ-খাঁ করতে থাকে। এতোক্ষণ এখানে-সেখানে নানান কাজ-কর্মের আবর্তে সে ভেসে বেড়ায়, ইচ্ছে মাঝে চাকর-বাকরকে হাঁক পাড়ে, ধমকায়, নিরঞ্জনের সঙ্গে কাটা-কাটা কথায় ও আলাপে অনেকটা দূর সে পার হ'য়ে আসে। এতোক্ষণ সে ছিলো ব্যাপৃত, এখন কেমন যেন সে নিরাবলম্বের মতো এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে থাকে। ঢোকে এসে সে লাইব্রেরিতে, বিশাল সেই অক্ষরের অরণ্যে, কখনো-কখনো আগাগোড়া পড়তে পারবে ভেবে দু'-একটা বইও পেড়ে আনে, কিন্তু কখন কোন পরিচ্ছেদে কা'র হঠাৎ দুঃখ হ'বে উদ্‌ঘাটিত, সেই ভয়ে বেশিদূর সে আর এগোতে পারে না। আজকালকার লেখকরা ভীষণ নিষ্ঠুর, অনেক সময় নিয়তির চেয়েও, বেছে-বেছে যতো তারা দুঃখের [illegible] নিয়ে এসে জড়ো করে। তাদের চরিত্রদের যেন সুখ কখনও সয় না, যতো সুখী করে'ই আঁকো, অন্তরালে রয়েছে তার দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা, মাংসের পেছনে কঙ্কালের মতো। শ্রীপর্ণার এ-সব বই একটুও পড়তে ইচ্ছে করে না, জীবন নিয়ে এ-সব ঘোরতরো সমস্যা : তার চেয়ে ছেলেদের হাল্‌কা, মজাদার কোনো বই পেলে খানিকটা সময় সে ডুবে থাকতে পারতো। তেমন একটা বই-ও এতোগুলি সেল্‌ফের কোনো-একটাতেও সে খুঁজে পায় না। বোঝা বইর কবরের তলায় মৃত সেই অক্ষরের স্তূপের মধ্যে সে প্রেতগ্রস্তের মতো খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, যেন সহ্য করতে পারে না সেই স্তব্ধতা। তাড়াতাড়ি সে শোবার ঘরে চলে' আসে, একেক দিন বিছানা পেতেই শুয়ে পড়ে। যদি ঘুম আসে তো আসে, না এলেও চোখ বুজে জোর করে' পড়ে' থাকে

অনেকক্ষণ, তার সমস্ত অস্তিত্বকে সেই প্রবল অন্ধকারে বিলুপ্ত করে’ দিতে চায়। একেক দিন চোখ বুজেও পড়ে থাকা যায় না, দুপুরের রাশীকৃত নিঃশব্দতাটা যেন ভারি একটা পাথরের মতো তার বুক জুড়ে পড়ে’ থাকে। উঠে পড়ে সে এক ঝটকায়, ইচ্ছে করে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিয়ে এখুনি তাকে পাঁচটা করে’ দেয়। তখন থেকে নিশ্চিন্ত হ’য়ে সে নিরঞ্জনের জন্যে স্পষ্ট প্রতীক্ষা করতে পারে—যদিও একেক দিন, অনেক দিন থেকে প্রায়ই, কী দেরি করে’ যে আসে! তবু পাঁচটা বাজলেই, কি তারো কিছু আগে থেকে, সে বিকেলের ছোটখাটো কাজগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে, চাকরকে না খাটিয়ে নিজেই জল ভরতে পারে কুঁজোয়, কাপড়গুলি রাখতে কুচিয়ে, ঘর-দোর ঝাঁট দিতে, চুল বাঁধতে, গা-কাপড় ধুতে, এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতে আগাম। তবু তখন যেন আবার সে একটা সীমা দেখতে পায়, চলে’ আসে তার বর্ত্তমানের নিকটবর্ত্তিতায়। তবু তখন থেকে সে যেন খুঁজে পায় চারপাশে তার শিহরিত শরীর, উচ্চারিত হ’য়ে ওঠে তার স্থূল উপস্থিতি। শুধু দীর্ঘ সেই দুপুরগুলিই তার অসহ্য, সেও তখন দুপুরবেলারই মতো গলে’ যাচ্ছে তার নির্জ্জনতার রৌদ্রে, তার জ্বলন্ত শূন্যতায়। শুধু দুপুরগুলিই সে বইতে পারে না।

তারপর নিরঞ্জন যখন আসে, প্রায়ই দিনের ধূসরতম প্রান্ত দিয়ে, রাস্তায় বেজে ওঠে তার মোটরের এঞ্জিন, শ্রীপর্ণা সারা শরীরে শীতল, নিশ্চিন্ত একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে—যেন এই মাত্র সে খোলা দরজা পেয়ে কোন একটা আতঙ্কিত আবহাওয়া থেকে

ছুটে বেরিয়ে এলো। নিরঞ্জনের সান্নিধ্যে দেখতে-দেখতে আবার সে চলে' আসে তার কোজাগরী-রাত্রে, যে-রাত্রে ঘুম নেই কেবল জ্যোৎস্না। দুপুরের সমস্ত রুক্ষতা সে একটি হাসি দিয়ে মুছে ফেলে শরীর থেকে, যেমন শ্লেট থেকে অস্পষ্ট ক'টি পেন্সিলের লেখা, ম্রিয়মাণ ক'টি রেখায় ফুটে ওঠে মসৃণ কমনীয়তা। আবার তার লাস্য জাগে চোখে, পল্লবের ছায়ায় গালের কাছাকাছি নাকের দুই পাশে, চিবুকের ঢেউটিতে। সন্ধ্যাটা তাদের কী সুন্দর যে কাটে চা-য়ে ও গল্পে, ঠাট্টায় ও তর্কে, চেতনার ধূসর আবছায়ায়, সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ সেই গোধূলিতে, তা বলে' আর শেষ করা যায় না। তারপর তারা গাড়ি করে' বেড়াতে বেরোয়, বেড়াবার জন্যে নিরঞ্জন কিনেছে একটা প্রকাণ্ড শেভ্রোলে, জীবন্ত একটা পশুর মতো স্ফূর্তিমান। এবার সে নিজে ড্রাইভ করে না, সোফারকে হুইলে বসিয়ে নিজে সে এসে পিছনে বসে, শ্রীপর্ণার নিবিড় নিভৃতিতে। যেদিন যেখানে খুসি ও যেখানে খুসি নয়, সব জায়গাতেই তারা ঘুরে বেড়ায়, নিরুদ্দেশ নীরবতায়, গঙ্গার ধার থেকে সুরু করে' যশোর-রোড। তারা কেউ কখনো অবান্তর লোক পছন্দ করে না, তারা পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ, পরস্পরের মধ্যে প্রসারিত। একদিন তারা মিহিজাম পর্য্যন্ত মোটরে বেড়িয়ে এসেছিলো, অবিশ্যি নিরঞ্জনের আপিসের কী কাজে,—এমনি কেবল বেড়াতেই শ্রীপর্ণার ভালো লাগে, দূরে, আরো অনেক দূরে, যেতে-যেতে সেখানে নগরের সভ্যতা গেছে মিলিয়ে, গুঁড়িয়ে গেছে সব জিনিসের স্তূপ। কল্‌কাতা আর তার ভালো লাগে না। মিহিজামটা তার বেশ লেগেছিলো বটে, তাঁবুর তলায়

মেয়ের মতো ঘরকন্না করা, কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকতে পায় নি। তেমন একটা জায়গায়ো মানুষে আপিসের কাজে যায় এ-কথা বিশ্বাস করতে সেদিন শ্রীপর্ণার শুধু কাঁদতে বাকি ছিলো।

তারপর রাতে, রাতে আর শ্রীপর্ণার এতোটুকুও ভয় করে না, রাতে তার জন্যে আছে সুদীর্ঘ ঘুম।

এক রাতে ঘুমোবার আগে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—চলো না, কোথাও বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।

তার কথার সুরে নিরঞ্জন চমকে উঠলো: কেন, কল্‌কাতা কী দোষ করলো?

—তার এই একঘেয়েমি। এই কেবল বৈচিত্র্যের একঘেয়েমি। আমার আর একটুও ভালো লাগে না। রাত্রের অন্ধকারে শ্রীপর্ণাকে যেন কেমন করুণ শোনালো: চলো না আর কোথাও যাই, পৃথিবীর মানচিত্রে আরো কতো জায়গা আছে। বিয়ের পর আমরা তেমনি করে' একবারো বেড়ালুম না।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—আমার দিন কয়েকের জন্যে শিগ্‌গির একবার দার্জ্জিলিঙ যাবার কথা আছে: মোটরে। তুমি যাবে? যাবে তো চলো।

—সে তো তোমার আপিসের কাজে।

হ্যাঁ, তা ছাড়া আবার কি!

—না, না, শ্রীপর্ণা কণ্ঠস্বরে প্রায় কেঁদে উঠলো: তেমন করে' যাওয়া নয়, নয় ক্যালেণ্ডারের খুচরো ক'টা তারিখের জন্যে। ছুটি নিয়ে ছন্নছাড়ার মতো চলে' যাওয়া, ফিরি কি না-ফিরি

তার ঠিক নেই। যাবে? কী হ'বে এমনি একজায়গায় শিকড় গজিয়ে?

নিরঞ্জন তন্দ্রার মধ্যে থেকে হেসে উঠলো, শোনালো তাকে একটা অভ্যাসচালিত নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো: কল্‌কাতা ছেড়ে দু'দণ্ড বাইরে থাকি আমার সাধ্য কী! আমার কাজকর্ম কে দেখবে-শুনবে?

—কাজকর্ম! শ্রীপর্ণা হাসলো না দীর্ঘশ্বাস ফেললো বোঝা গেলো না: কাজকর্ম করে' কী হ'বে?

—কী হ'বে? নিরঞ্জন হাসির ছলে অদ্ভুত একটা শব্দ করে' উঠলো: অনেক বেড়িয়ে এসে পেট্রোলের ঝাঁজে মাথাটা তোমার গরম হ'য়ে আছে। তুমি এবার ঘুমোও।

শ্রীপর্ণা প্রাণপণে রইলো চোখ বুজে। সে যেন আর কল্‌কাতায় নেই।

সাত

রাতে আর শ্রীপর্ণার মনে থাকে না দুপুরের সেই দুর্ব্বহ নির্জ্জনতা, যখন দেয়ালের প্রখর শুভ্রতা অনিমেষ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে, সাদা শূন্যতার মতো, যখন চোখে না আসে ঘুম, মন বসে না কোনো কাজে, রোদে দ্রুত তীক্ষ্ণ রেখায় পাখা-মেলে-দেয়া পাখির মতো যখন সে আকাশ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে উড়ে-বেড়ায়। মনে থাকে না তার রাতের পর রুদন্তী এই রৌদ্র। ভুলে'ই থাকে সে, এক-রকম ভুলে'ই আছে সে সব।

কিন্তু সেদিন এগারোটারো আগে নিরঞ্জনকে স্নানের জন্যে উঠতে দেখে শ্রীপর্ণা বিবর্ণ মুখে বললে,—আজ এতো সকাল-সকাল?

—হ্যাঁ, আজ আমার আপিসে জরুরি একটা মিটিং আছে। নিরঞ্জন গায়ের জামাটা খুলে ফেললো : বারোটায়। না গেলেই নয়।

—তোমার আবার মিটিং কী? তোমার হচ্ছে ওয়ান-ম্যান্ বিজ্নেস্, ইচ্ছে হ'লে রাখবে, ইচ্ছে হ'লে তুলে দেবে। তোমার আবার মিটিং কা'র সঙ্গে?

নিরঞ্জন তার মুখের দিকে চেয়ে তরল চোখে হেসে উঠলো : বড়ো একটা এমেরিকান ফার্মের সঙ্গে নতুন, হেভি একটা কন্ট্র্যাক্ট। ওরা আজ আসবে আমার আপিসে। চট্ করে' চানটা এবার করে' নিতে হয়। ক্ষিপ্র হাতে টেবিলটা থেকে স্নানের এটা-ওটা সে কুড়িয়ে নিতে লাগলো।

খালি গায়ে, যেন আর তার সেই বন্য অন্তর সবল লাবণ্য নেই, দেখাচ্ছে তাকে এখন মসৃণ, নিষ্ঠুর, ক্ষিপ্র একটুকরো যন্ত্র, প্রাণহীনতার পালিশে উঠেছে ঝক্‌ঝক্ করে'।

শ্রীপর্ণার গলা হঠাৎ শীতের হাওয়ার মতো তীক্ষ্ণ, ঠাণ্ডা শোনালো : তুমি কি রোজ-রোজ এমনি আপিস করবে নাকি? সমস্ত দিন, বারোটা থেকে ছ'টা, যখন খুসি, যতোক্ষণ তোমার ইচ্ছে?

নিরঞ্জন থমকে দাঁড়ালো : কী করবো বলো? নানান রকম কাজ, সব দেখতে হয় একা—একাই আমি একশো। নিরঞ্জন অস্ফুট একটু হাসবার চেষ্টা করলো : চেষ্টা তো করি আরো আগে ফিরতে, কিন্তু দিনগুলি ভারি ছোট। সময় যেন কেবলই হাত থেকে পিছলে পড়ে' যায়,—সময় এতো কম।

শ্রীপর্ণা রূঢ় গলায় বল্‌লে,—কিন্তু, কিন্তু কাজ, এতো কাজ করে' তোমার কী হ'বে?

বাথরুমের দরজার কাছে এসে নিরঞ্জন আবার থামলো : কাজ করবো না তো, করবো কী?

শ্রীপর্ণা কী বলবে কিছুই ভেবে পেলো না। প্রশ্নটা এমন সমাপ্ত।

—সুস্থ, জীবন্ত একটা পুরুষ, কাজ ছাড়া বাঁচি কী করে’? আর এতো বিচিত্র কাজ, এতো রোমাঞ্চকর। নিরঞ্জন তার বুকের ও কাঁধের স্ফীত-স্ফার পেশীগুলিতে পৌরুষের প্রচ্ছন্ন একটা দীপ্তি এনে বল্‌লে—কাজ করবো না তো এনিমিক হ’য়ে বিছানায় শুয়ে কাৎরাবো নাকি খালি? তুমিই বলো না, কী করলে তোমার পছন্দ হয়?

শ্রীপর্ণার দুই চোখ বিষাদে একটু ছল্‌ছলিয়ে এলো: কিন্তু আমি একা সমস্ত দিন কী করে’ কাটাই?

—বা রে, নিরঞ্জন বিস্মিত মুখে বল্‌লে,—এতো প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরি, বই পড়বে বসে’-বসে’। এতো তবে কষ্ট করে’ পাশ করেছ কিসের জন্যে?

—বইয়ের ভীড়ে আমি ভীষণ হাঁপিয়ে উঠি। যেমনি তার চুল, তেমনি ছাই-রঙের তার গলা, শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—মনে হয়, কতো আমি পড়বো, কতোটুকু আমার সময়? হাজার বছর বাঁচলেও তো আমি কিছু শেষ করতে পারবো না। তখন এতো ক্লান্ত লাগে, এতো ভয় করে, বইয়ের একটা লাইনও আর পড়তে ইচ্ছে করে না। সময় আমারো কিছু বেশি নয়।

—বেশ তো, যদি বলো, তোমার জন্যে একটি ভালো দেখে কম্প্যানিয়ন রেখে দি। বিজ্ঞাপনে অনেক ইউরোপীয়ান মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এতোদিন বলো নি কেন? তার সঙ্গে বসে’ যতো খুসি গল্প করো না দুপুরবেলা, শিখতেও পারবে কতো কিছু।

—মাইনে দিয়ে রাখতে হ’বে কম্প্যানিয়ন, আর গল্প করবো বসে’ ইংরিজিতে? এক ফুঁয়ে সমস্ত প্রস্তাবটা শ্রীপর্ণা উড়িয়ে দিলো।

এক পা এগিয়ে’ এসে রুক্ষ গলায় বললে,—কিন্তু তুমি কেন এমনি কাজে, টাকা রোজগার করার তুচ্ছ, জঘন্য কাজে নিজেকে এমনি ক্ষয় করে’ ফেলবে? টাকা, শুধু টাকা দিয়ে তোমার হ’বে কী জিগ্‌গেস করি?

—বা, টাকা রোজগার না করলে খাবো কী দু’বেলা?

—আহা, কতোঁ তোমার খাবার ভাবনা! চোখের উপর শ্রীপর্ণা ভুরু দু’টো ঘন করে’ তুললো; বল্‌লে,—যতো পাই, ততো চাই—এ কী তোমার দৈত্যাকার ক্ষুধা! এতো টাকা দিয়ে তুমি কী করবে, রাখবে কোথায়?

হাসতে-হাসতে নিরঞ্জন বাথরুমের দরজাটা খুলে ফেললো। ভিতরে চলে যেতে-যেতে বললে,—তার চেয়ে বলো না তোমার জন্যে আজ আবার কী এনে দিতে হ’বে, নতুন কোন শাড়ি বা নতুন কোন গয়না! অতো ঘুরিয়ে বললে আমি সহজে বুঝতে পারি না।

শ্রীপর্ণাকে তার পরনের সাড়ি ও গায়ের গয়নাগুলি যেন দংশন করতে লাগলো। যেন সে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিরঞ্জনের বিজ্ঞাপনের রঙিন একটা পৃষ্ঠা, তার লাভবান ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন। সে আর কিছু নয়, নিরঞ্জনের কাছে শুধু একটা অপব্যয়ের উপাদান, তার ঐশ্বর্য্যের উদাহরণ। শ্রীপর্ণাকে যেন সে তেমনি চোখে দেখে, যেমন তার বাড়ি, তার ফার্ণিচার, তার মোটর, তার ব্যাঙ্ক-য়্যাকাউন্ট। তার ভিতর দিয়ে নিরঞ্জন প্রকাশ করছে, আর কিছু নয়, শুধু তার সম্পৎশালিতার দম্ভ, শ্রীপর্ণার অস্তিত্বের মধ্যস্থতায়। শ্রীপর্ণা যেন

শিশুর একটা খেলনা, নিরঞ্জনের হাতেঃ সে যেন অবসাদিত হ'য়ে এসেছে শুধু একটা চলৎশক্তিমান অভ্যস্ত যান্ত্রিকতায়। তার শরীরটা যেন শুধু একপিণ্ড মাংস, কয়েকটা হাড়ের যোগফল। শ্রীপর্ণা ঘরের চারদিকে চেয়ে সমস্ত কিছু যেন শূন্য দেখলো! যেন এটা বাড়ি নয়, বাস করবার একটা যন্ত্রঃ কোথাও যেন হৃদয়ের স্পন্দন নেই, শুধু হাড়ময় নিষ্ঠুর বিধিবদ্ধতা। যে সব জিনিষ বেশি দিন ধরে' টিঁকিয়ে, তাতে বিলাসিতার কোনো মাহাত্ম্য নেই—বেশি দিন ধরে'ই যদি টিঁকলো, তবে ওটার জায়গায় ফের নতুন জিনিস কেনবার সুযোগ পাওয়া গেলো কোথায়? ওদিকে ফ্যাসান যে গেছে বদ্‌লে। তার সঙ্গে জীবনে ও জিনিসে সঙ্গতি না রেখে চল্‌লে কিসের এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা? যে জিনিস্ টিঁকলো সে তো রইলো অনেক জায়গা জুড়ে, অনড় একটা অত্যাচারের মতো। তাই টেঁকসই জিনিসের দিকে সভ্য, ব্যস্ত লোকের আকর্ষণ নেইঃ জিনিস যতো ঠুনকো, ততোই তার সম্পদ পায় প্রকাশের অবকাশ, ততোই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় আধুনিকতরো জিনিসের আমদানি করা চলে। নিরঞ্জন সেই সভ্যতারই প্রতীক, মুহূর্ত্তমেয়, প্রমত্ত সভ্যতার। সব যেন সে তার পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছে তার বিলাসের উপকরণ হিসেবে: তার প্রেম, তার স্বামীত্ব, তার সুখ। প্রেম—তার কাছে প্রেম হচ্ছে জীবনের একটা প্রসাধন, জৈবনীতির প্রথম সোপান, তাকে নিয়ে অন্তত বিয়ের পর অনর্থক বাড়াবাড়ি করাটা মূর্খতা, স্নায়ুর অপব্যয়। সে যে স্বামী, তার মানে তার সঙ্গে মন

মজিয়ে থাকো, হাতের কাছে দরকার মতো এটা-ওটা এগিয়ে দাও, দরকার হ'লে আবদার করো, এটায়-ওটায় খাটিয়ে নাও। সুখ—সুখ আবার কা'কে বলে? প্রতি মুহূর্তে এই টপ্-গিয়ারে চলা, যখন যা খুসি কিনে নেবার স্বাধীনতা, যা-সব দেখে প্রতিবেশীদের প্রতি মুহূর্তে চোখ টাটাচ্ছে, তাই যদি না সুখ হয়, সুখ তবে কোথায় পৃথিবীতে? শ্রীপর্ণার চোখ পড়লো গিয়ে তার ড্রেসিং-টেব্‌লের উপর—থরে-থরে সাজানো আছে যেখানে তার প্রসাধনের টুকিটাকি, ছোটখাটো একটা দোকানের টুকরো। শ্রীপর্ণা হাঁপিয়ে উঠলো, তার সৌন্দর্য্যটা পর্য্যন্ত একটা চামড়ার জিনিস, বিশেষ একটা ইন্‌ডাষ্ট্রির অঙ্গ। কী সে হ'বে নয়, কেমন সে দেখতে হ'বে! শ্রীপর্ণা হাঁপিয়ে উঠলো, মনে হলো যে-তন্তু দিয়ে তার এই জীবন বোনা হয়েছে, তা যেন ভয়ানক খেলো, দু'দিন ব্যবহার করতে-না-করতেই তার রঙ যাচ্ছে জ্বলে', আঁশ যাচ্ছে ছিঁড়ে, এখানে-ওখানে ফুটো বেরিয়ে পড়ছে।

বাথরুম থেকে নিরঞ্জন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। বল্‌লে, বলো, কী চাই? কী তোমার জন্যে নিয়ে আসতে হ'বে?

—কিছু নিয়ে আসতে হ'বে না। শ্রীপর্ণা গম্ভীর মুখে বল্‌লে, —তোমাকে একটা কথা সত্যি-সত্যি জিগ্‌গেস করি। সত্যি ক'রে বলো, তুমি আরো টাকা রোজগার করতে চাচ্ছ কেন? এতো টাকা নিয়ে তুমি কী করবে?

টাকার কথায় নিরঞ্জন কখনো গম্ভীর হ'তে শেখে নি। টাকা আবার মানুষের কখনো বেশি হয় নাকি?

—হয় না? নিশ্চয়ই হয়। শ্রীপর্ণা ঝাঁজিয়ে উঠলো: একটা সীমা পর্য্যন্তই টাকা টাকা, তারপরে সেগুলো কতোগুলো ধুলো, ঘৃণ্য কতোগুলো আবর্জ্জনা।

—বলো কী? নিরঞ্জন আয়নায় চুল ব্রাস্ করতে-করতে বল্‌লে,—সেই উদ্বৃত্তিতেই তো মানুষের উৎসব। প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে গিয়ে সেইখানেই তো ঐশ্বর্য্যের মুক্তি।

—কিন্তু তুমি কী উৎসবটা করছো শুনি?

—আমি এখনো প্রয়োজনের সীমা পেরোতে পারলুম কই? আয়নায় নিরঞ্জনের হাসি দেখা গেলো, শ্রীপর্ণার মনে হ'লো হিংস্র, ক্ষুধার্ত্ত: এই মাসেই আমাকে আরেকটা গাড়ী কিনতে হ'বে, এই বাড়িটা বদলাবো ভাবছি, মাথায় নতুন একটা ডিজাইন খেলছে, পরের রুচির সঙ্গে মিলিয়ে থাকতে গিয়ে গা-টা কেমন ঘিনঘিন করছে সব সময়।

—একশোটা বাড়িই করো আর গাড়ীই করো, শোবার সময় সেই একটিমাত্র তো বিছানা, চড়বার সময় একটিমাত্র তো গাড়ি—তোমার থাকবার জন্যে পৃথিবীতে মাত্র দু'টি হাত জায়গা। শ্রীপর্ণা হাসতে গিয়ে আরো গম্ভীর হ'য়ে গেলো: থাকবার জন্য সমস্তগুলি বাড়ি তো আর একসঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারবে না, চলবার সময় রাস্তায় শুধু একখানি মোটর নিয়েই তোমায় বেরুতে হ'বে। কী আছে তোমার এই আতিশয্যে? এই আত্মম্ভরিতায়?

নিরঞ্জন ফিরে দাঁড়ালো: কী হ'লো তোমার আজ? খুব বড়ো-বড়ো শক্ত-শক্ত কথা বলছ!

শ্রীপর্ণা এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো; বললে,—এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও।

—কাজ ছেড়ে দেবো কী? নিরঞ্জন যেন কথাটা গায়েও মাখলো না: বাবার আমলের ব্যবসা, কতো নাম, কতো প্রতিপত্তি, তা আমি ছেড়ে দেবো?

—হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে। তুমিই তো বলেছিলে ইচ্ছে করলেই একদিন ছেড়ে দিতে পারো।

নিরঞ্জন হেসে উঠলো: ইচ্ছেটা হ'তে যাবে কেন এ সুসময়ে? দস্তুরমতো ভালো অবস্থা।

—তোমার ব্যবসার ভালো অবস্থা বলে'ই পৃথিবীর সবাইর অবস্থা ভালো?

—বা, টাকা আসছে যে মাসে-মাসে।

—আসুক। শ্রীপর্ণার চোখ অনুনয়ে নরম হ'য়ে এলো: আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে। আরো, আরো, আরো টাকা দিয়ে আমরা কী করবো? কী হ'বে কেবল এ সব জিনিসের স্তূপ বাড়িয়ে, টাকার সংখ্যায় শূন্য যোগ দিয়ে-দিয়ে? তোমার, আমাদের একসময়েও কি থামতে হ'বে না? তার চেয়ে চলো এ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমরা কোথাও চ'লে যাই।

নিরঞ্জন অভিভূতের মতো বললে,—কোথায়?

শ্রীপর্ণা যেন দিনের আলোয় স্বপ্ন দেখছে, বললে,—ধরো ইউরোপ। ইটালির কোন গ্রামে, সমুদ্রের ধারে আমরা বাসা করে' থাকবো। ইটালি ভারি সস্তা, ভারি সুখী। যাবে?

—ছাড়ো, ছাড়ো, বারোটার সময় আমার মিটিং। নিরঞ্জন

হাসিমুখে ছট্‌ফট্‌ করে' উঠলো: ভালো পার্টি, দাওটা মারতেই হ'বে যে করে' পারি। বলে কিনা এ আমি ছেড়ে দেবো, এতো যেখানে কাঁচা পয়সা! দেশটা আইনে না হ'য়ে যদি ইকনমিক্‌সে শাসিত হ'তো পর্ণা, তবে তোমার ঠিক ফাঁসি হ'য়ে যেতো বলে' রাখছি।

—তার আর কী বাকি আছে!

—বলে, কিনা সাধা পয়সা আমি ছেড়ে দেব! নিরঞ্জন শিশুর মতো হেসে উঠলো, মূর্খ একটা শিশুর মতো: বলে টাকা দিয়ে কী হ'বে? কী আবার হ'বে! ব্যাঙ্কে জমবে, ব্যাঙ্ক আবার নতুন-নতুন ব্যবসাকে উৎসাহ দেবে। একটা ব্যবসা থেকে আরো অনেক ব্যবসা: দেশের চেহারা যাবে ফিরে। চলো, চলো, আমাকে খেতে দেবে চলো। নিরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলো: টাকা দিয়ে কতো ভালো কাজ করা যায়, পরের কতো উপকার, শ্রীপর্ণার ইচ্ছে হ'লো দুই প্রবল হাত দিয়ে মুখটা তার এবার চেপে ধরে—নিরঞ্জন নামবার সঙ্গে-সঙ্গে বলে'ই চলেছে সমানে: পৃথিবীর কতো কীর্ত্তি। টাকা যদি সত্যি কিছু থাকে, তবে গরিবদের বিলিয়েও তো দিতে পারি, দিয়ে দিতে পারি কোনো চ্যারিটিতে—টাকা থাকলে কী না করা যায়? টাকা তুমি বেশি দেখলে?

শ্রীপর্ণা হাসলো: তোমার উদারতাকে অনেক ধন্যবাদ। যে-টাকা দস্যুতা করে' গরিবদের থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ, তাই তাদের দিয়ে যেতে চাও করুণা করে'! তাদের পাওনা ফিরিয়ে না দিয়ে দিতে চাও তাদের ভিক্ষা! কীর্ত্তিই তো বটে।

নিরঞ্জন তার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে রইলো।

—নাও বোসো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, বারোটা প্রায় বাজে। স্তোফারকে গাড়ি বা'র করতে বলেছ?

আজ আর দুপুরকে শ্রীপর্ণার ভয় নেই। সে শুয়ে-শুয়ে অনেক ভাবতে পারে এখন—অলস অশরীরী যতো চিন্তা। এই সুন্দর দুপুরবেলা, যখন কোথায় না-জানি ট্রেন চলেছে রৌদ্রদগ্ধ মাঠের উপর দিয়ে, গ্রাম্য পথের পাশে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে কোথায় না-জানি বসেছে এক চাষী, যখন কোনো স্কুলে নিচু-ক্লাশের দুষ্টু, চঞ্চল ছেলেরা গোলমাল করে' চলেছে অফুরন্ত।

আট

সেদিন দুপুরবেলা ঝিল্‌মিলে রোদে কাঁপতে-কাঁপতে ফুরফুরে একটা প্রজাপতি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো, রঙের মৃদুল একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো। শ্রীপর্ণা ছিলো শুয়ে, শরীরে রাশীভূত আলস্যে : অল্প-অল্প আবার শীত পড়ে' এসেছে বলে' ভঙ্গিতে তার একটি উষ্ণ আড়ষ্টতা। বিশেষ কিছুই সে ভাবছিলো না, শুয়ে ছিলো সে তার মধুর মনোহীনতায়, নিরুদ্দেশ অস্তিত্বের শ্রান্তিতে, এমনি সময়, কী ক'রে কে জানে, সেই প্রজাপতির উপর তার চোখ পড়লো। হালকা, রঙচঙে দু'টি পাখায় প্রজাপতি দেয়ালে-দেয়ালে রোদের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিচ্ছে।

কখন ও কিসে যে মানুষের কেমন করে' কী হয় বোঝা কঠিন, কোঁথা থেকে কোথায় সে চলে' আসে। প্রজাপতির দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর শীতের ধারালো দীর্ঘশ্বাসের মতো কেঁপে উঠলো : অনুপস্থিত তার মন, একতাল পাষাণের মতো মৃত সেই ভার, কোথা থেকে এসে তাকে যেন পিষে ধরলে। প্রজাপতির মতো লঘু পাখায় তার মনও যেন

উড়তে লাগলো তার শরীরের রৌদ্রে। আর সে নিজেকে মুছে ফেলতে পারলো না।

এখন না-জানি সে কতো বড়োটি হ'য়ে উঠেছে! হয়তো তাকে ইস্কুলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, সব চেয়ে নিচু ক্লাশে, আর হয়তো তার কোমর থেকে বারে-বারে বেল্‌টটা খসে' পড়ে না। মাথায় এবড়ো-খেবড়ো একটা সিথি, জুলপি দিয়ে হয়তো এখনো দুয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে, সদ্য স্নান ক'রে' এসেছে বলে' মুখখানি তার কাটা একটুকরো শশার মতো কচি, গায়ে হয়তো ডোরা-কাটা সার্ট, প্যান্টের নিচে ঢোকানো, হাতা দু'টো দুই কনুয়ের কাছে গুটিয়ে আছে,—কিম্বা কোনোদিন বা বুক-খোলা ছোট কোট, তার যতো রাজ্যের সব বই নিয়ে চলেছে সে ইস্কুলে। সামনাসামনি কোথাও একটা স্কুল আছে নিশ্চয়ই, ট্র্যাম-রাস্তা পেরোতে হয় কিনা কে জানে? সঙ্গে নিশ্চয়ই তা হ'লে বাড়ি থেকে একটা চাকর যায়—তাকে তাড়া দিয়ে সংসারের কাজ-কর্ম্ম থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আদিত্যর সে কী ব্যস্ততা —চাকরটা যেন তার চাকর নয়। নিয়ে আসবার সময় সে আবার ঠিক সময় স্কুলে পৌছোয় কিনা কে বলবে? হয়তো একদিন সে আর ভুল ক'রে' গেলোই না ধরো, আদিত্য এদিকে-ওদিকে অনেকক্ষণ ঘুর-ঘুর করলে, তার ভীষণ খিদে পেয়েছে, তবুও চাকরের দেখা নেই, তারপর আদিত্য নিজেই হয়তো বাড়ির মুখে পা বাড়ালো। একাই হয়তো তাকে ট্র্যামের রাস্তা পার হ'তে হ'বে—বালিগঞ্জের ট্র্যাম ঘন-ঘন আসে না, এই যা ভরসা। শ্রীপর্ণা নিজের মনে নিজেই হেসে উঠলো: আদিত্যের জন্যে তার

যতো ভাবনা। বাড়িতে তার ঠাকুমা, তার ‘থা’ আছে না? ইচ্ছে হ’লে তিনিই উঠিয়ে দেবেন সেই দায়িত্বহীন চাকর। কিম্বা কে জানে, হয়তো এরি মধ্যেই আদিত্য খুব চালাক হ’য়ে উঠেছে: রাস্তা পেরোনো কী, দিব্যি সে ট্রামের ফুট-বোর্ডে চড়ে’ বিনা-টিকিটে খানিকটা এগিয়ে আসে বাড়ির দিকে, ইনস্পেক্টরকে দেখতে পেলেই দুষ্টু মুখে হাসতে-হাসতে তাড়াতাড়ি সে নেমে পড়ে, নিখুঁত পায়ে পিছন দিকে আধখানা হেলান দিয়ে। সমস্ত ছবিটি শ্রীপর্ণা যেন তার চোখের সামনে দেখতে পায় স্পষ্ট—কী ভালোই যে তার লাগে এই রকম ছবি আঁকতে! উজ্জ্বল ছবি থেকে আবার সে বিষণ্ণ ছবিতে চলে’ আসে—তার মনের সঙ্গে ঝাপ্‌সা, বিষণ্ণ ছবিগুলিই বেশি খাপ খায়—অশ্রুজলে তুলি বুলানো: বিষণ্ণ ছবিগুলিই জলছবির মতো তার মনের পৃষ্ঠায় অনেকক্ষণ বসে’ থাকে। কে তার জামা-কাপড়গুলি গুছিয়ে রাখে—হয়তো এক ধার থেকে সবগুলি ফর্সা কোট-প্যান্টই সে পরে’ ময়লা করে’ ফেলবে; কে-বা তার নতুন বইগুলিতে মলাট দিয়ে দেয়—হয়তো হাতের ঘাম লেগে-লেগে দু’দিনেই তাদের পৃষ্ঠাগুলি আলগা হ’য়ে এসেছে। কে বা দেখে কতোটুকু তার পড়া, কে-বা তা তৈরি করিয়ে দেবে সময় নষ্ট ক’রে’। হয়তো ঠাকুরমার আঁচল ধরে’ টিফিনের পয়সার জন্যে সে মিনমিনে গলায় বায়না ধরেছে—ঠাকুমার দু’হাতে দু’শো কাজ—কোনো-দিন বা দু’টো পয়সা দেন, কোনোদিন বা দেন না। ছোট্ট পকেটটিতে সে-দু’টি পয়সা ফেলে আদিত্যের সে কী ফুর্তি: কিনবে হয়তো কাঠি-বরফ বা আলু-কাব্‌লি, কিম্বা খুব যদি খিদে না পায়,

তবে পয়সা দু'টি সে জমিয়ে রাখবে। 'এমনি করে' হয়তো ঠাকুরমার বাক্সেই তার অনেক পয়সা জমেছে। আরো কিছু সে তা দিয়ে বিদেশ যাবে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে না-জানি সে কি খায়,—জেঠিমাদের কেউ থাকলে অবিশ্যি কোনো কথা নেই, না থাকলে বুড়ো ঠাকুমাই বা উঠে তখন তাকে কী তৈরি করে' দেবে—হয়তো টোপের নিচে সকালবেলাকার ভাত বাড়া থাকে, কড়কড়ে, ঠাণ্ডা ভাত : হাত-পা ধুলো কি না-ধুলো, তাই সে বসলো গিলতে, বড়ো-বড়ো হাঁ করে' ফেলে-ছড়িয়ে তার সেই ক্ষুধার্ত্ত খাওয়াটি পর্য্যন্ত শ্রীপর্ণা দেখতে পাচ্ছে। তারপর আঁচিয়ে সার্ট দিয়ে ভিজে মুখ মুছতে-মুছতেই তার দৌড়—সামনের ছোট কম্পাউণ্ডে, কিম্বা হয়তো দূরে কোনো পার্কে : খেলা তাকে ডাকছে। হয়তো রবারের একটা বল, হয়তো বা শূন্য হাতে।এমনি সব নাম-না-জানা ছেলেমানসি খেলা। কা'দের সঙ্গে সে মেশে কে তার খবর রাখে, হয়তো কোনোদিন কা'র সঙ্গে মারামারি করে'ই ফিরলো, কপালটা ফুলো, চোখের নিচেটা কেটে গেছে। আহত মুখে তার সেই দুষ্টু হাসিটি কী সুন্দর! সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িতে এসে সে বই নিয়ে একটু বসলো কি না-বসলো, ঠাকুরের ডাকে কোনো রকমে খাওয়া সেরে নিলো ঘুমুতে-ঘুমুতে, কোথায়, কোন ঘরে সে আজকাল শোয়, হয়তো ছোট তক্তপোষের উপর তার জন্যে এখন আলাদা বিছানা—জামাটা গায়ের থেকে এক টানে খুলে নিয়েই তার ঘুম, ঠাণ্ডা, দীর্ঘ ঘুম। হয়তো ছোট-বৌর কথা তার একটুও মনে নেই, একবারো মনে পড়ে না। সেই ট্রাইসিকেলটা হয়তো ভাঙা

অবস্থায় বারান্দার এক কোণে পড়ে' আছে। সেটায় আর চড়বে কী, সে এখন বড়ো হ'য়ে উঠেছে না, ইস্কুলে পড়ছে না? সেটায় চড়লে হাঁটু ছু'টো তার চোখা হ'য়ে কানের কাছে উঠে আসে।

দুপুরগুলি শ্রীপর্ণা আর একা থাকে না, চারদিকের সাদা, শূন্য দেয়ালে এমনি করে' সে দিবাস্বপ্ন দেখে।

তাই বলে', আমি সুখী নই, এ-কথা জানায় শ্রীপর্ণার সাধ্য কী! আমি সুখী নই, এ-কথা বুঝতে দেয়াই তো আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে! আমি সুখী, ছলে-বলে পরকে সেটা জানানোই তো হচ্ছে সভ্যতা। শ্রীপর্ণাও তাই তার সুখ বিকীর্ণ করে' চলেছে সংসারে, পলতেয় আগুন না ধরে' মোমে ধরলে মোমবাতিটা যেমন বাতাসে ফর্‌ফর্ করে, তেমনি। এতো ঐশ্বর্য্য, এতো উপকরণের মাঝেও যদি সে সুখী না হয়, তবে শোকঘন শ্মশানে বসে' অনায়াসে তরল আনন্দোৎসবও করা যায়। সুখী না হ'য়ে তার উপায় কোথায়! তবু, তাই, এখনো শ্রীপর্ণা হাসছে, জোরে, শব্দ করে', এখনো শরীরে আনছে ঢেউ, লীলার পিচ্ছিলতা, পরছে দামি-দামি সাড়ি, জমকালো গয়না—সাড়িমাত্রেই তার দামি, গয়নামাত্রেই তার জমকালো—ভরিয়ে তুলছে উপর-নিচের সমস্ত জায়গা তার অবসরের শূন্যতা দিয়ে; মোটরে বেড়াচ্ছে, যাচ্ছে পার্টিতে, সোসাইটির শিখছে সকল ছলা-কলা। দিনের বেলা সূর্য্যমুখী থেকে রাতের বেলা ফুটে উঠছে সে রজনীগন্ধা।

ভালোই আছে সে, তার সমৃদ্ধির স্পর্দ্ধিত উচ্ছলতায়। যখন যা সে চায় তাই করতে পারে, যখন যা তার ভালো লাগবে মনে

হয়: আধুনিক সভ্যতায় ভালো-লাগাটাও তো একটা পণ্যদ্রব্য, টাকা থাকলে অনায়াসেই তা কিনে আনা যায়। যখন যা তার ভালো লাগে, এক মুহূর্ত্তের পরে আরেক মুহূর্ত্ত। সংসারে যার টাকা আছে অফুরন্ত, তার আবার দুঃখ কী, দুঃখ করবার তার সময় কোথায়? দুঃখ করলেই তো সে দরিদ্র হ'য়ে গেলো: দুঃখের পরিপূরকই হচ্ছে টাকা। টাকা দিয়ে আমরা অমরত্ব পর্য্যন্ত কিনে নিতে পারি। না, শ্রীপর্ণার দুঃখ কোথায়? কী তার চাই বলো, এখুনি সে তা পাচ্ছে, চাবি ঘুরিয়ে দেরাজটা তার একবার টানলেই হ'লো। এমন গভীর প্রাণতপ্ত প্রেম, বুদ্ধিপ্রেরিত সবল সহানুভূতি, নির্বাধ স্বাধীনতা—তার আর কী চাই, শ্রীপর্ণা নাম করুক, এখুনি টাকা ফেলে সে তা সংগ্রহ করে' আনতে পারবে। এর পর তার আর কী চাই—শরীরময় এই সুখোচ্ছ্বাস, জীবনময় এই সমর্পণের তৃপ্তি, মৃত্যুময় এই অতল পরিপূর্ণতা। এর পরে মানুষে আর কী চাইতে পারে, চাইলেই যখন সে তা পায়!

তবু যতোই শ্রীপর্ণা সুখের শিখা জ্বালতে লাগলো তার চারপাশে, তাকে দেখালো ঠিক যেন কোনো সমাধিস্তূপের উপর পোঁচের পর পোঁচ চূণকাম করা হচ্ছে। যতোই সে হাসে, একবারো তার হাসি সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয় না, সে-হাসির তলায় কোথায় একটি ছায়া করে ঝিকিমিকি। যতোই সে সাজুক, তার কঙ্কালটা সে ঢেকে ফেলতে পারছে না, যতোই সে বেড়াক, কোনোটাই যেন তার যাবার জায়গা নয়। তবু তাকে সাজতে হ'বে, বেড়াতে হ'বে মোটরে করে', নিরঞ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে তারো

অনেক নেমন্তন্ন। দেখতে হ'বে তার সৌভাগ্যের পেখম বিস্তার করে,' আকাশে মেঘ করুক বা না-করুক। সভ্য হ'বার এতো বোঝা!

নিরঞ্জনেরো চোখ এড়ায় নি শ্রীপর্ণা কেমন দিনে-দিনে বোতলে বাঁচিয়ে রাখা ফুলের বৃন্তের মতো শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এ নিয়ে সে আর কী বাড়াবাড়ি করতে পারে—বিয়ের পর এক বছর পুরতে চললো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের সেই কলেজ-পালানো যুবকের মতো সে তো আর আপিস কামাই করে' দুপুরবেলা এসে স্ত্রীর সঙ্গে সোহাগ করতে পারে না,—শ্রীপর্ণার রুচিও তেমন স্যাঁতসেঁতে নয়। যদি শরীর খারাপ মনে করে' থাকে, এখুনি নিরঞ্জন ডাক্তার নিয়ে আসতে পারে গণ্ডায়-গণ্ডায়, নার্স রেখে দিতে পারে ঝুড়ি-ঝুড়ি। এখানে যদি তার ভাল না লাগে, এই তো সেদিন দার্জ্জিলিঙ ঘুরে এলো, বেশ তো, দিন কয়েক পরে নিরঞ্জন ভিজিয়ানাগ্রাম যাচ্ছে, তাকে নিয়ে যাবে না-হয় সঙ্গে করে'। এমনি একলাই যদি বা সে যেতে চায়, নিরঞ্জনের তাতেও আপত্তি নেই, বলুক না, এখুনি গিয়ে সে বার্থ রিজার্ভ করে' আসছে, সঙ্গে না-হয় আরো একটি সহযাত্রিনীর। সেদিক দিয়ে শ্রীপর্ণা আবার ভীষণ ভীরু, ভীষণ পতিপ্রাণা—নিরঞ্জনকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে? সমস্তদিন পরে নিরঞ্জন সেই যে সন্ধ্যায় নির্ভুল বাড়ি ফিরে আসে, সেই তো তার আশ্রয়। তবেই তো বুঝতে পারো, নিরঞ্জন মুচকে হেসে বলে, দিনের বেলার এই বিচ্ছেদটা কতো অপরূপ! তার পিঠের দিকে গোপনে একটি নারী চুপ করে' বসে' আছে তার ফেরবার প্রতীক্ষায়, এই

চেতনাটিই তার কর্ম্মে দেয় প্রেরণা ; নইলে সে পারতোও না এতো কাজ করতে, বলতে কি, শ্রীপর্ণার জন্যেই তো তার এতো কাজ, এতো দীপ্তি ! কথা শুনে একটু বা হেসে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে' যেতো শ্রীপর্ণা—যেন এই কথাই সে এতো চুপ করে' থেকে নিরঞ্জনকে বোঝাতে চেয়েছিলো !

একদিন শ্রীপর্ণা আর পারলো না, এতোতেও ঢাকতে পারলো না তার লজ্জা। ঘা-টা মর্ম্মমূলে আর লুকিয়ে না রেখে কেটে-চিরে চোখের সামনে তুলে ধরাই ভালো। তাই, একরাতে, নিরঞ্জন শোবার আগে ইজিচেয়ারে বসে' একটা বই পড়ছে, শ্রীপর্ণা সাহস করে' 'একটা চেয়ার নিয়ে তার দিকে এগিয়ে বসলো। আবহাওয়াটা ঠিক অনুরূপ কিনা, কী রকম করে' কথাটা পাড়লে ঠিক ভালো শোনাবে, কিছু বিচারকরে' দেখবারই তার সময় হ'লো না। স্পষ্ট, সরাসরি বল্‌লে :

—তোমাকে একটা কথা বলি।

নিরঞ্জন উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো ; কোলের উপর বইটা মুড়ে রেখে বল্‌লে,—বলো। কিছু চাই ?

শ্রীপর্ণা খুকির মতো ঘাড় হেলিয়ে বল্‌লে,—হ্যাঁ।

—বলো। নিরঞ্জন ব্যস্ত হ'য়ে চারদিক চাইতে লাগলো : এক্ষুনি, এক্ষুনি গিয়ে কী তা নিয়ে আসতে পারবো ? বেশ তো, বলো, কাল, কাল সকালেই তা চলে' আসবে। আগে শুনি।

শ্রীপর্ণা আস্তে বল্‌লে,—না, তেমন কিছু নয়।

—তবে ? আমার সঙ্গে ভিজিয়ানাগ্রাম যেতে চাও ? নিশ্চয়, একশোবার। সেখান থেকে আমরা আরো দক্ষিণে ঘুরে আসবো।

—না, তা-ও নয়।

—তা-ও নয়? নিরঞ্জন হেসে উঠলো: বলে'ই ফেল না ছাই। কোনোদিন কিছু চাও না, আজ একটু চাইতে এসেছ, তা-ও তোমার মুখ ফুটছে না। বলো না, আমি একবার দেখতুম তা তোমাকে এনে দিতে পারি কিনা।

অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে নিচু গলায় শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আমার আদিত্যকে একবারটি ভারি দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।

—কা'কে?

শব্দটা এবার স্পষ্টতরো হ'লো: আদিত্যকে।

নিরঞ্জনকে কে যেন একটা ধাক্কা মারলে। এতোদিন কোনো কথাই যেন তার কিছু মনে ছিলো না। আফ্রোদিতের মতোই যেন শ্রীপর্ণা তার জীবনের সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলো, নিষ্কলঙ্ক, নিরবগুণ্ঠ। দ্রুত অগ্রগমনের ছটায় মুছে ফেলে দিয়েছিলো সে অতীতের সমস্ত বিশীর্ণতা, চলতে-চলতে এখন সে যেন একটা হোঁচট খেলো। শ্রীপর্ণার যে একটা অতীত আছে, সে যে তার পক্ষে সশরীর সম্পূর্ণ নয়, যেমন সূর্য্যের কাছে উন্মোচিত ফুল ছিলো সম্পূর্ণ, এই চেতনাটা তাকে যেন একটা বেদনার মতো বিদ্ধ করলে। চেয়ারে আস্তে-আস্তে পিঠটা নামিয়ে নিয়ে এসে নিরঞ্জন নির্লিপ্ত গলায় বললে,—তাকে এখানে নিয়ে আসতে চাও নাকি?

—না, না, শ্রীপর্ণা ম্লান মুখে বল্‌লে,—তাকে একবারটি শুধু গিয়ে দেখে আসবো।

—কেন, নিয়ে আসতেই তো পারো অনায়াসে। তোমারই তো ছেলে।

শ্রীপর্ণা নীরবে একটু হাসলো ; বল্‌লে, তারা তাকে দেবে কেন আমার হাতে? আমি তো তাদের চোখে ভীষণ অপরাধী, আমার সন্তানের ওপরেও আমার আর কোনো অধিকার নেই।

নিরঞ্জন বইটা ফের মেলে ধরলো ; নিষ্প্রাণ গলায় বল্‌লে,—মামলা করলেই দেখা যায় কা'র অধিকার।

—না, না, ওকে আমি নিয়ে আসতে চাই না, সেখানেই ও খুব ভালো আছে, শ্রীপর্ণার গলাটা একবার কেঁপে উঠলো : আমি শুধু একটুখানি ওকে দেখে আসবো। তুমি যদি বলো—

—বা, যেতে চাও, যাবে বৈ কি। নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললো : কিন্তু কোথায় যাবে?

—কেন, বালিগঞ্জে ওদের বাড়িতে।

—কিন্তু তোমাকে যদি ওরা অপমান করে?

শ্রীপর্ণা হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো, গভীর করে' কী জানি ভাবলে ; পরে মুখ তুলে বললে,—করবে না। আর যদি কটু কথা কেউ কিছু বলেও, আমি গায়ে মাখবো না। আমার তাতে কী এসে যাবে, আদিত্যকে দেখতে পেলেই আমি খুসি।

—না, কটু কথা বললে—গায়ে মাখবে বৈ কি। নিরঞ্জন দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌লে, তোমাকে আর অপমান করে তাদের সাধ্য কী কবে তুমি যেতে চাও?

—কাল। কাল শনিবার, কালকেই।

—কখন?

—ধরো এই তিনটে-সাড়ে-তিনটের সময়।

—ও-রকম একটা বেয়াড়া টাইম কেন? নিরঞ্জন ভুরু কুঁচকোলো।

—কাল শনিবার, ওর হাফ-হলিডে, আড়াইটের মধ্যে ও বাড়ি ফিরেছে আন্দাজ করছি। শ্রীপর্ণা হাসবার চেষ্টা করলো: তা ছাড়া সেই সময়টায় বাড়ির কর্ত্তা-কর্ত্রীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে আশা করি। শুধু ও-ই হয়তো আছে জেগে, আমি চুপি-চুপি গিয়ে ওকে তখন দেখে আসতে পারবো।

—বেশ, নিরঞ্জন সোজা হ'য়ে বসলো: তুমি তৈরি হ'য়ে থেকো, আমি সে-সময় গাড়ি নিয়ে আসবো ঠিক।

শ্রীপর্ণার মুখ গেলো চুপসে। ভয় পেয়ে বললে,—তুমিও যাবে নাকি?

—হ্যাঁ, আমি রাস্তায় মোটরে বসে' থাকবো।

শ্রীপর্ণা যেন এতোটুকু হ'য়ে গেলো: তুমি যাবে কী করতে?

নিরঞ্জন ফের বইয়ের মধ্যে চোখ ডোবালো; গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—তাদের জানাতে যে তাদের বাড়িতে যিনি যাচ্ছেন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা, তাকে কারুর নিন্দা বা অপমান করবার অধিকার নেই। সে সইলেও আর একজন রাস্তায় বসে' আছে যে কখনো সইবে না।

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো—না-হেসে উঠে তার উপায় ছিলো না; বল্‌লে,—বা রে, অপমান করবে কেন? তুমি কেন মিছিমিছি যাবে কষ্ট করে'? তোমার আপিস কামাই হ'বে না? আমি একাই যেতে পারবো।

নিরঞ্জন বুঝতে পারলো শ্রীপর্ণা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে

চাইছে না। অন্তত সেখানে, সে-বাড়িতে, তার পক্ষে নিরঞ্জনের যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। 'আমি একাই যেতে পারবো'—কথাটাতে শ্রীপর্ণা যেন একটা নিষ্ঠুর সমাপ্তি টানলে। নিরঞ্জন আবার মিইয়ে গেলো আস্তে-আস্তে। বল্‌লে:

—কিসে তুমি যাবে?

—কেন, ট্র্যামে। এখান থেকে সোজা বাস্এও তো যাওয়া যায়।

—বাস্এ?

—হ্যাঁ, মন্দ কী! শ্রীপর্ণা অল্প একটু হাসলো: চড়লুমই না-হয় একদিন। বাস্-ট্র্যামে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলারাও তো চড়েন আজকাল।

—চড়ুক। সোফারকে বলে' রেখো সে তোমাকে পৌঁছে দেবে। এতোটা যেন নিরঞ্জনের সহ্য হচ্ছিলো না, সে মনোযোগ সহকারে বই পড়তে-পড়তে বললে,—আমি না-হয় ছোট গাড়িটা নিয়েই আপিসে বেরুবো।

তারপর দু'জনের মাঝে আর কোনো কথা হ'লো না। ঘুম যখন এলো, তখনো নয়।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই শ্রীপর্ণা আপিসের কর্ম্মচারী যুগলকিশোরকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়ে আনলো। নিরঞ্জন চায়ের টেবিলে বসে' খবরের কাগজ পড়ছে, নিচে যুগলকিশোরের হাতে দশটাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বল্‌লে,—আমার জন্যে ছোট দেখে একটা ফুটবল কিনে নিয়ে আসুন তো।

যুগল একেবারে আকাশ থেকে পড়লো: ফুটবল?

—হ্যাঁ, এনে লুকিয়ে আমার হাতে দেবেন। কেউ যেন দেখতে না পায়।

যুগলের যেন তখনো ধাঁধা লাগছে; বললে,—ফুটবল—ফুটবল দিয়ে কী হ'বে?

—যাই হোক্ না কেন, আপনাকে যখন বলছি নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।

যুগল থতিয়ে জিগ্‌গেস করলে: কয় নম্বর?

—নম্বর, নম্বর আবার কিসের? এই সাত-আট বছরের ছেলে যাতে খেলতে পারে। নিয়ে আসুন গে ঝট্‌পট্। আমি একটি ছেলের জন্মদিনে এটা প্রেজেন্ট দেবো।

সমস্তটা সকাল নিরঞ্জনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো কথা হ'লো না। যন্ত্রচালিতের মতো সংসার চললো এগিয়ে। শুধু আপিসে বেরুবার আগে পেগ থেকে টুপিটা তুলে নেবার সময় নিরঞ্জন অন্য দিকে তাকিয়ে বল্‌লে,—তুমি তা হ'লে আজই যাবে ঠিক করলে?

চোখে লজ্জার একটু নরম আভা ফুটিয়ে শ্রীপর্ণা বললে,—হ্যাঁ, তাই তো কথা হ'লো।

—ঠিক ঐ সময়টায়?

—হ্যাঁ, তাই তো সুবিধে। নিরঞ্জন যে কী চাচ্ছে শ্রীপর্ণা সাত-পাঁচ কিছু বুঝতে পারলো না।

—বাস্‌এ যেতে হ'লে ক'টার সময় বেরুবে?

—এই এক সময় গেলেই হ'লো। শ্রীপর্ণা হাসলো: তোমার আসবার আগেই ফিরবো। যেতে-আর আসতে যতোটুকু লাগে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিরঞ্জন বল্‌লে,—যেতে পারবে তো একলা? চাকরটাকে না-হয় সঙ্গে নিয়ো।

শ্রীপর্ণা এবার শব্দ করে' হেসে উঠলো, শরীরে ফোটাতে হ'লো-বা কটি বাঁকাচোরা তরল লাবণ্যের রেখা: আমার জন্যে কিছুই তোমার ভাবতে হ'বে না। তুমি আপিসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমার কাজ করে' যেয়ো।

কিন্তু আপিসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' কাজ করবার আজ দিন নয়। কাগজের উপর কলমের প্রত্যেকটি আঁচড়ে নিরঞ্জন তার অবচেতন মনে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো ঘড়ির দিকে। শ্রীপর্ণা যে একা যাবে, তাকে মুছে ফেলে, তাকে অস্বীকার করে', এ যেন তার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলো না। কেন থাকবে তার এই অবনমিত অপরাধীর ভঙ্গি? সমাজে-সংসারে কিছুই যে সে অন্যায় করে নি, বরং দুর্ব্বার দুঃসাহসে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার সত্য, উলঙ্গ তীব্র আলোয় তা সূর্য্যের মতো উদ্‌ঘাটিত করে' দিতে হ'বে। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হ'বে সে কতো সুখী, কতো সাহসী, কতো সে সত্যপরায়ণ! সে সেখানে তেমনি ভিক্ষুকের মিনতিতে যাবে কেন? যাবে তার অধিকারের দম্ভে, তার আভিজাত্যের গরিমায়। অপমান—অপমানের শ্রীপর্ণা বোঝে কী? সংসারে সে আর-কারুর কেউ নয়, সে নিরঞ্জন গুপ্তের স্ত্রী—অপমান তো লাগবে এখানে নিরঞ্জন গুপ্তকে, তার সামাজিক অবস্থাকে, এমন-কি তার ফার্মকে। না, এতো সব যখন জড়াচ্ছে এর মধ্যে, নিরঞ্জন প্রেমিকের মতো আর এখানে অভিমান করে' থাকবে না, সে শ্রীপর্ণাকে

'নিজের সঙ্গে করে' নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে তার মোটরে, রাজপথের পাশে যেখানে তাদের বাড়ি আছে দাঁড়িয়ে, তার সামনে এসে থামবে শব্দ করে', হর্ন বাজাবে, শ্রীপর্ণা মহীয়সীর মতো গর্ব্বিত ভঙ্গিতে চলে' যাবে ভিতরে, সে থাকবে নিচে, বৈঠকখানায়—দেখি কে তাকে কী কঠিন কথা বলতে সাহস পায়! ভিক্ষুকের মতো শ্রীপর্ণাকে সে সেখানে পাঠাতে পারবে না। তাতে নিরঞ্জনেরই সামাজিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'বে।

আড়াইটে বাজতে-না-বাজতেই নিরঞ্জন আপিস থেকে বেরিয়ে প'ড়লো।

নিচেটা ফাঁকা, থম্‌থম্ করছে। টোকা দিতে চাকর দরজা খুলে দিলো। দুপুরের এই অদ্ভুত নিঃশব্দতার সঙ্গে নিরঞ্জনের কোনোদিন পরিচয় ছিলো না। আস্তে-আস্তে সে উঠতে লাগলো।

গায়ের উপর শ্রীপর্ণার তখন শুধু চাদরটা গুছিয়ে নিতে বাকি, বুকে-পিঠে সেটাকে ভাঁজে-ভাঁজে দু'হাতে ছড়িয়ে রাখতে-রাখতে ঘর থেকে বারান্দায় সবে সে বেরিয়ে এসেছে, দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো।

নিমেষে নিরঞ্জন যেন আপাদমস্তক পাথর হ'য়ে গেলো, আর শ্রীপর্ণা যেন ত্রিভুবনে কোথাও পালাবার পথ পেলো না।

শ্রীপর্ণা আর এখন রাজরাণীবেশে সমারূঢ় নয়, খুলে ফেলেছে তার রঙীন সাড়ি, পরেছে প্রায় সাদা একটা থান, প্রান্তে সূক্ষ্ম একটা কালো নরুন-পাড়: গায়ে নেই আর তার সেই আভরণের আড়ম্বর, দু'হাতে দু'গাছি শুধু রুলি: চুলগুলি এলোমেলো রুক্ষতায় পড়েছে ভেঙে, নেই সেই খোঁপার উচ্ছলতা:

কপালে নেই এক ফোঁটা সিঁদুর, এই দুপুরবেলার মতোই শূন্যতায় যেন খাঁ-খাঁ করছে। যেন শ্রীপর্ণা নয়, শ্রীপর্ণার শুভ্রীভূত একটা কঙ্কাল। গায়ে যেই চাদরটা জড়াতে-জড়াতে সে এখন থেমে পড়েছে সেটাও যেন শূন্য, শূন্যের মতো সাদা। পায়ে শুধু সামান্য একটা চটি—যেটা দেখলেই মনে হয়, চৌকাঠের গোড়ায় ছেড়ে রেখে সে খালি পায়ে ঘরে ঢুকবে।

পাষাণ যেন কথা কইলো : এ কী! এ তোমার কী পোষাক!

শ্রীপর্ণা কোনো কথা বললে না, চোখ নামিয়ে রইলো।

নিরঞ্জন রূঢ় গলায় বললে,—তোমার এ-রকম সাজ করবার কী অর্থ কিছু জানতে পারি?

শ্রীপর্ণা তেমনি সাদা-হ'য়ে-আসা, নীরক্ত গলায় বললে,—নইলে, এ-ভাবে সাজ করে' না গেলে, আদিত্য আমাকে চিনতে পারবে না।

নিরঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে যাবার আগে নিশ্বাসে একটা শব্দ করলে : হুঁ!

—সে যখন আমাকে দেখেছিলো, নিরঞ্জন যখন তাকে দেখেই ফেলেছে তখন সে আর পিছু হটবে না, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন গলায় বললে,—তখন আমার সাজসজ্জা এমনিই নিরীহ ছিলো। তোমার ভয় নেই, বাড়ি ফিরে এসেই আমি এই খোলসটা খুলে ফেলবো—শুধু এই কয়েকটা ঘণ্টা। এক দিন।

নিরঞ্জন কোনো কথা না বলে' তার পাশ কাটিয়ে চলে' যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে পড়ে' কুটিল চোখে জিগ্‌গেস করলে : হাতে তোমার ওটা কী? কিসের প্যাকেট?

শ্রীপর্ণা দমলো না। বল্‌লে,—আদিত্যের জন্যে একটা ফুটবল কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

—ফুটবল? নিরঞ্জন তীক্ষ্ণ একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসলো: এই ক্রিকেটের সময়ে ফুটবল? আমাকে বললেই পারতে আমি ভালো দেখে দামি এক-সেট ব্যাডমিণ্টন কিনে এনে দিতাম। আর কিছু না পেয়ে ছেলেকে শেষকালে একটা রদ্দি ফুটবল কিনে দিতে গেলে? বুদ্ধিমান হ'লে সে যে ওটাতে এখন লাথিও মারবে না। নিরঞ্জন হঠাৎ গলা ছেড়ে বীভৎস হেসে উঠলো।

সেই হাসিতে শ্রীপর্ণার সমস্ত গা দগ্ধ হ'য়ে গেলো। প্রখর গলায় সে বল্‌লে—তা বেশ করবো, যা খুসি দেবো। তুমি—তুমি কেন এর মধ্যে মাথা গলাতে আসছ? তুমি কেন এখন আপিস থেকে ফিরে এলে?

—আপিস? নিরঞ্জন আবার হো-হো ক'রে' হেসে উঠলো। শোবার ঘরের দিকে এগোতে-এগোতে বল্‌লে,—আমারই তো আপিস, ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিনই সেটা আমি উঠিয়ে দিতে পারি। কী হ'বে আমার আপিস করে'?

নয়

শ্রীপর্ণা আর ফিরেও চাইলো না, ধাপে-ধাপে পা ফেলে-ফেলে সোজা সে নেমে গেলো নিচে। বাইরে থেকে সদরটা টেনে দিয়ে চাকরকে খিল দিতে বলে’ সে রাস্তা নিলো। গায়ের কাপড়টা টেনে দিলো একটু পুরু করে’।

এতোদিন বাড়ির মধ্যে, শালীন সব সোসাইটিতে সে যেন কেমন আড়ষ্ট ছিলো, কৃত্রিমতায় কেমন বিধিবদ্ধ; এখন রাস্তায় নেমে, সমস্ত শরীরে সে একটি অনির্ব্বচনীয় লঘুতা বোধ করলে। পায়ের নিচে পথটা যেন বাঁশির সুরের মতো কাঁপছে। গায়ে যেন তার নির্ম্মলতার নতুন একটি গন্ধ মাখানো।

খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে শ্রীপর্ণা মোড় থেকে একটা বাস্ ধরলো। কোথায় গিয়ে যে নামতে হ’বে শ্রীপর্ণার তা মুখস্ত।

আজ আদিত্যর জন্মদিন—কোনো বারেই শ্রীপর্ণা এ-দিনটা তার কাজের তালিকায় ফাঁকা পায় নি। এবার, সহসা এই স্বাধীনতার শিখরে উঠে এসে, এই দিনটির দিকে চোখ ভরে’

তাকাবার জন্যে তার অদম্য পিপাসা হলো: আজ তার এই স্বাধীনতাই যেন ব্যবধানের পথটা আগের চেয়ে অনেকখানি ছোট করে' এনেছে। আজকে, এমনি এক দিনে, বাস্‌-এর জানালায় টুকরো-টুকরো পথ দেখতে-দেখতে শ্রীপর্ণার মনে হ'লো তার আত্মার গূঢ়, তপ্ত, প্রবল অন্ধকার থেকে আদিত্য ফুটে উঠেছিলো আনন্দার্ত্ত দুঃসহ একটা বেদনার মতো, মাটির অন্ধকার থেকে অঙ্কুর যেমন ফোটে। সে আজ কতোদিন হ'য়ে গেছে, তবু শ্রীপর্ণা যেন তার শরীরে স্মৃতির সেই একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছে, যন্ত্রণার মতো সেই সুর, যন্ত্রণার থেকে সেই সুরের জন্ম! কোথায় না-জানি সে যাচ্ছে! সেখান থেকে আবার কোথায় না-জানি সে ফিরে আসবে! শ্রীপর্ণা মনে-মনে কেবলই প্রার্থনা করতে লাগলো, পথটা আরো দীর্ঘ হোক্‌, পথ দীর্ঘতরো হ'লেই সে আরো কতোক্ষণ আশা করতে পারবে।

ক্রমশই বালিগঞ্জের চেহারা বদলাচ্ছে। বেরোচ্ছে নানারকম রাস্তা, উঠছে নানা ধাঁচের বাড়ী। গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সন্‌-ভোগীরা সব একজোট হ'য়ে বাণপ্রস্থ নিয়েছে এ-অঞ্চলে। অন্য রাস্তা দিয়ে এগোতে হচ্ছে বলে' বাড়িটা খুঁজে পেতে শ্রীপর্ণার কিছু দেরি হ'লো। নিঝুম পাড়া রাস্তায় সামান্য একটা ফিরিওলা পর্য্যন্ত দেখা গেলো না। ফটকের বাইরে শ্রীপর্ণা খানিকক্ষণ ইতস্তত করলে। কোনো ছুতোয়, কে জানে কোন ছেলেমানসি ছুতোয়, আদিত্য যদি এখন একবার বাইরে বেরিয়ে আসে, তবে সে আর গায়ে পড়ে' বাড়ির মধ্যে ঢোকে না! এখান থেকেই তাকে একটু দেখে, ডাকলে যদি কাছে

আসে, তবে দু'টো কথা কয়, জিগ্‌গেস করে; তার কথা তার মনে আছে কিনা! আর যদি সে বেশি উৎসাহ না দেখায়, উপহারটা তার হাতে দিয়ে তক্ষুনি, তাড়াতাড়ি সে সরে' পড়ে। এখন আবার এই নিরীহ পোষাকটা যেন তার গায়ে নিরঞ্জনের সেই তিক্ত দৃষ্টির মতো জ্বালা করছে। শ্রীপর্ণা আরো খানিকক্ষণ দাঁড়ালো, কিন্তু আদিত্যের আবির্ভাবের বিন্দুমাত্র সূচনা দেখা গেলো না। এখন হঠাৎ যদি আকাশ দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যায়! যদি কাটা একটা ঘুড়ি এই কম্পাউণ্ডের উপর এসে পড়ে! কিম্বা ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে যদি কেউ এখন একটা ভালুক নাচাতে বসে!

ফটকের দরজার ছিটকিনিটা খুলে শ্রীপর্ণা কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। আস্তে-আস্তে উঠে এলো বাড়ির রোয়াকে। এবং একবার চৌকাঠ যখন ডিঙিয়েছে, তখন কে আর তাকে আদিত্যর দেখা পাবার আগে তাড়িয়ে দিতে পারে?

ফরাস-পাতা, নিচু জোড়া-তক্তপোষে তেমনি সেই বৈঠকখানা, রবি-বর্ম্মার পুরোনো সেই ছবিগুলি তেমনি দেয়ালে আজো ঝুলছে, দরজার উপরে উঁচু তাকের থেকে সিন্দূরচর্চ্চিত চীনে-মাটির সেই গণেশঠাকুরটি আজো ভ্রষ্ট হয় নি। নিচে এ-ঘরে ও-ঘরে কোথাও একটি নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেলো না। এমন সময় চুপিচুপি ছিঁচকে একটা চোর ঢুকে পড়লে অনায়াসে বেশ কিছু সরিয়ে নিতে পারে—তারে ঝুলছে যা শুকনো সাড়ি-কাপড়, ঘরে-বারান্দায় ছড়িয়ে আছে যা বাসন-কোসনের ছিটে। এক পাশে বাথরুমের দরজাটা খোলা, কলটা কে তখন ভালো করে'

আট্‌কে যায় নি, নালে জল বয়ে' যাচ্ছে খামোকা। বাথরুমে ঢুকে শ্রীপর্ণা কলটা বন্ধ করে দিলো।

ভীষণ নীরবতা : বাড়িটা যেন ইঁটে-লোহায় শ্বাসরোধ করে' আছে। তার চেয়ে জলের শব্দটাও যেন ভালো ছিলো।

সিঁড়ি বেয়ে শ্রীপর্ণা উপরে উঠতে লাগলো। হঠাৎ তার কানে একসঙ্গে কতোগুলি শিশুর ভিন্নগ্রামের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বুকটা উঠলো ধ্বক্ করে', কিন্তু কোনটা যে আদিত্যর গলা সেটা স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

লাল রঙের সিমেন্ট-করা চওড়া একটি বারান্দার দু'পাশ দিয়ে ঘরগুলি সাজানো, উত্তরে ও পূবে, দক্ষিণে রাখা হয়েছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাড়াগাঁয়ের গেরস্থালির মতো সেখানে ছোট তৃণহীন একটি উঠোন, একপাশে ফুলের বাগান, শাক-সব্জির ক্ষেত। উপরের সেই দক্ষিণ-খোলা দালানে সিঁড়ির দিকে পিছন করে' ছোট একটি তক্তপোষের উপর তাকিয়ায় উবু হ'য়ে শুয়ে প্রিয়বাবু স্কুলের ছেলেদের জন্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখছেন। নামের পিছনে তার পেন্সনি খেতাবটা জুড়ে দিলে বইটা যে তাঁর অনায়াসেই পাঠ্য বলে' নির্ব্বাচিত হ'বে এ-বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিলো। আঙুলের ফাঁকে কলম ধরার কায়দায় সেই দৃঢ়তা তাঁর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

কা'র উপস্থিতিতে বাতাসটা হঠাৎ ভারি হ'য়ে উঠলো টের পেয়ে প্রিয়বাবু লেখার থেকে মুখ না তুলেই প্রথমে জিগ্‌গেস করলেন : কে ?

কোনো সাড়া এলো না, শুধু সেই ভারি ছায়াটা যেন তাঁর

পিঠের উপর দিয়ে ক্রমশ তাঁর লেখার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো!

প্রিয়বাবু শরীরে একটা মোচড় দিয়ে ঘুরে বসলেন; অবাক হ'য়ে, খানিক-বা অভিভূত হ'য়ে, জিগ্‌গেস করলেন : কে?

শ্রীপর্ণা প্রণাম করবার জন্যে ভীরু পায়ে তাঁর তক্তপোষের দিকে সরে' এলো।

—কে, তুমি ছোট-বৌ না? প্রিয়বাবুর অর্দ্ধোচ্চারিত চীৎকারটা শ্রীপর্ণাকে যেন মেঝের উপর দাঁড় করিয়ে দিলো, সামনে এগোবার সে আর এতোটুকু জায়গা খুঁজে পেলো না। প্রিয়বাবু যেন অশুচি স্পর্শের ভয়ে দেয়ালের দিকে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে, বিদ্যুতের কশার মতো রক্তাক্ত জিহ্বা তাঁর লক্‌লক্ করে' উঠলো : এ তোমার কী চেহারা! তুমি না আবার বিয়ে করেছিলে? কী, এবারো তার মাথাটা খেয়েছ নাকি চিবিয়ে?

শ্রীপর্ণা কোনো উত্তর দিলো না, চারদিকে সস্পৃহ চোখে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো।

প্রিয়বাবু চটির সন্ধানে তক্তপোষের নিচে পা বাড়িয়ে দিলেন। দু'হাতে কোমরের কসিটা আঁট করতে-করতে কঠিন, কটু কণ্ঠে তিরস্কার করে' উঠলেন : তুমি এ-বাড়িতে এসেছ কেন? এখানে তোমাকে কে ঢুকতে দিলো?

শ্রীপর্ণা এতোক্ষণে কথা কইতে পারলো : দরজা খোলা পেয়ে আমি নিজে থেকেই ওপরে চলে' এসেছি।

—না, দরজা খোলা নয়। প্রিয়বাবু তার মুখের উপর ভারি একতাল লোহা যেন ছুঁড়ে মারলেন : এটা ভদ্রলোকের বাড়ি,

দিন-রাত দরজা এখানে খোলা থাকে না। যাও এক্ষুনি নিচে নেমে যাও বলছি, আর কোনো বাড়ি দেখ গে যাও।

শ্রীপর্ণা তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

প্রিয়বাবু ততোক্ষণে পায়ের উপর টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সোজা সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন,—যাও, নেমে যাও এই মুহূর্তে। সমস্ত জলাঞ্জলি দিলেও সামান্য চক্ষুলজ্জা তোমার নেই, এ কথা কখনো ভাবি নি।

এক সেকেণ্ডে শ্রীপর্ণা যেন আরো এক যুগ প্রতীক্ষা করলো।

—এখনো দাঁড়িয়ে আছ, আমার বাড়িতে, আমার চোখের সামনে? প্রিয়বাবু চারদিকে যেন অন্ধকার দেখলেন, বহু কষ্টে উদ্বেজিত বার্দ্ধক্যকে সংযত করে' এগিয়ে এলেন আরেক পা; বল্‌লেন,—যতোদূর অধঃপাতেই নেমে যাও না কেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমি মেয়ে, তাই তোমার গায়ে হাত 'তোলা যাবে না। এখনো বলছি, ভালোয়-ভালোয় চলে' যাও এই বাড়ি ছেড়ে।

গোলমাল শুনে আশে-পাশের ঘর থেকে ছেলেপিলের দল ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছিলো, তাদের ভিতর থেকে একজন ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে' হাসতে-হাসতে বলতে লাগলো ব্যস্ত হ'য়ে: শিগ্‌গির দেখবে এসো ঠাকুমা, কে একটা ভিখিরি-মেয়ে নিচে না-দাঁড়িয়ে সোজা ওপরে উঠে এসেছে দেখে দাদু তাকে বকছে, বারে-বারে বলছে নেমে যেতে, তবু নামছে না। কতো ভয় দেখাচ্ছে, তবু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে, শুভ্র, স্পষ্ট, একটু-বা রূঢ় কণ্ঠে: আদিত্যকে আমি একবারটি দেখতে চাই।

—আদিত্যকে ? প্রিয়বাবুকে যেন কে মুখের উপর প্রহার করলো : আদিত্য তোমার কে জিগ্‌গেস করি ?

—আদিত্য আমার ছেলে। শ্রীপর্ণার গলা একটুও টললো না, নির্ভীক, প্রশান্ত : আমি কোনো আশ্রয়ের জন্যে এ-বাড়ি আসি নি, যখন একবার ছেড়েছি, তখন একেবারেই ছেড়েছি। ওকে একবারটি ডাকুন, একটু ওকে দেখে, ওর জন্মদিনে ওর হাতে এই উপহারটা সঁপে দিয়ে আমি এক্ষুনি আবার চলে' যাবো।

প্রিয়বাবুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই ঘরের থেকে বিভাবতী আদিত্যকে অনুসরণ করে' বাইরে চলে' এসেছেন। কিন্তু ভিখিরি-মেয়েকে দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির। রৌদ্রের অন্ধকারে তিনি যেন শুভ্রান্বিত একটা ভূত দেখছেন, এমনি বিপন্ন অসহায়তায় উঠলেন হঠাৎ চীৎকার করে' : এ কী ! ছোট-বৌ যে ! এ কোত্থেকে এলো ?

শ্রীপর্ণার একবার মনে হ'লো প্রণাম করতে এগিয়ে যায়, কিন্তু কী হ'বে এই অভিনয়ে ?

আদিত্য গুটি-গুটি এগিয়ে আসতে লাগলো, ভালো করে', একটু-বা তীক্ষ্ণ চোখে, সামনাসামনি শ্রীপর্ণার মুখ দেখবার জন্যে। ঠাকুমার ডাক শুনে আর তার কোনো সন্দেহ নেই, কারুর সামান্যতম মুখব্যাদান করবার আগেই ছুটে এসে সে শ্রীপর্ণার একখানা হাত ধরলে, শিথিল, ঠাণ্ডা একখানি হাত ; বড়ো-বড়ো চোখে বিশাল কৌতূহল নিয়ে বল্‌লে,—তুমি ছোট-বৌ ? সেই ছোট-বৌ ? হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

কোলের কাছে উদ্বেল আগ্রহে শ্রীপর্ণা তাকে, তার মুখটাকে দুই ক্ষুধার্ত্ত হাতে চেপে ধরলো। সেই স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন তার স্নান করে' উঠলো স্নেহের তরল তীব্রতায়, সমস্ত চেতনা দিয়ে আদিত্যকে যেন সে শুষে নিতে চাইলো তার আত্মার পিপাসায়। আজ যে তার জন্মদিন সে-কথা শ্রীপর্ণা ছাড়া আর কারুর জানা নেই : উস্‌কো-খুস্‌কো চুলে মুখখানি কেমন করুণ, জামা-কাপড়গুলি কেমন ছন্নছাড়া, তার জেঠিমাদের একজন এখন সসন্তান কল্‌কাতায় উপস্থিত আছেন বলে' তার খাওয়া-দাওয়ার বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা হয়ংতো ভাববারো কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রীপর্ণা শীর্ণ, ক্ষিপ্র আঙুলে তার রুক্ষ, অগোছাল চুলগুলি বারে-বারে আঁকড়ে ধরতে লাগলো, হেঁট হ'য়ে চুমু খাবার মতো করে' তার মুখের কাছে মুখ এনে বল্‌লে,—আমি ছোট-বৌ নই, মা, তোমার মা।

বিভাবতী তপ্ত তেলের উপর জলের ছিটের মতো চিড়বিড় করে' উঠলেন : মা নয় তো রাক্ষুসী। ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে' আয়, আদিত্য। ওকে ছোঁয় না। চলে' আয় বলছি।

শ্রীপর্ণা তার মুখটাকে আরো জোরে চেপে ধরলো।

আদিত্য মুখ তুলে ঈষৎ সন্দিগ্ধ চোখে তাকে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলো ; বল্‌লে,—যাঃ, মিথ্যে কথা। কক্‌খনো তুমি মা নও। আমার মা তো কবে মরে' গেছে—ঐ ওখানে টাঙানো ছিলো না তার ছবিটা, ঠাকুমা? আদিত্য বিভাবতীকে হঠাৎ সাক্ষী মানলে : যেই মা মরে' গেলো না, অমনি তার ছবিটা একদিন দাদু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে!

যেখানে শ্রীপর্ণা দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখান থেকে জানলার খোলা আধখানা দিয়ে বড়ো ঘরটার সমুখটা তার চোখে পড়ে? আদিত্যর কথা শুনে চম্‌কে সে দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালে। সত্যি, সে সেখানে আর নেই। সেখানে ক্ষীরোদের এন্‌লার্জ-করা প্রকাণ্ড ফটোর পাশে তারো একটা সমসাময়িক ফটো টাঙানো ছিলো—তার সাধব্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। চেয়ে দেখলো সেটা সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে—সমস্ত ঘরে তার কণিকতম একটি ছায়া পর্য্যন্ত নেই। শ্রীপর্ণা বুঝতে পেরেছে কবে সে মরলো এবং কেমন করে' হ'লো তার দাহ।

তবু সে আদিত্যর চিবুক তুলে ধরে' বললে,—না, কই আমি মরেছি? এই তো আমি দাঁড়িয়ে। মরলে বুঝি কারুর ছবি পোড়ায়, আর সে থাকে বেঁচে? শ্রীপর্ণা আদিত্যর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো।

বিভাবতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: নিশ্চয় মরেছ, মরতে আর তোমার বাকি কি? ছেলে পেটে ধরে'ও যে-মা ফের বিয়ে করতে পারে, সে বেঁচে থাকে কেন সংসারে? সদর্পে তিনি শ্রীপর্ণার প্রতি একটা নিষ্ঠুর মুখভঙ্গি করলেন: তুমি ছেড়ে দাও বলছি আমাদের ছেলে। ওকে তুমি জড়িয়ে ধরছ কোন সাহসে? কিসের দাবিতে? ছেড়ে দাও বলছি।

শ্রীপর্ণা দুই অজস্র হাতে আদিত্যর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো: আমি তোমার মা, আমি এখনো মরি নি। মরলে বুঝি কেউ আবার তোমার জন্যে এই ফুটবল নিয়ে আসতে পারে?

—ফুটবল? আদিত্য প্যাকেটটার দিকে লাফিয়ে উঠলো।

প্রিয়বাবুর গলায় যেন একটা বাজ ভেঙে পড়লো: খবরদার! ও ধরে না, আদিত্য! ছুবি তো চাব্‌কে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে দেবো। এদিকে সরে' আয় বলছি এক্ষুনি।

শ্রীপর্ণার হাত দু'টো ঝুলে পড়লো আর পিছ্‌লে ভীত মুখে আদিত্য দাঁড়ালো সরে', ছেলেদের ভিড়ে।

তার ছোট এক জেঠতুতো ভাই খুব মুরুব্বিয়ানা করে' বল্‌লে, —ওর কাছে যাস্‌নে, আদি-দা, ও ভূত। দেখছিস না কেমন লম্বা-লম্বা হাত-পা!

আদিত্য ধম্‌কে উঠলো: কী বুদ্ধি! ভূত বুঝি কখনো দিনের বেলায় আসে? তাকে বুঝি ছোঁয়া যায়? সে বুঝি দোকানে গিয়ে টাকা দিয়ে ফুটবল কিনে আনতে পারে? ও মা, সত্যিকারের মা, হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি এতোক্ষণে।

প্রিয়বাবু অসহিষ্ণু, রুক্ষ গলায় বল্‌লেন,—আর কী! আর তবে দাঁড়িয়ে আছো কী করতে!

—না, যাচ্ছি। কাগজে-মোড়ানো প্যাকেটটা সামনের একটা চেয়ারের উপর নামিয়ে রেখে শ্রীপর্ণা অনুদ্বেল, পরিচ্ছন্ন গলায় বল্‌লে,—শুধু আজ ওর জন্মদিন, এ-কথাটা আমি এখনো ভুলতে পারি নি। ওর জন্মদিনের এই জিনিসটা ও হাতে করে' তুলে নিলে ওর কিছু অকল্যাণ হ'বে না। তুমি এটা দিয়ে খেলো, কেমন? আদিত্যর দিকে চেয়ে শ্রীপর্ণা শেষ একবার হাসলো।

বিভাবতীর বিস্মৃত পুত্রশোক হঠাৎ সহস্র ফণায় আলোড়িত হ'য়ে উঠলো: ছেলের জন্যে এতো মায়া, ছেলে কি শুধু তোমার একলার ছিলো? শুধু তার জন্মদিনটাই মনে আছে, আর কিছু না?

শ্রীপর্ণা আর দাঁড়ালো না। চাদরটা বুকে-পিঠে জড়িয়ে নিতে-নিতে সে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। কেনই বা যে সে এখানে এসেছিলো কে বলবে? জোর করে' দাবি করা দূরে থাক্, 'রদ্দি' একটা ফুটবল পর্য্যন্ত সে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলো না!

উঃ, কতোক্ষণে বাড়ি গিয়ে গা থেকে এই সব শোকের কালিমা ধুয়ে ফেলে বীতবর্ষণ আকাশের মতো সে সুনীল মুক্তিতে ঝল্‌মল্ করে' উঠবে? শীতের পাতার মতো এই দারিদ্র্য ঝরিয়ে ফেলে দাঁড়াবে সে তার দীপ্যমান মহিমায়, শরীরের অপরিমাণ ঐশ্বর্য্যে! কুয়াশা সরিয়ে তার সেই বিকীর্য্যমান সূর্য্যচ্ছটায়! বন্ধুর কল্পনা ছেড়ে তার সেই সমতল প্রাত্যহিকতার স্রোতে!

বেশ-বাসের এই নির্লজ্জ দীনতা শ্রীপর্ণাকে যেন প্রতি পদে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। কেন, কেন সে তার মোটরে এলো না, উদ্ধত মেরুদণ্ডে, অনবনম্য তেজস্বিতায়? কেন সে আগে থেকে হারবে বলে'ই প্রস্তুত হ'য়ে এলো? কেন সে শকুনের মতো প্রখর নখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলো না?

নিচে নামতেই মেজো-জায়ের সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেলো। চোখে-মুখে ঈষৎ সমবেদনার ভাব ফুটিয়ে এবং সেই সঙ্গে বেদনাটি প্রচ্ছন্ন তৃপ্তিতে উপভোগ করতে-করতে তিনি বল্‌লেন,—এবারো তুমি কপাল মুছলে নাকি, শ্রী? তাই হয়, মরা লোকও নিঃশেষে একেবারে মরে' যায় না, মেজো-জায়ের মুখ রেখায় কুটিল হ'য়ে উঠলো: বাতাসে তার অভিশাপ ঘুরে বেড়ায়। মরে' গেলেই তুমি তাকে ঠকাতে পারো, এ-কথা ভেবো না, কেননা স্বামী শুধু আমাদের ইহকালের নয়।

শ্রীপর্ণা হেসে বল্‌লে,—আমার স্বামীর অস্তিত্বের খবর কি আমার কপালেই লিখে বেড়াবো নাকি, আমার সমস্ত জীবনে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যে তা টের পাচ্ছেন না?

মেজো-জা খানিকটা অবাক, খানিকটা অপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌লেন—সে তবে এখনো বেঁচে আছে নাকি?

—আশা করি থাকবেও। শ্রীপর্ণা শব্দ করে' হেসে উঠলো।

—তবে এ তোমার কী ছিরি-ছাঁদ! মেজো-জা তার পোষাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন: খুব তা হ'লে দুঃখে পড়েছো বলো?

সদরের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আমাদের সুখটা বুঝি আজকাল বাইরের কতোগুলি চাকচিক্যে এসেই শেষ হয়েছে? পরকে না জানাতে পারলে বুঝি আর আমরা সুখী নই?

দ্রুত, দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো শ্রীপর্ণা সমস্তটা পথ পার হ'য়ে এলো। বাড়ি এসে দেখলো নিরঞ্জন একাই কোথায় গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার সেই অনুপস্থিতিটা যেন একটা বিরাট ভারের মতো ঘর জুড়ে পড়ে' আছে, মৃত একটা ঈগলের ডানার মতো। শ্রীপর্ণা সমস্ত শরীরে ছটফট্ করে' উঠলো, চাদরটা দিলো আলনার উপর ছুঁড়ে, আয়নার কাছে এসে ধুতিটা গায়ের থেকে খুলে ফেললো টান মেরে—একরাশ লজ্জার আবর্জ্জনা, মৃত্যুর তুষারীভূত নিশ্বাস, যেন ক্লেদময় পিচ্ছিল একটা সরীসৃপ তার চামড়ার উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছে—শ্রীপর্ণা নির্দ্দয় এক টানে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেই রাশীকৃত ধূলিজাল, তাড়াতাড়ি পরলো তার একখানা ঝল্‌মলে রঙিন সাড়ি, রেখায়-রেখায় যার চমক, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে যার প্রগল্‌ভ চপলতা। মাটির একটা বাতিতে শিখা

যেন উঠলো সাপের জিহ্বার মতো লেলিহান হ'য়ে। শাড়িটা প'রে', বাহুর তলা দিয়ে ঘুরিয়ে, বুকের ধার দিয়ে লতিয়ে, পিঠের উপরে আলুল করে' রেখে শ্রীপর্ণা দাঁড়ালো আকাশের আনীল মেঘমুক্ততায়—গায়ে তার সমুদ্রের বাতাস দিলো। এতোক্ষণে *সে যেন তার চারপাশে প্রফুল্ল একটা পরিমিতি পেলো, তার প্রাত্যহিকতার প্রাখর্য্য।* নিজেরই মনে, আয়নায় দাঁড়িয়ে শরীরে আনলো সে একটা দ্যুতিমান মসৃণতা, বাহু দুটি তুললো লাবণ্যে বিহ্বল করে', দুই চোখ চটুলতায় ধারালো, একটু-বা বিলোল হ'য়ে উঠলো। একেক করে' গায়ে সে সব গয়না পরলে। যেন শীত-শীর্ণ অরণ্যে লেগেছে চৈত্রের আগুন। পাথরের ঠাণ্ডা একটা বাটি দেখতে-দেখতে সুরার একটা ভৃঙ্গার হ'য়ে উঠলো, উচ্ছল ফেনা পড়তে লাগলো গড়িয়ে। চপ্‌চপে করে' তেল মেখে চুল সে চিকণ করে' তুললো—কালোর সে কী প্রখর উজ্জ্বলতা—চুলগুলিকে আজ খোঁপায় সঙ্কিপ্ত না করে' পিঠের উপর দীর্ঘ একটা বেণীতে দিলো সে সর্পিল করে'—বনের মধ্য দিয়ে বাঁকা-চোরা, খানিক-দেখা খানিক-অদেখা গ্রাম্য পথের মতো চুলের ফিতেটা থেকে-থেকে উঁকি মারতে লাগলো। ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ সেই বেণীতে সে সাপের মতো সুন্দর হ'য়ে উঠলো। তাতেও তার স্বস্তি নেই, কপালে সে আজ আঙুলের ডগায় করে' সিঁদুরের ফোঁটা দিলে, যেন একবিন্দু তার রক্তাক্ত হৃদয়; এবং, সেখানেও সে থামলো না, শিহরিত শিখায় সিঁদুরটা টেনে দিলো তার দীর্ঘ সিঁথির উপর। তারপর হঠাৎ সে এক ডিবে পান সাজতে বসলো, পান খেয়ে ঠোঁট দুটো সে রঙিন, বিহ্বল করে' তুললে। আর

সে এতোটুকুও সাদা নয়, মুছে ফেলে দিয়েছে সে সকল মৃত্যু, সকল মালিন্য : এখন সে লাল, রক্তের মতো, আগুনের মতো, তার আনন্দের মতো লাল। নিরঞ্জন তো এখন এলেই পারে বাড়িতে।

রাত তখন অনেক, নিরঞ্জন ফিরলো। তাকে যেন কেমন ক্লান্ত, রোগাটে দেখাচ্ছে! ঘরে সে যেন এঁলো একটা অশরীরী ছায়ার মতো। যন্ত্রচালিতের মতো পোষাক বদলাতে লাগলো, চোখ তুলে একবার চেয়েও দেখলে না, শ্রীপর্ণা কেমন সেজেছে, জ্যোৎস্নার মতো কেমন ছড়িয়ে রয়েছে বিছানা, ফুলদানি ভরে' কতো সে ফুল জমিয়ে রেখেছে টেবিলে। নিরঞ্জন যেন সব দেখেছে, দেখবার তার আর কিছু নেই, তার সমস্ত ভঙ্গিতে যেন সেই ঔদাসীন্য।

শ্রীপর্ণা নিজেই উঠে এলো; সাড়িটা খস্‌খসিয়ে, চুলগুলিতে বা একটু শব্দ করে' সে তার নীরব উপস্থিতিতে ভাষা দিলো; বল্‌লে,—তুমি একাই বেরিয়ে পড়লে, আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলে না কেন? তোমার সঙ্গে যাবো বলে' আমি কখন থেকে সেজে বসে' আছি।

গলাটা উঁচু করে' কলারটা ছাড়াতে-ছাড়াতে নিরঞ্জন নিস্পৃহ গলায় বল্‌লে,—তুমি ফেরো কি না-ফেরো তার ঠিক কী?

—ফিরবো না মানে? হাসতে চেষ্টা করে'ও শ্রীপর্ণা হাসতে পারলো না: সেই কখনই তো ফিরে এলুম—যেতে আর আসতে যতোটুকু লাগে। তুমি যে এতো আগে বেরিয়ে ~~যাবে তা~~ কে জানতো?

নিরঞ্জন গম্ভীর মুখে বল্‌লে,—কাজ ছিলো।

—চা না-খেয়েই বেরিয়ে পড়লে? আরেকটু বসে' গেলে তোমার কী ক্ষতি হ'তো? আমি তো এসেই পড়তাম।

প্যাণ্ট থেকে নিরঞ্জন ধুতির আবরণে চলে' এলো: কল্‌কাতা সহরে এক পেয়ালা চায়ের কিছু অভাব পড়ে নি। আমার জন্যে ব্যস্ত না হ'লেও তোমার চলতো।

শ্রীপর্ণা স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। চারদিক যেন এলো হঠাৎ দুঃসহ গুমোট করে'। সূক্ষ্ম সুতোর উপর দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত যেন হেঁটে চলে' গেলো নিঃশব্দে।

ঘরে একটুও গাফিলি না করে' নিরঞ্জনকে তাড়াতাড়ি ফের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তুমি এখন খেতে যাবে না?

—না, আমি খেয়ে এসেছি। বাইরে আমার নেমন্তন্ন ছিলো।

—খেয়ে এসেছ মানে?

—মানে তাই। নিরঞ্জন একবার পিছন ফিরেও তাকালো না: তুমি না খেয়ে থাকো, খেয়ে নাও গে যাও।

—এখন কোথায় যাচ্ছ তবে?

—নিচে, আপিস-ঘরে।

শ্রীপর্ণা অসহায় হাতে তাকে আকর্ষণ করলো; বল্‌লে,—এখন আবার তোমার কী কাজ?

—এখানে বসে'ই বা আমার কী স্বর্গ! নিরঞ্জন হঠাৎ তার হাতের পেশীগুলো নিষ্ঠুরতায় আঁট করে' ধরলো: ছাড়ো, এখানে

বসে বাজে গল্প করবার আমার সময় নেই। আমাকে গিয়ে এখন কতোগুলি সবিস্তার চিঠি লিখতে হ'বে।

তার হাতের নিষ্ঠুর বিস্ফারের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীপর্ণার আঙুলগুলি আলগা হ'য়ে এলো আস্তে-আস্তে।

তবু সে আশা ছাড়লো না, ছাড়লো না তার সাড়ি, জ্বলন্ত সেই শোভা। এতো উদ্দাম সে আজ সেজেছে, এতো উত্তাল, তাতে অভিমানের নেই বিন্দুতম অবকাশ। নির্বিঘ্নে সে আজ খেলো এবং এতো খেলো, চোখে দেখলে স্বয়ং নিরঞ্জনই হয়তো অবাক হ'য়ে যেতো—তারপর উপরে এসে কোনো রকম টুকরো-টুকরো হাল্‌কা কাজে হাত না দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়, সেই উদ্বেল, সসজ্জ সমারোহে, বিস্তীর্ণ বিসর্পিত আলস্যে। বুকের উপর কালো রক্তের মতো উগ্র একটা গোলাপ নিয়ে লেলিহ আঙুলে খেলা করতে লাগলো। চেয়ে রইলো দেয়ালের শুভ্রতার উপর, শয্যাস্তীর্ণ আবৃত তার দেহের উপর আলো কেমন তীব্র একটা বৃষ্টির মতো ঝরে' পড়ছে।

আরো অনেক রাত: নিরঞ্জন এবার উপরে এলো। আলো জ্বেলে তখনো শ্রীপর্ণা তেমনি শুয়ে আছে না-ঘুমিয়ে।

এতোটা যেন নিরঞ্জন আশা করে নি।

গায়ের থেকে জামাটা খুলে ব্রাকেটে টাঙিয়ে রেখে নিরঞ্জন বল্‌লে,—ওঠো আমি এবার ঘুমোবো।

—এক্ষুনি? পাশ ফিরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—গল্প করবে না একটুও?

গল্প আবার কিসের?

—আহা, কোনোদিন যেন কিছু গল্প করো না। শ্রীপর্ণা সাহসে বুক বাঁধলো: এই যে ঘুরে এলাম ও-বাড়ি, তার কোনো কথাই তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?

খাটের প্রান্ত থেকে-সরে' এসে নিরঞ্জন জানলা পর্য্যন্ত হেঁটে গেলো। বল্‌লে, শুকনো, সাদা, থস্‌থসে গলায় বল্‌লে—ওটা তোমার বাড়ি, ও-বাড়ির ইন্‌টারেষ্ট কেবল তোমারই কাছে। তাতে আমার কী এসে যায়?

শ্রীপর্ণা এক মুহূর্ত্ত হয়তো-বা কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে গেলো, মাটির সঙ্গে মিশে গেলো যেন ধুলো হ'য়ে: এক মুহূর্ত্ত। পরক্ষণেই সমস্ত ঔদাস্য উড়িয়ে দিয়ে চঞ্চল একমুঠো হাওয়ার মতো খাট থেকে সে নেমে পড়লো, নিরঞ্জনকে অবহিত হ'বার পর্য্যন্ত সময় দিলে না, শরীরে তার পালকের মতো লঘুতা, স্রোতের মতো দীপ্তি, পিছন থেকে অল্প বয়সের একটি কিশোরীর মতো সে তার গলা জড়িয়ে ধরলো, প্রায় আধো-আধো গলায় বল্‌লে,—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ? কিন্তু কেন, কেন তুমি আমার ওপর রাগ করবে?

আকস্মিকতায় নিরঞ্জন একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলো, আর তার মুখের সেই আধো-গম্ভীর আধো-বিস্মিত চেহারা দেখে শ্রীপর্ণা উঠলো খিলখিল করে' হেসে।

শ্রীপর্ণার ছোঁয়া লেগে নিরঞ্জনেরো বয়েস যেন অনেক কমে' এসেছে। ঘাড় থেকে তার হাত দু'টো ছাড়িয়ে নেবার আধো-আন্তরিক চেষ্টা করতে-করতে বিরক্ত মুখে সে বল্‌লে,—তোমার যে দেখছি স্ফূর্ত্তি আজ আর ধরে না।

—কী করে' ধরবে বলো? আদিত্যের আজ দেখা পেলুম যে।

গলা থেকে জোর করে' তার হাত দু'টো ছিঁড়ে নিয়ে অথচ যেন কিছুই হয়নি এমনি তরল স্বাভাবিকতায় নিরঞ্জন বল্‌লে,—দিলে সেই ফুটবলটা?

—হ্যাঁ, কিন্তু একটা ভারি ভুল হ'য়ে গেছে, শ্রীপর্ণা মুখের থেকে হাসিটি কিছুতেই মুছে ফেললো না: সঙ্গে একটা inflator নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। নইলে তা পাম্প করবে কী দিয়ে?

—এখন তো কতো ভুলই তোমার মনে হ'বে। নিরঞ্জন মুখ ফেরালো।

শ্রীপর্ণা দমলো না এতোটুকু, স্নিগ্ধ হাসির হাওয়ায় নিরঞ্জনের মেঘ সে উড়িয়ে দিলো; বল্‌লে,—হ্যাঁ, এখন অনেক ভুলই মনে হচ্ছে। তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেই ভালো হ'তো। ঝগড়া করে', মারামারি করে', আদিত্যকে যে করে' হোক ছিনিয়ে নিয়ে আসতুম। সত্যি, ও ওখানে বিশেষ আরামে আছে বলে' মনে হ'লো না।

—ঝগড়া-মারামারি না-করে'ই বা নিয়ে আসতে পারলে না কেন? নিরঞ্জন একটা সিগ্‌রেট ধরালো।

শ্রীপর্ণা অনর্গল হেসে উঠলো: এমন আশ্চর্য্য, কথাটা পাড়তেই পারলুম না, আদিত্য যদিও আমাকে চিনেছে, যদিও আমার সঙ্গে চলে' আসবার জন্যে ব্যস্ত। ওকে দেখতে পেয়েছি সেই যেন কী সম্পদ! বিলীয়মান হাসিটা শ্রীপর্ণা আবার শব্দে

প্রখর করে' তুললো : তা ছাড়া তোমার একটা স্পষ্ট, ফাইন্যাল্ মত নিইনি। তুমি সঙ্গে থাকলে বরং—

—আমার আবার মত কী! নিরঞ্জন গম্ভীর মুখে পাইচারি করতে লাগলো : তোমার ছেলে, ইচ্ছে হ'লে তুমি সঙ্গে করে' নিয়ে আসবে। তাতে আমার কী বলবার আছে? বরং তাই তো ভালো, নিরঞ্জন যেন প্রায় রুখে দাঁড়ালো : বারে-বারে ভিক্ষুকের মতো ও-বাড়িতে না গিয়ে একেবারেই ওকে জোর করে' নিয়ে আসা। তাই যদি তুমি চাও, ওকে রাখতেই যদি চাও তোমার কাছে এনে।

—পাগল! কে আর যাবে ও-বাড়ি! ওকে এনেই বা কী হ'বে এখানে! শ্রীপর্ণা গলাটা কিছুতেই ভিজতে দিলো না, বল্‌লে, —বেশ আছে ও আপনজনের মাঝখানে, সংসারের আড়ালে-আবডালে! ছেলেবেলায় কোন ছেলেটা খুব সুখে থাকে, বাবুগিরিতে গড়াগড়ি দেয়? ছেলেবেলায় দুঃখের স্বাদ পাওয়াটা বরং ভালো। কী বলো? কিন্তু অতো বাজে কথা কইবার আমার সময় নেই, শিগ্‌গির ঘুমুবে চলো, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে।

আদিত্যর প্রতি শ্রীপর্ণার এই ব্যাকুলতার অর্থ বুঝতে নিরঞ্জনের কল্পনাকে বিশেষ প্রসারিত করতে হয় না, সে তা সম্মানও করতে পারে যথাসাধ্য; কিন্তু কয়েকটা দিনের চাপা গুমোটের পর সেদিন আপিস থেকে অসময়ে ফিরে এসে বাড়িতে তাকে দেখতে না পেয়ে নিরঞ্জন আপাদমস্তক জলে' গেলো। সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গায়ই তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। কোথায় গেছে সে, তাকে না বলে', চুপিচুপি এই দুপুরের

নির্জ্জনতায় ? কোথায় আবার সে যাবে ! ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ একটা রাগ নিরঞ্জনের মেরুদণ্ড বেয়ে সির্‌সির্ করে' উঠে গেলো উপরে। আবার সে গেছে সেই বাড়ি, সেই অবনমিত ভিক্ষুকের ভঙ্গিমায়, সেই ম্লান দীন বেশে, লুকিয়ে একটিবার দেখে আসতে তার ছেলে ? সংসারে তার একমাত্র মা হওয়াই কি সব, তার বেশি তার আর কোনো সম্মান নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, পরিচয় নেই ? রাগে ও ঘৃণায় নিরঞ্জনের সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগলো। কেন, কেন সে ও-বাড়ির দরজায় গিয়ে প্রত্যাশী হ'বে ? সেখানে তার কিসের আশ্রয়, কিসের অভ্যর্থনা ! ছেলেই যদি সে ফিরিয়ে পেতে চায়, তবে তার জন্যে স্পষ্ট, প্রবল কণ্ঠে দাবি জানাক্, মামলা করুক্, দরকার হ'লে স্থাপন করুক্ তার স্পর্দ্ধিত অধিকার। তার মধ্যে বরং একটা সংগ্রামের তেজ আছে, সঙ্কল্পের মহত্ব আছে—তাকে নিরঞ্জন সমস্ত চিত্তে স্বীকার করতে পারে—তার পরিবর্ত্তে এ কী লজ্জা, এ কী ভীরুতা, এ কী কদর্য্য দারিদ্র্য ! অতিশয়তার কোঠায় পৌঁছে মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত অত্যন্ত কুশ্রী, অত্যন্ত অবজ্ঞেয় হ'য়ে দেখা দেয়। শ্রীপর্ণা এটা বুঝলো না যে সে শুধু মা নয়, সে স্ত্রী, তার মর্য্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিরঞ্জনের মর্য্যাদা, তার দায়িত্ব শুধু আদিত্যকে নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিলো না জীবনে। অন্ধ, অবশ একটা রাগে নিরঞ্জন নিজেকে দুর্ব্বল, অসহায় বোধ করতে লাগলো।

ঘরে নিরঞ্জন পাইচারি করছে টের পেয়ে, তার সিগ্‌রেটের ধোঁয়া শুঁকে, শ্রীপর্ণা নিমেষে পাংশু হ'য়ে গেলো। এটা যে কেমন করে' হয় তার সে কোনো একটা নিয়ম খুঁজে পেলো না।

আপিস থেকে নিরঞ্জন মাঝে-মাঝে অসাময়িক বাড়ি ফেরে বটে, কিন্তু যে-দিনই সে বেরুবে, সে-দিনই সে নির্ভুল এসে ঘড়ির কাঁটায় হাজির হ'বে কেন? কিন্তু এ নিয়ে এখন ভাগ্যকে প্রশ্ন করা বৃথা: শ্রীপর্ণাকে দাঁড়াতেই হ'বে ভাগ্যের মুখোমুখি:

সামান্য একটা প্রশ্ন উচ্চারণের ভঙ্গিতে কী অবিশ্বাস্য রূঢ় শোনালো! নিরঞ্জন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়ালো তার দুর্ভেদ্য নিষ্ঠুরতায়; শ্রীপর্ণার মুখের উপর প্রায় একটা গর্জ্জন করে' উঠলো: কোথায় গিয়েছিলে?

মুখে দু'টো কথা, কিন্তু শ্রীপর্ণা যেন কাচের বাসনের মতো টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো। গায়ের থেকে চাদরটা খুলে রাখতে-রাখতে—আজ আর তার কোনো কলা-কৌশল দেখাবার সুযোগ হ'লো না—গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—তেমোর কী মনে হয়?

—আবার ও-বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি? নিরঞ্জনের ধমকটা তাকে নাড়া দিয়ে গেলো সর্ব্বাঙ্গে।

দেরাজ টেনে হাতের গয়নাগুলি আঙুল দুম্‌ড়ে মণিবন্ধের দিকে নিয়ে যেতে-যেতে শ্রীপর্ণা প্রখর কণ্ঠে বল্‌লে,—না।

—তবে?

শ্রীপর্ণা চুপ করে' রইলো। তার নিস্তব্ধতাটা যেন একস্তূপ পাষাণের মতো ভারি।

—তবে কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় তুমি যেতে পারো? ধাক্কা মেরে সেই পাথরটা নিরঞ্জন ভেঙে দিতে চাইলো।

গয়নাগুলি হাতে-গলায় পরে' নিয়ে শ্রীপর্ণা এবার চুল এলিয়ে

আয়নায় গিয়ে চিরুনি চালাতে লাগলো। আয়নার মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার গলায় বললে,—ইস্কুলে গিয়েছিলুম। আদিত্যেদের ইস্কুলে।

—আদিত্যেদের ইস্কুলে? সে কোথায়? নিরঞ্জন হাঁপিয়ে উঠলো: সেখানে গিয়েছিলে কী করতে?

—বালিগঞ্জের ইস্কুলটা খুঁজে নিতে বেশি দেরি হ'লো না। শ্রীপর্ণা চিরুনির দাড়া দিয়ে সিঁথিটা সোজা করে' চিরতে লাগলো: গিয়েছিলুম আদিত্যকে একটিবার দেখতে পাই কিনা।

—আদিত্যের দেখা পাবার জন্যে তুমি দুপুরবেলা সোজা তাদের ইস্কুলে চলে' গেলে?

—হ্যাঁ, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে' রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও তার দেখা পেলুম না। আয়নার দিকে মুখ করে' নির্লিপ্ত, উদাসীন মুখে শ্রীপর্ণা বললে,—টিফিনের সময়, ছেলের দল ছড়িয়ে পড়েছে এখানে-সেখানে, কিন্তু আদিত্য কোথাও নেই'। কতোক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় বলো? তাই শূন্য মনে খালি-হাতেই আমাকে ফিরে আসতে হ'লো।

—তুমি ঠায় ততোক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে হাঁ করে'? বিদ্রূপের বিষে নিরঞ্জন একেবারে জর্জ্জর হয়ে উঠলো: রাস্তার লোকে তোমাকে কী ভেবেছে জিগ্‌গেস করি?

—লোকে আমাকে কী ভাবে বা না-ভাবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

নিরঞ্জন সেই মুহূর্ত্তে মুখের কাছে যেন কোনো কথা পেলো না। তার তূণে এবার আরেক অস্ত্র, বললে,—গিয়েছিলে তো আমার মত নিয়ে যাও নি কেন?

—মত দেবার মতো তুমি সে-সময় কাছে উপস্থিত ছিলে না। শ্রীপর্ণা বেণীটা প্রায় শেষ করে' এনেছে: তুমি আপিস চলে' যাবার পর দুপুরটা ভারি বিশ্রী, ভারি ফাঁকা ঠেকতে লাগলো। ভীষণ—ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগলো আদিত্যকে গিয়ে একবারটি দেখে আসি। বারটা আজ শনি কি রবি নয়, এ-সময়টা নির্ঘাৎ সে ইস্কুলে। সেই দিকেই বেরিয়ে পড়লুম।

—আপিসে আমাকে ফোন করলে না কেন?

—তখন, সে কথাটা মনে হওয়া মাত্র, শ্রীপর্ণা খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে লাগলো: কোথায় তোমাকে ফোন, সমস্ত পৃথিবী আমি ভুলে গেলুম! একেক নিশ্বাসে একেক বছর যেন কেটে যাচ্ছে।

—কিন্তু গেলে তো এমন পোষাকে যাবার কী দরকার হয়েছিলো?

কপালে সিঁদুর পরতে-পরতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—পোষাক? পোষাকে কী এসে যায়?

—একশো বার এসে যায়। নিরঞ্জন নির্লজ্জ রাগে মেঝের উপর একটা লাথি মেরে বসলো: আদিত্য তো তোমাকে সেদিনই চিনেছে, তবে ঐ পোষাকটা আবার কোন লজ্জায় পরতে গিয়েছিলে শুনি?

চিরুণীর মুখে করে' সিঁদুর নিয়ে সিঁথের উপর দীর্ঘ একটি রেখা টানতে-টানতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—ঐ পোষাকেই আমাকে যেন—আমাকে যেন মা বলে' মনে হয়।

নিরঞ্জনের মুখের উপর সজোরে কে যেন চাবুক মারলো।

যন্ত্রণায় সে উঠলো চীৎকার করে' : কিন্তু তোমার এই ব্যবহারে, এই বেশ-ভূষায় আমার সম্মান তুমি ক্ষুণ্ণ করছ তা জানো ?'

আলনার থেকে পাট-করা রঙিন সাড়ি তুলে নিতে-নিতে শ্রীপর্ণা অবাক হ'য়ে বল্‌লে,—বা রে, তোমরি সম্মানের এতে কী ক্ষতি হ'তে গেলো ?

—নিশ্চয়, একশোবার ক্ষতি। নিরঞ্জন তার শেষ বাণ ছুঁড়লো : তুমি নিরঞ্জন গুপ্তের স্ত্রী, সমাজে আমার একটা স্থান আছে, সম্ভ্রম আছে,—আমার অভিজাত্য, আমার সম্মান তুমি একটা ছেলেখেলার জিনিস, সামান্য একটা ফুটবল পাওনি।

সাড়িটা বদলাতে পাশের ঘরের দিকে যেতে-যেতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—বুঝলুম। কিন্তু তোমার সম্মান আর আমার সম্মান এক জিনিস নয়।

দশ

সেদিনের ঘটনার পর আদিত্যর শিশুমনে নানা-রকমের সব অদ্ভুত, অস্পষ্ট, অগোছাল জিজ্ঞাসা এসেছে—একা সে কিছুই কিনারা করে' উঠতে পারছে না। 'ছোট-বৌ'ই যে তার মা—মা না হ'লে কি কেউ আর এমন একটা নতুন ফুটবল কিনে দেয়!—সে-বিষয়ে তার কোনোই সন্দেহ নেই। তাকে সবাই মা'র কাছে যেতে বারণ করে' দিয়েছিলো বটে, কিন্তু মা বলে' ডাকতে কেউ তাকে মানা করে' দেয় নি। ঠাকুমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে' শত ঝালাপালা করলেও সরাসরি কোনো উত্তর পাওয়া যায় না—মা-কে কেবল 'পোড়ারমুখী, হতভাগী, আরো নানা বিচিত্র শব্দে গাল পাড়তে থাকেন। তাঁর অপরাধের মধ্যে তো এই, ছেলের সে কদর জানে না, শিখলো না ছেলেকে আদর করতে! কী করে' শিখবেন, যদি আদিত্যকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া না হয়? মজা মন্দ নয়, দূর থেকে যা একটু ফুটবল পাঠিয়ে আদর করতে গেলেন, অমনি হুকুম হ'য়ে গেলো: সে-ফুটবল তুমি ছুঁতে পাবে না। আচ্ছা, এ-ও এক কথা—খুসিতে আদিত্যর

দুই চোখ বড়ো হ'য়ে ওঠে: যাকে সে এতোদিন মা বলে' ডাকতো, সে-ই যদি পরে বড়ো হ'য়ে ঠাকুমা হ'য়ে যেতে পারে, তবে 'ছোট-বৌ'ই বা কেন মা হ'য়ে যেতে পারবে না? আর, কই, কেউই তো তার জন্মদিনের তারিখটা এমন মুখস্ত করে' রাখে নি, কেউই তো কোনোদিন হাতে ধরে' দেয় নি একটা উপহার! মা-ই যদি না হ'বে, তবে এতো রাজ্যের অফুরন্ত দিন-রাত্রের মধ্যে সেই দিনটা সে কী করে' মনে টুকে রাখবে? জিগ্‌গেস করি, মা-ই যদি না হ'বে, তবে তাকে এমন করে' দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে কেন? লজ্জায় আদিত্য আপন মনে হেসে উঠলো। নিশ্চয়, নিশ্চয় মা। কিন্তু আরেক দিক থেকে আদিত্যর ভীষণ খটকা লাগে। মা কি তবে মরে নি, না, মা-রা কোনোদিন সত্যি মরে না? ফটোতে যাকে সে ঝাপ্‌সা মা বলে' চিনেছিলো, তার সঙ্গে এই মায়ের খুব বেশি মিল আছে বলে' মনে হ'লো না—ফটোটা এখন আস্ত থাকলে সে আরেকবার ভালো করে' দেখতো—কিন্তু কে জানে, এই মা'র সঙ্গে মিলবার জন্যে দেয়ালের সেই ফটোটাও হয়তো বদ্‌লে আসতো এতোদিনে। বা রে, হাতে-গলায় গয়না নিয়ে ছবি তুললেই তো ছবিতে হুবহু গয়না উঠবে, আবার তা ইচ্ছে মতো খুলে রাখলেই তো সেই খালি-খালি হাত-পা! দাদুর প্যাণ্ট-কোট-পরা একটা, ধুতি-চাদর পরা আরেকটা, নানান রকম ছবি টাঙানো নেই? মাঝখান থেকে একা মা-ই দোষ করতে গেলো? এখন যদি সে আবার ছবি তোলে, ঠিক, অবিকল তা একেবারে মায়ের মতো হ'য়ে যাবে।

কিন্তু আরো একটা সমস্যা আছে, সেইটেই গভীর সমস্যা।

মা-ই যদি হ'বে, সে আর তবে আদিত্যর কাছে আসে না কেন? কেন তবে, কেমন করে' তবে আদিত্যকে সে ভুলে' থাকে?

মা-কে না পাক্, তার শিশুকল্পনায় অপরূপ এই মা-নামটি পেয়ে আদিত্য দিনে-দিনে কেমন গম্ভীর, উদাসীন, অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠতে লাগলো। কোনো খেলায় তার মন বসে না,—মা'র দেয়া সেই ফুটবলটা নিয়ে শম্ভু আর কেশব, তার জেঠতুতো ভাইরা, পাড়ার আর সব ছোট-ছোট ছেলে জুটিয়ে খুব হুল্লোড় করে' চলেছে—আদিত্য তার ধারও ঘেঁসে না, কখন সবাইর থেকে আলগা হ'য়ে গুটি-গুটি চলে' যায় সামনের ইষ্টিশানে। কখনো ওভার-ব্রিজের উপর, কখনো প্ল্যাটফর্মে, একমনে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকে। মা যেন কতোদূর থেকে ট্রেনে চড়ে' আজ আসবে। ধোঁয়া উগ্‌রে হুইস্‌ল্ দিয়ে কতো ট্রেন যায়-আসে, কিন্তু একটি মেয়ের মুখেও সে তার মায়ের মুখ দেখতে পায় না। আচ্ছা, আজ নয় তো কাল। এমনি সমস্ত সন্ধ্যা, দিনের পর দিন। রাত্রে সে তার হাতের লেখার খাতায় মাকে চিঠি লেখে, যাতে মা সহজে পড়তে পায়, তাই বড়ো-বড়ো অক্ষরে, কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই—মা'র চিঠিও টিকিট এঁটে ডাক-বাক্সে ফেলতে হয় নাকি? তবে তার টিকিট নেই কেন? ঠাকুমাকে বলতে গেলেই তো তিনি তেড়ে আসেন: তার ঠিকানা জানিস? সত্যি, আদিত্য ফ্যালফ্যাল করে' চারদিকে তাকাতে থাকে—সত্যি, ঠিকানা তো সে জানে না। বলে: মা'র চিঠিতেও ঠিকানা লাগে নাকি, ঠাকুমা?

মূর্তিহীন মা-নামটা আদিত্যকে শিশুকালের অনেক সব ছোট-খাট দুঃখ চিনিয়ে দিয়েছে এক নিমেষে। যখন মা ছিলো না,

তখন তাকে যদি কেউ মারতো, সে কাঁদতো, কিন্তু নালিশ করতো না; এখন কেউ মারলে সে কাঁদে না, মনে-মনে মা'র কাছে নালিশ করে। মেজো-জেঠিমা সবাইকে সেদিন সন্দেশ দিয়ে তাকে যে শুধু গুড় দিয়ে মুড়ি দিলেন, রাত্রিবেলা শুয়ে-শুয়ে সেই কথাটিও তার মা'র কাছে জানানো চাই। বালিসে লুকিয়ে-লুকিয়ে একটু সে কাঁদেও আজকাল, তার জীবনের প্রথম সেই কান্নার মধুরতা। বাড়িতে কেউ এলো শুনলে সে লাফিয়ে ওঠে: মা বুঝি এলো। ছুটো-ছাটা হাতে যা দুয়েকটা পয়সা আসে কালে-ভদ্রে, তা সে আজে-বাজে খরচ করে না, নিজেরই বাক্সটিতে জমায়,—পাছে ঠাকুমার জিম্মায় থাকলে পরে তা উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়। সেই পয়সা জমে'-জমে' যখন এতোগুলি টাকায় ফুলে' উঠবে, তখন তা নিয়ে সে মা-কে খুঁজতে বেরুবে, এই ট্রেনে চেপে, অনেক দূরের ট্রেনে, রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে। ঠিক বা'র করবে তাকে খুঁজে, ফটোর সঙ্গে না-ই বা মিলুক্, নাই বা তার চিঠির জবাব দিক্, মা-কে চিনতে আদিত্যর একটুও দেরি হ'বে না।

এমনি করে' ক'টা উদাসীন দিন কাটিয়ে, সেদিন ইস্কুলে, টিফিনের সময়, আদিত্য কম্পাউণ্ডের একধারে দাঁড়িয়ে একদল ছেলের গুলি-খেলা দেখছে, হঠাৎ কা'র চোখের এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়লো তার মুখের উপর: আদিত্য চম্‌কে উঠলো অলক্ষ্য। তাকিয়ে দেখলো, রাস্তার ধার থেকে কে একজন স্ত্রীলোক হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আদিত্যকে কারুর বলে' দিতে হ'লো না, নির্ভুল

পায়ে; আস্তে-আস্তে, যেন একটা অচেতন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, সে এগিয়ে আসতে লাগলো—যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততোই তার স্পষ্টতরো মনে হ'তে লাগলো, মা রয়েছে দাঁড়িয়ে। ঠিক সেই পোষাক, সেদিনের মতো চুলগুলি তেমনি খোলা, মুখে তেমনি সেই মিঠে-মিঠে হাসি।

শ্রীপর্ণা হাত বাড়িয়ে আদিত্যকে ধরে' ফেললো।

পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো, একটায় ফিতে জোটেনি বলে' দড়ি দিয়ে বাঁধা, হাঁটু অবধি ধুলো, তার উপরে জিনের একটা প্যাণ্ট, প্রায় খাকি হ'য়ে উঠেছে, সার্টের বুক-পকেটটা ছিঁড়ে আধখানা পড়েছে ঝুলে, বোতামগুলো আছে কি নেই, ঘাড়ের চুলগুলি উঠে গেছে খাড়া-খাড়া,—শ্রীপর্ণার বুকটা হু-হু করে' উঠলো। মুঠির মধ্যে তার ভেজা ছোট্ট হাতখানি নিবিড় করে' ধরে' জিগ্‌গেস করলে : আমাকে চিনতে পাচ্ছ ?

সুখের অসহ্য লজ্জায় আদিত্য যেন ম্লান হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,—হ্যাঁ।

—কে বলো তো ?

—মা।

শ্রীপর্ণা হাসলো : কী করে' চিনলে ?

আদিত্য যেন ফাঁপরে পড়লো। পরে হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রীপর্ণার মুখের দিকে বিস্ফারিত দুই চোখ তুলে বল্‌লে,—কী করে' চিনবো! মাকে লোকে কী করে' আবার চেনে ?

—তোমার জন্যে এ কী এনেছি দেখ। একটু সরে' গিয়ে

শ্রীপর্ণা চাদরের তলা থেঁকে এনামেলের একটা কৌটো বা'র করলো, খুলে ফেললো কাপ্‌টা, থরে-থরে নানারকমের খাবার সাজানো : টিফিনের সময় তোমার খিদে পায় না? কী খাও রোজ ?

—কিচ্ছু না। কিন্তু, মা'র হাতের খাবারের চেয়ে মা'র এখানে এই অহেতুক আসাটাই যেন তার কাছে বেশি আশ্চর্য্য লাগছে : কিন্তু তুমি এখানে কী করে' এলে ?

—কেন, বাস্‌এ চড়ে'।

—ধ্যেৎ ! কথাটা আদিত্য বিশ্বাস করতে পারলো না।

—কেন, বাস্‌এ আসা যায় না ?

—বা, তুমি রেলগাড়ি চড়ে' আসবে বলে' আমি কতোদিন ইষ্টিশানে বসে' গাড়ি দেখতুম। যাও, ককৃখনো না। অতো দূর দেশ থেকে কেউ বুঝি কখনো বাস্‌এ আসিতে পারে? রাস্তা কোথায় ?

—দূর দেশ নয়, আমি তো কাছেই থাকি।

—কাছেই থাকো? আদিত্য যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : কদ্দুর ?

—চলো, সেখানে যাবে না তুমি ?

আদিত্য একবাক্যে সাড়া দিয়ে উঠলো : যাবো। কিন্তু আমার যে এখন ইস্কুল ! ঐ বাঃ, ঘণ্টা পড়ে' গেলো। কী হ'বে ?

আঙুলের চাপে শক্ত করে' তার হাতটা ধরে' রেখে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—পড়ুক ঘণ্টা। তুমি আগে এখন এগুলো খেয়ে নাও। পরে আমরা বাস্‌এ করে' বাড়ি যাবো দু'জনে।

প্রচ্ছদ-পট

আদিত্য ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো : মাষ্টার-মশাইকে তা হ'লে বলে' আসি গে।

—কী বলে' আসবে ?

—আমার মা এসেছে, আনন্দে আদিত্যর তুই চোখ জ্বলে' উঠলো : মা'র সঙ্গে আমি বাড়ি যাচ্ছি, মাষ্টার-মশাই। ছাড়া, একবারটি চেঁচিয়ে বলে'ই আমি ছুটে চলে' আসবো। তোমার ভয় নেই।

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : না, তোমাকে কিছু বলতে হ'বে না।

—না বলে' এলে কাল যে আমাকে ভীষণ মারবে। তুমি জানো না, মা, গুপী সেদিন না বলে' বাড়ি চলে' গিয়েছিলো বলে' মাষ্টার-মশাই ওকে পরদিন কী মারটাই মারলে, বেঞ্চির উপর নিল-ডাউন করিয়ে রাখলো।

—তোমাকে মারবে না। আমি তোমাকে আরেকটা নতুন ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দেবো।

—কিন্তু আমি সব বই কিনে ফেলেছি যে। ছাড়ো, ছাড়ো, আদিত্য হঠাৎ মরিয়া হ'য়ে উঠলো : সব বই আমার ডেস্কের উপর পড়ে' রয়েছে—আমার বাংলা, ইংরিজি, ভূগোল—হাতের-লেখা, আমার ড্রয়িং-খাতা—

শ্রীপর্ণা একটুও আলগা দিলো না : তোমাকে আমি আবার সমস্ত কিনে দেবো—পড়ার বই, ছবির বই, অনেক-অনেক বই, যতো তুমি চাও। নতুন ইস্কুলে ও-সব বই তোমার কিছু কাজে লাগবে না।

বাস্‌এ ওঠবার সামান্য রাস্তাটুকু দু'জনের এলোমেলো কথায়, টুকরো-টুকরো হাসিতে ঝিকমিক্‌ করে' উঠলো।

ভেঙে-ভেঙে খাবার খেতে-খেতে আদিত্য ভরা মুখে জিগ্‌গেস করলে: আচ্ছা মা, তুমি কী করে' বুঝলে বলো তো, আমি তোমাকে রোজ রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ডাকতুম, আসতে বলতুম আমার কাছে—

—আমিও যে শুয়ে-শুয়ে সে-ডাক স্পষ্ট শুনতে পেতুম, তাই তো চলে' এলুম তোমাকে নিয়ে যেতে।

—আচ্ছা মা, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে বলো না?

—জানো না? শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো: আমি যে মরে' গিয়েছিলুম মাঝখানে।

—যাঃ, হাত বাড়িয়ে মাকে আদিত্য আঁকড়ে ধরলো: মরে' গেলে বুঝি আবার বেঁচে ওঠা যায়? তারপর কী যেন সে অনেকক্ষণ ভাবলে; বল্‌লে,—তোমার বুঝি আরেকটা বাড়ি আছে? সেই বাড়িতেই বুঝি আমরা যাচ্ছি? কিন্তু আমার বাক্সটা তো নিয়ে এলে না, মা? সেটার মধ্যে যে আমার পয়সা ছিলো!

—তোমার জন্যে নতুন বাক্স কিনে দেবো দেখো, তাতে অনেক খোপ থাকবে, ধরবে অনেক পয়সা।

—কিন্তু তুমি সেই হাতের-লেখার খাতাটা আনতে দিলে না মা, ওটার মধ্যে তোমার কতো চিঠি ছিলো।

—চিঠি?

—হ্যাঁ, কতো চিঠি লিখেছি তোমাকে, মজা পেয়ে আদিত্য

লাফিয়ে উঠলো : সে-সব চিঠি তো আর তুমি পড়তে পাও নি! তা ছাড়া—আদিত্য লজ্জায় হঠাৎ মুষড়ে গেলো : সেটা কিছুতেই বলবো না।

—কী? বলো, আমাকে তো বলবে। মাকে বলতে কী দোষ?

—ও বাবা, সে আমি কিছুতেই পারবো না বলতে।

—না বল্‌লেও আমি ঠিক জানতে পারবো দেখো।

—কী করে' জানবে? আদিত্য ভীত, সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো : ড্রয়িং-খাতাটা তো সেই ইস্কুলেই পড়ে' আছে।

—মাষ্টার-মশাইকে বলে' আনিয়ে নেবো বাড়িতে। শ্রীপর্ণা হাসলো : সমস্ত পৃষ্ঠাগুলি উল্‌টে-উল্‌টে দেখে নিলেই হ'বে।

—বা, কী আর এমন আছে ওতে! আদিত্য শুকনো গলায় বল্‌লে,—মন থেকে তোমার শুধু একটা ছবি এঁকেছিলুম বই তো নয়। দাদু সেটা দেখে ফেলেছিলো, বল্‌লে : কী করছিস রে বসে'-বসে'? বললুম : ছবি আঁকছি। দাদু ঝুঁকে পড়ে' বল্‌লে : কিসের? সত্যি কথাই বললুম : মা'র। যেই এই কথা শোনা, তোমাকে বলবো কী মা, আমাকে দাদু কী মারটাই মারলে! এই দেখ, আদিত্য তার বাঁ হাতের জামার হাতাটা গুটোতে লাগলো : এই যে।

—তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিলো পৃষ্ঠাটা?

—না, ছেঁড়ে নি, কেনই বা ছিঁড়বে? আদিত্য সরলতায় বিস্তৃত দুই চোখে হেসে ফেললো : সেটা যে কিছু হয় নি, মা।

ঝর্‌ঝরে দেহ নিয়ে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বাস্ ছুটে চল্‌লো।

নিরঞ্জন যখন রাত করে' বাড়ি ফিরলো, উপরে এসে তার চক্ষুস্থির : বারান্দায় আসন পেতে স্তূপীকৃত প্লেটে-বাটিতে কে একটা ছেলে খেতে বসেছে, আর তার সামনে বসে' শ্রীপর্ণা সশব্দে হেসে, সোল্লাসে কথা বলে', ছড়িয়ে পড়ছে অনর্গল।

নিরঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—এ কে ?

শ্রীপর্ণা খোলা চুলে এলোমেলো হ'য়ে বসে' ছিলো—এতোখানি রাত, তবু সে এখনো চুল বাঁধেনি, তাড়াতাড়ি আঁচলটা সম্বৃত করে' মাথায় ছোট একটা ঘোমটার মতো করে' তুলে দিয়ে বল্‌লে,—আদিত্য।

এ ছাড়া আর কোনো উত্তরের সম্ভাব্যতা ছিলো না, তবু কী কারণে কে জানে, নিরঞ্জনের মুখ কালো, কুটিল হ'য়ে উঠলো। যতোদূর সম্ভব প্রাত্যহিক আলাপের সুরটা বজায় রাখবার সে চেষ্টা করলো : একে কোথায় পেলে কুড়িয়ে ?

—ঈশ্বরে বিশ্বাস করো ? শ্রীপর্ণা গলার অদ্ভুত ভঙ্গিতে তার দিকে মুখ তুলে চাইলো : ঈশ্বর দিয়ে গেছেন।

—ঈশ্বরের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। আজো গিয়েছিলে বুঝি ইস্কুলে ? একটু-একটু করে' গলাটা তার এখন হোঁচট খেতে লাগলো : তোমায় সেদিন বারণ করে' দিলুম না ?

—বা রে, সেখানে না-গেলে ওকে পেতুম কী করে' ?

—গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে ?

—একটা কারখানায়, আরেকটা তুমি নিয়ে গেছ।

—তবে কিসে, বাস্‌এ গিয়েছিলে বুঝি ?

—অগত্যা।

—সাধারণ পাঁচজনের ভিড়ে বসে' তোমাকে বাস্‌এ যেতে বারণ করে' দিই নি? নিরঞ্জন হিংস্র একটা কটাক্ষ করলে: ফোনে আমাকে জানালে না কেন? গাড়ি আমি পাঠিয়ে দিতুম।

—থাক্, এখন আর আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসো না। শ্রীপর্ণা নিচু হ'য়ে হঠাৎ পরের তরকারি দিয়ে আদিত্যর ভাত মেখে দিতে লাগলো: আজ আর এখন আমার কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই।

নিরঞ্জন তবু নড়লো না। বিশাল একটা বাধার মতো তার গুরুভার উপস্থিতি নিয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

—কী এমন দাঁড়িয়ে আছো এখানে? ঘরে যাও, ধড়াচুড়োগুলো ছাড়ো গে এবার। শ্রীপর্ণা তাকে যেন দু'হাতে ঠেলতে লাগলো: তুমি এমনি দাঁড়িয়ে আছো বলে' ও কিছু খেতে পাচ্ছে না।

নিরঞ্জন তবুও দাঁড়িয়ে রইলো।

—বললুমই তো আর যাবো না, বাস্‌এ করে' যাবার আর দরকারো নেই আপাততো। কিন্তু, শ্রীপর্ণা খিলখিল্ করে' হেসে উঠলো: আমার যা এখন ফুর্তি হচ্ছে, তার সম্মান রাখার জন্যে আমাকে তোমার এখুনি একটা এরোপ্লেন কিনে দেয়া উচিত! উঃ, মানুষের টাকা থাকাটা কী শাস্তি, কী বাধা! সামান্য একটা বাস্‌এ পর্য্যন্ত চড়া যাবে না।

নিরঞ্জন পাশ কাটিয়ে ঘরে চলে' গেলো।

—আগে ভাবতুম টাকা থাকলে পৃথিবীতে সব কিছুই বুঝি

করা যায়, শ্রীপর্ণার কথাটা গলানো, গরম খানিকটা সিসের মতো নিরঞ্জনের কানে এলো : কিন্তু এখন দেখছি অনেক কিছুই করা যায় না।

একহিসেবে তবু এ একরকম ভালোই হয়েছে বলতে হ'বে—নিরঞ্জন মেজাজটা তাই হঠাৎ চড়তে দিলো না। শ্রীপর্ণা যে শেষ পর্য্যন্ত তার দৃষ্টিকেন্দ্রটা পরিষ্কার দেখতে পেরেছে, তার যুক্তির কাছে অন্তত স্বীকার করেছে যে একটা মৌখিক বক্তৃতা, এতেই সে যথেষ্ট নরম হ'য়ে এলো। ভালোই হ'লো—ছেলের জন্যে আর তাকে এমনি বনে-বাদাড়ে ছুটতে হ'বে না ; ভালোই হ'লো, দুপুরের ফাঁকাটা সে ভরে' তুলতে পারবে অনায়াসে।

কোটটা খুলে রেখে খালি-মাথায় আবার সে বেরিয়ে এলো। টাইটার ফাঁস ছাড়াতে-ছাড়াতে বল্‌লে,—তুমি তো আহ্লাদে খুব ডগমগ করছ, ওদিকে ও-বাড়িতে এতোক্ষণে কী কান্নাকাটি পড়েছে কিছু খেয়াল আছে ?

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—সে-কান্না এমন কিছু শোনবার মতো নয়। তোমার ভয় নেই, যুগলবাবুকে দিয়ে চিঠিতে আমি খবর পাঠিয়েছি।

—কী লিখেছ শুনি ?

—কী আবার লিখবো ! লিখেছি : আমার ছেলে, আমার কাছেই আছে। আমার কাছেই থাকবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

—তবু তার মধ্যে কেমন একটা ভিক্ষার গন্ধ থেকে গেছে। নিরঞ্জন ঠাট্টার সুরে বল্‌লে,—যাই হোক, জোর করে' নিরঞ্জনকে

জাহির করে’ তো নিয়ে আসতে পারলে না, সেই লুকিয়ে, চুরি করে’, কৌশল করে’—

শ্রীপর্ণার গলাটা জ্বালা করে’ উঠলো : কী করলুম, তার চেয়ে কী পেলুম, কী হ’লুম,’ সেইটেই আমি বেশি দামি মনে করি। পথের চেয়ে প্রাপ্তি। শেষ পর্য্যন্ত কোথায় এসে দাঁড়ালুম আমি! তুমি টাকা দিয়ে যা পাও, সেই সুখ, তা আরেকজন তার দারিদ্র্য দিয়েও পেতে পারে। সেই পাওয়ার কাছে তোমার টাকা ও তার দারিদ্র্য কিছুই এসে যায় না। কিন্তু তুমি এখান থেকে যাও, ওকে খেতে দাও পেট ভরে’।

নিরঞ্জন আদিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে,—ছেলেটি কিন্তু দেখতে বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট।

শ্রীপর্ণার গায়ে যেন খুসির হাওয়া দিলো : হ’বে না? যেন একটু গর্ব্বের সঙ্গে গ্রীবা হেলিয়ে বল্‌লে,—কা’র ছেলে?

মুহূর্ত্তে নিরঞ্জন যেন মিইয়ে গেলো, চারদিক যেন এলো কুয়াসায় বিমর্ষ হ’য়ে। নিজেকে যেন সে এই সুরের সঙ্গে মেলাতে পারলো না; মাতা-পুত্রের এই উৎসবের মাঝখানে সে যেন একটা অর্থহীন ছন্দ-পতনের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরের দিকে ফিরে যেতে-যেতে নিরঞ্জন আরেকটা কটাক্ষ করলো : কিন্তু এক ধার থেকে এতো খেতে দিচ্ছ কেন? অসুখ করবে যে। দেখো, একদিনেই একেবারে ফতুর হ’য়ে যেয়ো না।

সেই সুর, নিরঞ্জন লক্ষ্য করলো, বাড়ির প্রতিটি বাতাসে উঠেছে বেজে। ঘর-দোরের কেমন সব হঠাৎ অদল-বদল হ’য়ে গেছে, জিনিসে-আসবাবে নতুন ছিরি-ছাঁদ। কে যেন আজ

এসেছে অতিথি, প্রতিটি দেয়ালে সেই কথা লেখা। সেই ও-ধারের বাড়তি ঘরটাই হয়েছে আদিত্যর থাকবার, পাতা হয়েছে নিচু একটা খাট, খাটের উপর বিছানা, যেন সাদা একটা ফুল রয়েছে ফুটে, পড়বার ছোট টেবিল-চেয়ার, বাক্স বলতে টেবিলের সেই দেরাজ দু'টোই তার যথেষ্ট, দেয়ালে, ব্র্যাকেটে ঝুলছে তার জামা-কাপড়। নিরঞ্জন অবাক হ'য়ে গেলো : একদিনে, এরি মধ্যে এতো সব সে জোগাড় করলো কোত্থেকে ? এদিক-ওদিক একটু পাইচারি করে' আবার এসে ঢুকলো সে তার নিজের ঘরে। এতোক্ষণ তার দিকে যেন সে ভালো করে' চেয়েই দেখে নি। নিরঞ্জন থম্‌কে দাঁড়ালো, সমস্ত ঘরটা যেন মোছা একটা শ্লেটের মতো শূন্য। বিছানাটা এখনো পাতা হয় নি সেই সফেন উদ্বেলতায়, ড্রেসিং-টেবিলটাতে যেন বিশৃঙ্খল একটা হাট বসেছে, আলনাতে কাপড়-চোপড়গুলির সেই গুচ্ছীকৃত পারিপাট্য নেই, বই একটা পড়তে-পড়তে চেয়ারের হাতলের উপর উপুড় করে' ফেলা দুই মলাটের মাঝখানে। হাওয়ায় দেয়ালের একটা ছবি যদি পেরেকের থেকে সামান্য একটু বেঁকে যায় একদিকে, সেই অণুতম অসামঞ্জস্যটি পর্য্যন্ত শ্রীপর্ণার চোখ এড়ায় না ; কিন্তু, আজ, এখন, মশারির চালের খানিকটা পড়েছে ঝুলে, তোয়ালেটা জায়গায় না থেকে বাথরুমের দরজার উপরে তোলা, তাড়াতাড়িতে পাউডারের কৌটোটার কাপ্‌ লাগানো হয় নি। যেন কে এ-ঘর থেকে গেছে চলে'—নিরঞ্জন হাঁটতে-হাঁটতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো : সে-কথা যেন সে স্পষ্ট পড়তে পারলো আয়নার অতল, নিশ্চিহ্ন শূন্যতায়।

নিরঞ্জনের সহ্য হ'লো না, দরজার কাছে না গিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো : আমার ঘরটা এমনি নরক হ'য়ে থাকবে নাকি ?

শোনা গেলো শ্রীপর্ণার হালকা গলার টান, বনের মুক্তিতে পাখির ডাকের মতো ; এই আসছি।

এই সময়, কালকেও, নিরঞ্জন যখন আপিস থেকে ফিরেছে, ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে উগ্র, উন্মুখর একটি স্তব্ধতা। ততোক্ষণে শ্রীপর্ণা শেষ করেছে তার সজ্জা, প্রতীক্ষায় সমস্ত ভঙ্গিটি তার ধনুকের ছিলার মতো তীক্ষ্ণ। ততোক্ষণে সে বসেছে এসে চেয়ারে, কিম্বা দাঁড়িয়েছে এসে জানলায় : ঝল্‌মল্‌ করছে তার সাড়ি, ঝিক্‌মিক্‌ করছে তার গয়না। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ক্রমাবতীর্য্যমান লাবণ্যে সে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে একটা তলোয়ার। নতুন বৃষ্টির মতো ঝরে' পড়ছে সেই তার সৌন্দর্য্যের চিক্কণ, তীক্ষ্ণ জলধারা। তারপর সেই স্তব্ধতা কেমন ভেঙে বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে হাসির বিদ্যুতে, নিরঞ্জন যখন উপরে উঠে এসেছে, সেই হাসির বৃষ্টি কেমন অবিশ্রান্ত ঝরে' প'ড়েছে তার চোখের উপর, মুখের উপর, ঘনায়মান আকাশ থেকে তৃষার্ত্ত মৃত্তিকায়। তারা তারপর একসঙ্গে খেয়েছে চা, একটি হয়তো ঘণ্টা, নিটোল নিঃশব্দ একটি মুহূর্ত্ত : বেরিয়ে পড়েছে মোটরে, প্রখর অসমাপ্তিতে। আজ হঠাৎ যে এ কী হ'য়ে গেলো নিরঞ্জন কিছু আয়ত্ত করতে পারলো না। পৃথিবী যেন তার কক্ষ বদলেছে, ঘড়ি তার সময়ের পরিমাপ। শ্রীপর্ণা এখনো কিছুই সাজগোজ করে নি, একপিঠ খোলা চুলে ছড়িয়ে রয়েছে তার নির্লিপ্ততা।

তার রেখায় নেই আর যেন সেই উচ্চকিত প্রতীক্ষা, তার চোখে সেই সুকোমল অধৈর্য্য। তার মুখ আজ কেমন গম্ভীর, চোখ দু'টি কেমন ঠাণ্ডা, সমস্ত শ্রী-টি কেমন স্তিমিত। শীতের পাতার মতো তার শরীর এসেছে হলদে, শিথিল হ'য়ে। নিশ্বাসের মধ্যে হঠাৎ সেই শীতস্পর্শ পেয়ে নিরঞ্জন শিউরে উঠলো। ঘরের সমস্ত আলো-হাওয়া বন্ধ করে' কে যেন তাকে এই তার মৃত্যু-আর্ত্ত নির্জ্জনতায় বন্দী করে' রেখেছে।

চা নিয়ে শ্রীপর্ণা ঘরে ঢুকলো। পরনে আটপৌরে একটা সাড়ি, জমিটা অবিশ্যি সাদা, গায়ে না থাকলে নয় এমনি দু'টো খুচরো গয়না, কপালে সিঁদুর আছে কি নেই তা জানবার জন্যে একটা অণুবীক্ষণ লাগে। হঠাৎ সে কতো সাধারণ, কতো গরিব হ'য়ে পড়েছে।

নিরঞ্জন রুক্ষ গলায় জিগ্‌গেস করলে : তোমার চা কৈ ?

শ্রীপর্ণা যেন এক পা চৌকাঠের বাইরে বাড়িয়ে রেখেছে। বল্‌লে,—আমার অনেক কাজ, আমি পরে খেয়ে নেবো'খন।

নিরঞ্জন চায়ের বাটিটা স্পর্শও করলো না। বল্‌লে,—এখনো কিছু তৈরি হও নি যে ?

শ্রীপর্ণা হক্‌চকিয়ে গেলো : কেন, কী আবার তৈরি হ'বো ?

—সাজগোজ করো নি যে কিছু ?

শ্রীপর্ণা নিজের গায়ের উপর দিয়ে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো : কেন, এ এমন কী মন্দ সাজ ! এতে তো বেশ পতিব্রতাই দেখাচ্ছে, শ্রীপর্ণা হেসে ফেললো : বেশ ভদ্র ও স্বাভাবিক। বুঝছো না, শ্রীপর্ণা নিরঞ্জনের পাশ ঘেঁসে একটু সরে' আসতে

চেষ্টা করলো : একেবারে এক লাফে ভীষণ জমকালো হ'য়ে উঠতে পারি না, আদিত্যর হয়তো ধাঁধা লেগে যাবে। বুঝছো না, আস্তে-আস্তে—

—সে-কথা তোমাকে কে বলছে? নিরঞ্জন ধম্‌কে উঠলো : আজ আমাদের মিসেস দে-র ওখানে নেমন্তন্ন ছিলো না? ক'টা বেজেছে কিছু খেয়াল আছে?

—হ্যাঁ, শ্রীপর্ণা চম্‌কে ভুরু দু'টো টান করে' বল্‌লে—একদম মনে ছিলো না তো।

—মনে ছিলো না তো তাড়াতাড়ি রেডি হ'য়ে নাও। দেরি যখন হ'লোই, আরো একটু হ'তে পারবে। ড্রেস করে' নাও ভালো করে'। কথাটা বলে' ফেলে নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটিটা ধরতে গেলো।

—কিন্তু কী করে' আমি আজ যাই?

—কী করে' যাবে মানে? নিরঞ্জনের হাতের ঠেলা লেগে বাটি থেকে খানিকটা চা টেবিলের উপর চল্‌কে পড়লো : সেদিন না তাদের কথা দিয়ে এলে মুখের ওপর?

শ্রীপর্ণা লাজুক চোখে ইতস্তত করতে লাগলো : হ্যাঁ, বলেছিলুম বটে। কিন্তু কী করে' যাই বলো? আদিত্য আজ এসেছে।

—তাতে কী? আওয়াজটা যেন নিরঞ্জন তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো।

যেটুকু মিটিমিটি জ্বলছিলো, শ্রীপর্ণা তা-ও নিবে গেলো আস্তে-আস্তে; কালো, গম্ভীর মুখে বল্‌লে,—তুমি একাই যাও।

—আমি একা যাবো মানে? নিরঞ্জন আরেক পর্দা উঁচুয় উঠে গেলো: কোনদিন আমি একা গেছি? আমার তো একার নেমন্তন্ন হয় নি, আমার সস্ত্রীক নেমন্তন্ন হয়েছে।

—কিন্তু সব দিনই তো সমান যায় না মানুষের। শ্রীপর্ণা যেন অসম্পৃক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো তার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বে: আমি আজ যেতে পারি কী করে'? আমিও তো আজ একা নই। আর, শ্রীপর্ণা নিরঞ্জনের মুখের দিকে পরিপূর্ণ করে' তাকালো: আর আদিত্যকেও তো নিয়ে যেতে পারি না সেখানে।

—নুইসেন্স! নিরঞ্জন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে' উঠলো: ওকে নিয়ে যাবে কী? ওকে রেখে যাবে। যাও, তার স্বরটা উলঙ্গ একটা আদেশের মতো শোনালো: তাড়াতাড়ি সাড়ি বদ্‌লে এসো, আর বেশি দেরি করা যাবে না।

—কিন্তু তা হয় না। শ্রীপর্ণা শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে।

—কী হয় না?

—আদিত্য আজ নতুন এসেছে, ওকে আমি একলা ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবো না।

—য়্যাদ্দিন ও কোথায় ছিলো? নিরঞ্জন এখন একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো: য়্যাদ্দিন ওকে কোথায় ফেলে রেখেছিলে?

—যেইখেনেই হোক্, এমন একটা অনাত্মীয় নির্জ্জনতায় নয়। অসম্ভব, শ্রীপর্ণা ঘর থেকে চলে' যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো: ওকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা আজ আমি ভাবতেই পারছি না। ও কী ভাববে? কা'র সঙ্গে কথা কইবে? শ্রীপর্ণা দরজার বাইরে চলে' গেলো: তুমি একাই যাও। আমার জন্যে কী!

নিরঞ্জন একাই গেলো। মিসেস দে-র সান্ধ্য সম্মিলনে অবিশ্যি নয়, এখানে-সেখানে, পথে-পথে। তীব্র, আর্ত্ত একটা হাহাকারের মতো সে মোটর ছুটিয়ে দিলে। কোথায় যে যাবে তার ঠিক নেই, বেগস্খলিত, অন্ধ একটা উল্কার মতো সে নির্লক্ষ্য ছুটে চলেছে। কোন অদৃশ্য শত্রু তাকে তাড়া করেছে পিছন থেকে, যতোদূর সে যায়, ততোদূর পর্য্যন্ত তার চক্ষু। কিছু সে ভাবতে পারছে না, কোথাও সে থামতে পারছে না, চলেছে এমনি গতির অব্যাহতিতে। যতো যায়, ততোই যেন বেড়ে যাচ্ছে তার পথ, বেড়ে যাচ্ছে তার বর্ত্তমান, অন্ধকার ততোই ক্রমে দুর্ব্বহতরো হ'য়ে উঠছে।

তাকেও এক সময়ে থামতে হ'লো।

বাড়ি ফিরে এসে—আজ আর সে আপিস-ঘরে ঢুকলো না—সোজা, চোখ বুজে চলে' এলো শোবার ঘরে। ঘরটা অন্ধকার, হাত বাড়িয়ে সে সুইচ টানলে। মৃতের অট্টহাসির মতো সেই তীব্র আলো বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। আজ আর শ্রীপর্ণা তার বর্ণাঢ্য আলস্য নিয়ে শুয়ে নেই, নেই আর সেই তার রূপোলি জলের উপর তরল একটি ঘুমের প্রশান্তি, নেই আর সেই প্রতীক্ষার কোমল উষ্ণতা। জামা-কাপড় ছেড়ে অভ্যাসচালিতের মতো নিরঞ্জন ঘুমের পোষাক পরলো। সময় করে' শ্রীপর্ণা ঘরটা একসময়ে গুছিয়ে গেছে বটে, সাদা চোখে দেখে কোনো খুঁতই বা'র করা যাবে না—হাতের কাছাকাছি ছোট একটা টোপ দিয়ে খাবার ঢেকে রেখেছে পর্য্যন্ত, যদি, ধরো, ভুল করে' তখন সে উপস্থিত থাকতে না পারে। সুবিধের দিক

থেকে সমস্ত-কিছুই সাজানো-গোছানো, য়্যাশ-ট্রেটি পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝক্ করছে। শ্রীপর্ণাকে একটিবার ডাকতে পর্য্যন্ত হ'বে না, গ্লাশে করে' জল পর্য্যন্ত সে ভরে' রেখে গেছে। পান সে খায় না, তবু হু'টি পান,—যদি আজ তার হঠাৎ খেতে ইচ্ছে হয়, যদি সেই অছিলায় তার ডাকতে হয় শ্রীপর্ণাকে। নিরঞ্জন শুকনো, কঠিন চোখে ঘরময় সেই প্রাণহীন পরিচ্ছন্নতার দিকে তাকিয়ে রইলো। মাঝে শ-ওয়ালেস্‌এ গিয়ে হালকা কিছু সে খেয়ে নিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার বাঙালি ক্ষুধায় আরো কিছু সে মুখে তুলতে পারতো, যদি এখন শ্রীপর্ণা তার কাছে বসে' থাকতো সেই তার ঘুমবিজড়িত রমণীয়তায়। ঘাসের চটি হু'টো পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরঞ্জন বিছানায় শুয়ে পড়লো। আলো নেভাবার কথা মনেই হ'লো না, দরজা রইলো তেমনি হাট করা। আলো নেভাবার কথা তার নয়, তাদের মিলনের প্রথম পরিচ্ছেদটা, গল্প-গুজব, এমনি আলোর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'তো: দরজা বন্ধ করবারো কোনো দরকার ছিলো না, তাদের হু'য়ের মাঝখানে ছিলো না তখনো কোনো দরজার ব্যবধান। কিন্তু সব দিনই মানুষের সমান যায় না, শ্রীপর্ণার কথাটা এখনো নিরঞ্জনের কানে বাজছে। অগত্যা তাকেই আজ আলোটা নিবিয়ে দিতে হ'বে। অন্ধকারে মুছে দিতে হ'বে এই প্রখর পরিহাস।

শোয়া ছেড়ে নিরঞ্জন উঠতে যাচ্ছিলো, দরজার ওপারে কা'র সাড়ি উঠলো খস্‌খসিয়ে। নিরঞ্জন প্রাণপণে চোখ বুজে রইলো।

—এ কী, কখন এলে?

নিরঞ্জন ঘুমে একেবারে অসাড়।

শ্রীপর্ণা তার মাথায় একটু ঠেলা দিলো : কী, খেলে না যে ?

—কী বিরক্ত করো ? নিরঞ্জন খেঁকিয়ে উঠলো : ঘুমুতে দাও।

শ্রীপর্ণা দূরে সরে' দাঁড়ালো। বল্‌লে—মশারিটা ফেলে দেবো ?

—দরকার নেই।

—আলোটা এমনি জ্বালা থাকবে ?

নিরঞ্জন কর্কশ কণ্ঠে বল্‌লে,—জানি না।

—শোনো। কী কথা বলতে গিয়ে শ্রীপর্ণা থেমে গেলো।

নিরঞ্জন টুঁ একটা শব্দ করলো না। ঘুমে একেবারে সে ভেসে যাচ্ছে।

—শোনো, শ্রীপর্ণা স্নিগ্ধ গলায়, একটু-বা অন্তরঙ্গতার সুর মিশিয়ে বল্‌লে,—আমি আজ আদিত্যর কাছে শুচ্ছি।

নিরঞ্জনের একটি নিশ্বাস পর্য্যন্ত শোনা গেলো না।

শ্রীপর্ণা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। বল্‌লে,—বিছানায় আমাকে না দেখতে পেলে ও হয়তো কেঁদে উঠবে। একা শুতে ওর অভ্যেস নেই, একা শুতে ওর ভয় করে। তাই—শ্রীপর্ণা দরজার কাছে গিয়ে টুপ্‌ করে' সুইচ ঠেলে ঘর অন্ধকার করে' দিলো।

এগারো

তারা, নিরঞ্জন আর শ্রীপর্ণা, ছিলো যেন পৃথিবীর প্রথমতম স্বর্গে : পরস্পরের প্রবল সন্নিহিততায়, বিহ্বল আত্ম-পর্য্যাপ্তিতে। পৃথিবীর সমস্ত নির্জ্জনতা তারা ভরে' রেখেছিলো, তারা দু'জনে, তাদের বাহুমণ্ডলীর মাঝে আকাশ ছিলো সঙ্কুচিত হ'য়ে। তাদের বাইরে আর কোনো জায়গা ছিলো না, না-বা তাদের মাঝখানে, দিনের রাজত অজস্রতা ও রাত্রির আবৃত রহস্য দিয়ে তারা সুন্দর, সম্পূর্ণ করে' রেখেছিলো তাদের সৃষ্টি : দিন ও রাত্রির মতো তাদের খরশান দুই অস্তিত্ব, মৃত্যুর তীক্ষ্ণতার মতো, স্রোতের শুভ্রতার মতো, যার বাইরে ছিলো না কোনো সত্য; ছিলো না কোনো দেবতা। প্রতিটি মুহূর্ত্তের চিতাগ্নিতে প্রতিটি মুহূর্ত্ত উঠতো পবিত্র হ'য়ে। তারা ভুলে'ই ছিলো একেবারে যে তাদের বাইরে অরণ্যে আছে কোনো শক্তি, মাঠে আছে কোনো শোভা, অন্তরীক্ষে কোনো বিস্ময়। তাদেরই পরস্পরের সংস্পর্শে ছিলো তারা শক্তিমান, দৈবত শক্তিমান ; ছিলো তারা সুন্দর, শ্যামায়িত সুন্দর ; ছিলো তারা অপরূপ, অসমাপ্য অপরূপ। সময়ের সমুদ্রের তীরে তারা

ছোট-ছোট মুহূর্ত্তের ঝিনুক নিয়ে খেলা করতো। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতো কখন উঠেছে সূর্য্য, কখন জেগেছে ঝড়, কখন নেমেছে অন্ধকার। তারা ছিলো মাটির নৈকট্যে, আকাশের ঘনিষ্ঠতায় : তাদের দু'জনকে নিয়ে ছিলো পৃথিবীর অসীম দিগন্ত-বিস্তার। তারা ছিলো পরস্পর আচ্ছন্ন, আকাশ আর পৃথিবীর মতো, পরস্পর নিরন্তরাল। তাদের জীবনে ছিলো মৃত্যুর তীব্রতা, শরীরে ছিলো ঈশ্বরের উপস্থিতি।

কিন্তু সেই স্বর্গে, সৃষ্টির সেই শৈশব স্বর্গে, কোথা হ'তে একটা সাপ এসে ঢুকেছে। ধূর্ত্ত, বিষাক্ত একটা সাপ। তার নিশ্বাসে স্বর্গ এসেছে ম্লান হ'য়ে। তাদের শরীর হ'য়ে এসেছে অস্থি-র একটা সন্নিবেশ, রক্তের একটা ধারা, হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন—দিন-অতিবাহনের একটা যন্ত্র। সেই সমুদ্র দাঁড়িয়েছে একটা জলাশয়ে। মৃত্যুতে নেই আর সেই কল্পনার সমারোহ, মৃত্যু যেন আগামী কালের একটা সাধারণ ঘটনা। আকাশ যেন একটা ভার, পৃথিবী যেন একটা জিনিস। তারা দুইজনে, নিরঞ্জন আর শ্রীপর্ণা, যেন নিমেষে শিকড় ছেড়ে চলে' এসেছে শাখায়, বহুলীকৃত পাতার অন্তরালে : তাদের মাঝে এসেছে এখন লজ্জা, অশুচি লজ্জা, এসেছে ভয়, অশরীরী ভয়, এসেছে সন্দেহ, সর্পিল, শীতল সন্দেহ। পর্ব্বতের সেই বিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ চূড়া থেকে তারা নেমে এসেছে দৈনন্দিন সমতলতায় : সাধনাকে নিয়ে এসেছে একটা প্রাণহীন প্রসাধনের পর্য্যায়ে, জীবনকে নিয়ে এসেছে বিস্তৃত একটা সুবিধের ধারাবাহিকতায়। যেন জাহাজ ডুবছে, তারা দুইজন পাশাপাশি রেলিঙ ধরে' আছে দাঁড়িয়ে, কেউ কিছু বলতে

পারছে না, পরস্পরের, মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে আশ্রয়, খুঁজছে সহানুভূতি। দু'জনেই একলা, এতো কাছাকাছি থেকেও, নিচে জল উঠেছে শুধু ফেনিল হ'য়ে। এই কয়েকটা শুধু মুহূর্ত্ত, নিরঞ্জনের স্নায়ু-শিরা ঠাণ্ডা একটা ভয়ে সিরসির্ করে' উঠলো, তারপরেই জলের অচঞ্চল বিস্তীর্ণ একঘেয়েমি।

ব্যাপারটা যে কী করে' কী ঘটে' উঠলো. নিরঞ্জন প্রথমটায় কিছু আয়ত্ত করতে পারলো না। সামান্য একটা ছেলে কুড়িয়ে পেয়ে শ্রীপর্ণা যেন নিজেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে: হারিয়ে ফেলেছে তার নিগূঢ় সত্তা, তার বিচিত্রতরো সম্ভাব্যতা। একে অতিক্রম করে' তার আর কোনো উন্মোচন নেই—এখানেই সে যেন সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছে, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার বাকি যতো পৃষ্ঠা, মুছে ফেলে দিয়েছে তার সমস্ত সঙ্কেত। এইখানেই সে থেমে পড়লো, এখানেই সে চরিতার্থ। তার জীবনে আর কোনো স্বপ্ন নেই, আর কোনো তীর্থযাত্রা। তার সন্তানের কাছে নিরঞ্জন, যেন দিনের আলোয় একটা বাতি জ্বেলে ধরা।

ছোট একটা খুকি পর্য্যন্ত তার খেলনা নিয়ে এমন মাতে না, যেমন আদিত্যকে নিয়ে শ্রীপর্ণা মেতেছে। হ্যাঁ, তাকে উন্মত্ততাই বলতে হয়, নিরঞ্জনের কাছে মনে হচ্ছিলো, এ একটা অসুস্থ ভাববিকার, প্রায় একটা মানসিক হিষ্টিরিয়া। তার চোখের উপর সমস্তটা অভিনয় ঠিক একটা স্থূল প্রহসনের মতো। শ্রীপর্ণা ছেলের জন্যে সংসার থেকে পর্য্যন্ত খসে' এসেছে। আজ হাতে তার অনেক কাজ—তার ছেলে।

ঠাকুরকে ছু'-একটা রান্না সে এখন মাঝে-মাঝে শুধু দেখিয়েই দিতে পারে, নিজের হাতে আর খুন্তি নাড়তে পারে না। ততোক্ষণ তার ছেলে করবে কী একলা, তাকে পড়া বুঝিয়ে দেবে কে? তাকে স্নান করানো, সাজানো-গোছানো, খাওয়ানো-দাওয়ানো—তার আর এখন অতো সময় কোথায়? দুপুরবেলা কোনোদিন বা আদিত্যকে নিয়ে জু-তে বেরোতে হয়, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখাতে হয় তাকে জন্তু-জানোয়ার, ক্যাঙ্গারু কেমন করে' হাঁটে, ভাল্লুকের কেমন জ্বর হয় মিনিটে-মিনিটে, ঐ বাঁদর থেকে কেমন করে' আস্তে-আস্তে মানুষ হয়ে' উঠেছে। কোনোদিন যায় মিউজিয়ামে, কোনোদিন বা জংলি কোনো সিনেমায়। এমন অদ্ভুত, নিরঞ্জনের সম্মানজ্ঞান এতো নিখুঁত যে, এই জন্যে, শ্রীপর্ণার এই সব অসামাজিক সহর-বেড়ানোর জন্যে, তাকে আরেকটা ফালতু মোটর কিনে দিতে হয়েছে। সে-ও তাই তার নিজের মোটরে করে' একা-একা সহরে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে-সেখানে, যাবার মতো কোথাও একটা জায়গা আছে কিনা যেতে-যেতে আশে-পাশে তারই কেবল সন্ধান করতে থাকে।

তাই বলে' শ্রীপর্ণা নিরঞ্জনের প্রতি কর্ত্তব্যে, নিজেকে খাটো করে' এনেছে, এ-কথা ভাবতেই পারো না। কী নিরঞ্জনের চাই, সব তার কাছটিতে। ঘুম থেকে উঠতে-না-উঠতেই চায়ের ট্রে-টি সাজানো, স্নান করবার জল ভরা টবে, কখন আজ আপিসে বেরুবে দয়া করে' একবারটি বললেই হয়, টেবিলে খাবার তৈরি। প্যাণ্টের ক্রিজ্‌টি থেকে টাইয়ের পিন্‌টি পর্য্যন্ত

নিখুঁত। জুতো তার একদিনো শুকিয়ে থাকে না, চাকরের হাত জোড়া থাকলে শ্রীপর্ণা নিজেই বুরুস করতে বসে। কী তার চাই মুখ ফুটে একবার বলুক না সে, শ্রীপর্ণা একশো হাতে তা এক্ষুনি করে' আনবে। কেস্-এ সিগারেট পর্য্যন্ত সে সাজিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য্য, কিছুই আর তার চাইতে হয় না, আশ্চর্য্য, চাইবার সুযোগ দেবার জন্যে শ্রীপর্ণা কোথাও এতোটুকু খুঁত রাখে নি। শোফারটাকে শ্রীপর্ণার জন্যে রেখে সে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে' যায় আপিসে, হায়, তার আপিসে! আপিসেই সে আজকাল টিফিন খেয়ে এলে শ্রীপর্ণার দোষ কী, সে তো রোজ রাতে যতোক্ষণ না নিরঞ্জন বাড়ি ফেরে, ততোক্ষণ উপোস করে' জেগে বসে' থাকে। সে যদি আজকাল রাতের খাওয়া হোটেলেই বন্দোবস্ত করে' নেয়, তবে শ্রীপর্ণা কী করতে পারে? তার দিক থেকে কোথায় কী ত্রুটি হচ্ছে বলো। দিব্যি তার জন্যে সে ধব্‌ধবে নিভাঁজ বিছানা পেতে রেখেছে, মশারি ফেলে তার কোণীয়তম কুঞ্চনটি পর্য্যন্ত সে গুঁজে দিয়েছে টান করে', ফুলদানিতে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল রয়েছে তার প্রতীক্ষায়। নিরঞ্জনের ফিরে আসার সাড়া পেলে শ্রীপর্ণা অনুগামিনী স্ত্রীর মতো সেই ঘরে এসে একটু হাজির হয়, এটা-ওটা যদি কিছু তার লাগে, এগিয়ে দেবার জন্যে, জানলাটা খোলা থাকবে না বন্ধ করে দেবে, কিম্বা আদিত্য যদি কিছু নতুন দুষ্টুমি বা আবদার করে' থাকে তার স্বগত ইতিহাস বলতে। এ-যেন তার গৃহচর্য্যারই একটা অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে, দিনের শেষে গৃহকর্ত্রীর কাছে চাকর যেমন এসে কুণ্ঠিত মুখে বাজারের

হিসেব দেয়। কোনো-কোনোদিন বা একটু গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করে মিষ্টি একটু হাসি মাখিয়ে, কিন্তু নিরঞ্জন তখুনি যদি মশারি তুলে শোবার উদ্যোগ করে, তবে একতরফা সেই গল্প শ্রীপর্ণা কতোক্ষণ জমাতে পারবে? মাঝে-মাঝে দুয়েকটা সে ব্যক্তিগত কথারো অবতারণা করে, কিন্তু চারপাশে অনুকূল বাতাস না থাকলে কতো আর সে সুতো ছাড়তে পারে জিগ্‌গেস করি? এক-আধবার সে বলেও গম্ভীর হ'য়ে, যেন কতো গভীর চিন্তার তলা থেকে বলছে: তোমার আজকাল দেখছি খুব বেশি খাটনি পড়েছে, কিন্তু এতো খাটলে শরীর তোমার টিঁকবে কেন? কিন্তু যার উদ্দেশে এই কথা বলা, কথাটা না শোনার আগেই যদি সে ঘুমে তলিয়ে যায়, তবে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই অভিযোগ আর কোথায় দাঁড়ায় বলো? অগত্যা সেই নীরবতাকেই শ্রীপর্ণার সম্বোধন করতে হয়—যে-কথাটুকু এখনো বলা তার শেষ আছে। সুইচ-বোর্ডের কাছে এসে সে বলে, —যে-কথা শোনবার জন্যে নিরঞ্জন সমস্ত ঘরে কান পেতে আছে—বলে: আমি এবার চললুম ও-ঘরে। সঙ্গে সে একটি ব্যাখ্যাও জুড়ে দেয়: ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে আমাকে পাশে দেখতে না পেলে ও ভারি ভয় পাবে। তারপর আলোটা দেয় নিবিয়ে। আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্যেও তো তার একবার আসা উচিত। তারপর—তারপর আবার কী! সারাদিন শ্রীপর্ণাও তো আর কম টো-টো করেনি, ঘুমে একবার ধুয়ে গেলে মানুষের আবার কী দুঃখ! ততোক্ষণই তার জাগ্রা, যতোক্ষণ সে জেগে থাকে।

যতোক্ষণ সে জেগে থাকে। নিরঞ্জন জেগে থাকে তার আপিসে, তার টাকার চক্রাকার ঘূর্ণ্যমানতায়। মানুষের সঙ্গে যতো জটিল চুক্তির জালে জড়িত হ'য়ে। সংসারে কাউকে বিশ্বাস নেই, থাকতে হয় এমনি একটা ধূমময় আতঙ্কিত আবহাওয়ায়। কে তাকে কখন ঠকাচ্ছে, কা'কে সে কখন ঠকাতে পারলো না, এমনি একটা সন্দেহের কলুষিত আবর্ত্তে। যেন কোথাও তার জন্যে উত্তপ্ত একটি স্বাভাবিকতা নেই, তার আত্মার বিনিঃশেষ উদ্‌ঘাটন। সব সময়েই তাকে একটা মুখোস টেনে থাকতে হচ্ছে, লোভী, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর। কোথাও, কোনো মুহূর্ত্তেও, সে এই মুখোসটা খুলে ফেলতে পারছে না,—তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হ'য়ে এলো, দেখতে পারছে না সে তার সত্যিকারের নিজের মুখ আর কারো মুখের দর্পণে। দেখতে পারছে না এই লোভ কেমন সুন্দর হ'য়ে ওঠে দেবতার আরাধনায়, এই নিষ্ঠুরতা কেমন বলশালী হ'য়ে ওঠে জীবনের দৃপ্তিতে, এই স্বার্থপরতা কেমন ঐশ্বর্য্যময় হ'য়ে দাঁড়ায় আত্মবিকীরণের বহুলতায়! একেক দিন আপিসের চেয়ারে তার মেরুদণ্ডটা অবশ হ'য়ে আসে: এ সে করছে কী, কা'র জন্যে সে দু'হাতে এই টাকা লুটে চলেছে? এতো টাকা, শুধু এতো টাকা দিয়ে তার কী হ'বে, কিসের জন্যে সে এতো ভার জমা করছে, ক্ষয় করবেই বা সে কিসের প্ররোচনায়? কচুরি-পানায় ভরে' উঠেছে নদী, কোথায় তার সেই উত্তাল, উত্তরঙ্গ মহিমা! নিজেকে যদি সে প্রচুরই না মনে করতে পারলো বাঁচবার উৎসাহে, তবে এই টাকায় তার চিতার উপরে প্রকাণ্ড একটা মঠ তৈরি হোক্। টাকা—টাকা

সে ব্যয় করছেও তো অজস্র, এখানে-সেখানে, নানা অবান্তর অভিলাষে; ক্ষণকালিক উন্মাদনায়, কিন্তু সুখই সে পেলো, পেলো না বিস্মৃতি, শিহরণই সে পেলো, পেলো না সেই অতলতম শান্তির গভীরতা। হায়, টাকা দিয়ে প্রেমই শুধু কিনতে পাওয়া গেলো না। এক জায়গায় এসে টাকাও তার শক্তিমত্তা হারিয়ে বসে: লক্ষ-লক্ষ উপকরণের সঞ্চয়েও এক জায়গায় শূন্যতা তুমি কিছুতেই ভরে' তুলতে পারো না। ব্যয় যে করবে তারো পিছনে একটা কল্পনা থাকা চাই, সেই কল্পনায় বিলাস পর্য্যন্ত কবিতার মতো অপরূপ হ'য়ে ওঠে, কিন্তু যেখানে সেই কল্পনার প্রসার নেই, সেই উদ্বৃত্ততার সমারোহ, সেখানে ব্যয় একটা প্রচণ্ড অভিশাপ। তুমি একটা তাজ-ও গড়তে পারো, একটা গম্বুজও গড়তে পারো। টাকার পরিস্ফীতি দিয়ে নিরঞ্জন এখন এই গম্বুজ তৈরি করতে চলেছে। তার চারদিকে কেবল পাথর আর পাথর, মসৃণ ও শীতল, পাথরের নিশ্চল নৈঃশব্দ্য।

আপিস যাওয়া নিরঞ্জন একরকম বন্ধ করে' দিলে। বন্ধ করে' দিলে, কেননা, যতো রাতেই হোক্, আপিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার মধ্যে আগের সেই মধুর ক্লান্তি নেই, সেই মধুর সতৃষ্ণতা। এখন বাড়ি হ'য়ে উঠেছে যেন ঠাণ্ডা একটা গুহা, দেয়ালগুলো যেন মৃত হাতের স্পর্শ দিয়ে তৈরি, মাথার উপরে আলোটা যেন নীরবে অট্টহাস্য করছে। বাড়ি ফিরে এসে মুখোসটার তার রঙ বদলাতে হয় শুধু, টেনে খুলে ফেলতে পারে না। আগে-আগে আপিসে যখন সে নিজেকে ছড়িয়ে দিতো রাশি-রাশি কাজে, কাজের অদম্য দানবিকতায়, তখন তার মনের

নিঃশব্দ গভীরে একটি তৃপ্তি, একটি প্রতীক্ষা থাকতো ঘুমিয়ে, যে, তার এই জানলার পিছনে আরেকটি জানলায় শ্রীপর্ণা চুপ করে' বসে' আছে। বসে' আছে কখন সে বাড়ি ফিরবে। নিরঞ্জন আজকাল আর বাড়ি ফেরে না, তার কোঠায় ফেরে। সারা দিন সে কী করে নিজেই সে বলতে পারবে না গুছিয়ে, তার জীবনে এসেছে একটা ছন্দোহীন বিশৃঙ্খলা, যাতে দ্রুততার দীপ্তি নেই, শুধু একটা এলোমেলো খামখেয়াল, যেমন আত্মহত্যা করবার আগে কোনো লোক এখানে-সেখানে ছট্‌ফট্ করে' বেড়ায়, সেই আতঙ্কময় সঙ্গচ্যুতিতে। তবু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হাতে তার কিছু টাকা ছিলো।

সেদিন বাড়িতে বসে'ই জানা গেলো, এতোদিন পরে তাদের সেই ষ্টিম-লঞ্চটার খদ্দের জুটেছে : তাকে একবার আপিস যেতে হ'বে। বিক্রি করলেই হাজার কয়েক টাকা মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে আকাশ-ফুটো, অতি-সহজে, অতি-অকাতরে। এ দাঁও ছাড়তে নেই ; যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, সেখানে পক্ষাহত লোকও নিশ্চেষ্ট থাকে না। হ্যাঁ, টাকা—টাকায় আবার মানুষের কোন কালে অরুচি হয়েছে? কেউ মরলে প্রথমেই আমরা জিগ্‌গেস করি, কতো টাকা সে রেখে গেলো? নিরঞ্জন অনেক দিন পর আপিসের চেয়ারে গদিয়ান হ'য়ে বসলো। এর মাঝে যদিও কখনো গেছে, টাকা আনতেই গেছে, নতুন করে' টাকা আসবার পথ করতে যায় নি। সহজেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মোটা কিছু সে পকেটস্থ করলে—তার ন্যায্য টাকা, তার প্রাপ্য দাবি। কোথা থেকে কী করে' মানুষের মন মোড়

ঘুরে বসে, বলা কঠিন। ঠিকই তো, সবই তো তার ন্যায্য পাওনা, বিশাল তার অধিকার, অপরাভূয় তার প্রভুত্ব। সূচ্যগ্র মেদিনীই বা সে কেন ছাড়বে? কেন সে স্থাপন করবে না তার বলিষ্ঠ দাবি, তার বিস্তীর্ণ আধিপত্য—যখন হাতের মুঠোর মধ্যেই তা আছে, প্রতিটি নিশ্বাসের নাগালে!

নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। সোজা বেরিয়ে পড়লো গাড়ি করে'। ঘুরলো ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ঘুরলো মার্কেট, ঘুরলো পার্ক-স্ট্রিট—চোখ-মুখ বুজে কী কতোগুলি সে সওদা করলে। তারপর সিধে বাড়ি চলে' গেলো।

আর-আর দিনের মতো ঢুকলো না সে আজ অপরাধীর চেহারা করে'। নিচের দোর-গোড়া থেকেই তার আবির্ভাবটা বাড়ির সমগ্র বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়লো। চাকর একটা ধমক খেলো, সদর খুলতে তার এতো দেরি হয় কেন, সিঁড়ির কাছে ছিলো একটা বালতি, সেটা একটা লাথি খেয়ে ছিট্‌কে পড়লো শব্দ করে', বারান্দার উপর কে কতোগুলি নেবুর ছিব্‌ড়ে ফেলে রেখেছে, নিরঞ্জনের মুখে তার মুণ্ডুটা আর আস্ত রইলো না।

তবু এতো গোলমাল শুনেও শ্রীপর্ণা এলো না বাইরে বেরিয়ে।

নিরঞ্জন দরজার ওপারে চুপ করে' এসে দাঁড়ালো।

দেখলো ছোট টেবিলটির পাশাপাশি দু'খানি চেয়ারে শ্রীপর্ণা আর আদিত্য নিতান্ত সমবয়সীর মতো ঘেঁসাঘেঁসি করে' বসেছে। কাঁধের ধার বেয়ে বাহু ছুঁয়ে পিঠের উপর শ্রীপর্ণার চুলগুলি রয়েছে ছড়িয়ে, ঘোমটার একটা আভাস কোথাও নেই, শুধু সাদা একটি সেমিজে তাকে দেখাচ্ছে অনেক ছোট, প্রায় নতুন-সাড়ি-পরতে-শেখা

গ্রামের কিশোরী। দুই হাতের মাঝখানে মোটা একটা বই ধরা, তার থেকে সুর করে'-করে' পদ্যের আকারে ছেলেকে সে কী পড়ে' শোনাচ্ছে! এ পৃষ্ঠায় নতুন কী একটা ছবি এসে পড়েছে, তাই ভালো করে' দেখবার জন্যে আদিত্য উঠেছে চঞ্চল হ'য়ে, চেয়ারে সে ঠিক জুৎ করে' বসতে পারছে না। মাত্র একটা পাখি হ'য়ে নখের আঁচড় ও পাখার ঝাপট দিয়ে জটায়ু কী করে' দশ-মাথা-ওয়ালা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করলে, সেটা তার চোখের নানারকম কোণ থেকে দেখা চাই।

দরজার ওপারে নিরঞ্জনের নিঃশব্দ উপস্থিতিটা অনড় একটা অন্ধকারের মতো ভারি হ'য়ে রইলো।

নিরঞ্জন দূর থেকে বল্‌লে,—শোনো!

যেন সে চৌকাঠটা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে না। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে' শিশুর চোখে উপভোগ করতে পারে না এই যুধ্যমান পাখির ছবিটা। ভাগ নিতে পারে না তাদের এই সুখে, যোগ দিতে পারে না এই সরলতায়। যেন এইখানে তার শত্রুর তাঁবু। যেন এটা একটা সাপের কোটর।

নিরঞ্জন চাপা গলায় আবার হাঁকলে : শোনো!

শ্রীপর্ণা তাড়াতাড়ি খোঁপা জড়ালো, বাহু ও পিঠ ঢেকে আঁচল দিলো টেনে, ছোট একটি ঘোমটায় কপালের কাছেকার গুঁড়ো-গুঁড়ো চুলগুলি দিলো ঢেকে। মুহূর্ত্তে হারিয়ে ফেললো সে তার সমস্ত শ্রী, শীতল, শিথিল সেই শ্রী, হারিয়ে ফেললো সে সমস্ত সরলতা, সেই সস্মিত সরলতা। উঠে দাঁড়ালো সে বয়সের বোঝা নিয়ে, যেন তার কঠিন, নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্বে, তার অনমনীয় নাগরিক

ভঙ্গিমায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে আদিত্যকে সে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—তুমি ততোক্ষণ ছবি দেখ, উনি কী বলছেন আমি শুনে আসছি।

নিরঞ্জনকে শ্রীপর্ণা তার শোবার ঘরে অনুসরণ করলে। কী এমন গূঢ়, দরকারি কথা থাকতে পারে শ্রীপর্ণা আকাশ-পাতাল কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

হাতের থেকে প্যাকেটটা খাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে নিরঞ্জন রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলে: তুমি এ কী আরম্ভ করেছ?

প্রশ্নটা যেন শ্রীপর্ণার দুই চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। চারদিকে চেয়ে কোনো যেন সে কিনারা করতে পারলো না, শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—কেন, কী হ'লো?

—দিন নেই রাত নেই ছেলে নিয়ে এ তুমি কী ছেলেখেলা সুরু করেছ জিগ্‌গেস করি? না, নিরঞ্জন আর লজ্জা করবে না, যা বলবার সোজাসুজি বলে' ফেলে সে হালকা হ'বে। অন্ধকারে বসে' পারবে না সে আর নিজেকে ক্ষয় করতে।

শ্রীপর্ণা হাসিমুখে বল্‌লে,—রামায়ণ পড়ে' শোনাচ্ছিলুম। ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেখেলাই তো করতে হয়।

—কেন, ওকে একটা ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারো না? নিরঞ্জন মুখিয়ে উঠলো।

ঘরে যখন ঢুকেই পড়েছে, শ্রীপর্ণা এটা-ওটা কাজ করে' দিতে লাগলো। বল্‌লে,—কাছাকাছি ভালো ইস্কুল কোথায়?

—কাছাকাছি না থাকে, যেখানে সঙ্গে বোর্ডিং আছে, তেমন একটা ইস্কুলে রেখে দিলেই তো চলে' যায়।

—বোর্ডিং? শ্রীপর্ণা যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

—হ্যাঁ, সেখানে থাকলে ভালো পড়াশুনো হ'বে। কী বল্‌লে যে কথাটা ভালো মানায় নিরঞ্জন চট্‌ করে' কিছু ভেবে উঠতে পারলো না : বেশ চালাক ছেলে, তোমাকে ছেড়ে অনায়াসে একা থাকতে পারবে। শিশুকাল থেকে নিজের ওপর বিশ্বাস করে' একা থাকতে পারাটা ভবিষ্যতে অনেক ফল দেয়। যা মুখে এলো নিরঞ্জন আবোল-তাবোল বকে' যেতে লাগলো : আমাদের বাঙালি ছেলেদের হাতে-পায়ের বেড়ি হয়েছে এই মায়ের আঁচল। ছেলের যদি ভালো চাও, এবং ভালোই চাও আশা করি—নিরঞ্জন কথাটাকে শেষ করতে পারলো না : মন্দ কী, মাঝে-মাঝে গিয়ে আমরা দেখে আসবো, খোঁজ-খবর নেবো নিয়মমতো, ছুটি-ছাটায় বাড়িতে নিয়েও আসতে পারো ইচ্ছে করলে। নইলে, এ কী—এ কী বিশ্রী—

লজ্জা শেষ পর্য্যন্ত নিরঞ্জনকেও করতে হ'লো যে।

শ্রীপর্ণা ম্লানমুখে বল্‌লে,—বোর্ডিঙেই যদি রাখবো, তবে ও-বাড়িটা কী দোষ করেছিলো?

—কিছু দোষ করে নি। নিরঞ্জন প্রচ্ছন্ন রাগে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে,—বেশ, আঁচলেই যদি বেঁধে রাখতে চাও, আঁচলটা একটু টেনে লম্বা করলে কী ক্ষতি? কাছাকাছি ইস্কুল না থাকে, দূরে তো আছে। আর যাদের তিন-তিনখানা মোটর আছে মজুত, কল্‌কাতা সহরে তাদের দূর বলে' কিছু নেই। বেশ তো, ভালো ইস্কুলেই ভর্ত্তি হোক্‌ না, ওর জন্যে আরো একটা না-হয় স্তোফার রেখে দেবো—ক্ষতি কী, কতো টাকাই তো কতো দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার আদিত্যর গ্রহ-নক্ষত্র তো এমন

কিছু প্রতিকূল দেখছি না, বিদ্রূপে নিরঞ্জনের চোখ দুটো ধারালো হ'য়ে উঠলো : ভাগ্যক্রমে সে তো বড়ো লোকের আশ্রয় পেয়েছে।

কথাটা শ্রীপর্ণা গায়ে মাখলো না, কথাটার মধ্যে নির্লজ্জ একটা সত্য আছে। শুধু শান্ত গলায় বল্‌লে,—পাগল! এইটুকু ছেলে ইস্কুলে পড়বে কী! এখন পর্য্যন্ত রামায়ণের গল্প ও জানে না।

—ক'টা ছেলের জানবার এমন মাথাব্যথা হয়েছে শুনি? না, তারা ইস্কুলে কেউ পড়ে না? আমিই জানি? নিরঞ্জন মুখ খিঁচিয়ে উঠলো : আমিই বলতে পারি তোমার জটায়ু পাখি ছিলো, না, বাঁদর ছিলো?

শ্রীপর্ণা না হেসে থাকতে পারলো না। বল্‌লে,—তুমি না জানলে কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু আদিত্যর জানা চাই।

—সংসারে তোমার আদিত্যই একমাত্র দিগ্‌গজ হ'বে।

—হ'লে হ'তেও পারে। কী করে' তুমি বলো?

—কিন্তু রামায়ণ পড়াবার জন্যে ওর ইস্কুল বন্ধ করছ কী বলে'?

—ইস্কুলের মাষ্টারদের থেকে আমি ভালো পড়াতে পারবো বলে'। শ্রীপর্ণার গলা ঈষৎ তপ্ত, গম্ভীর হ'য়ে উঠলো : ইস্কুলের মাষ্টাররা কেমন করে' পড়াতে হয় তা জানতে পারে, কিন্তু কী পড়াতে হয় তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। আমি ইস্কুলের মাষ্টার তো ছিলুমই, শ্রীপর্ণা মসৃণ দাঁতে পরিচ্ছন্ন একটু হাসলো : এখন মা হয়েছি।

—তা আমি জানি না। নিরঞ্জন, পরাভূত, বিপর্য্যস্ত নিরঞ্জন

হঠাৎ একটা চীৎকার করে' উঠলো : আমি জানি না। তুমি আমার সঙ্গে এখন বেরুবে কিনা বলো ?

—কোথায় ?

—বেড়াতে।

—বেড়াতে ? শ্রীপর্ণা খুসিতে উঠলো ঝল্‌মল্‌ করে' : নিশ্চয়, নিশ্চয় যাবো। এক্ষুনি, এই মুহূর্ত্তে। তবু যা হোক, অভিমানে শ্রীপর্ণার চোখ দু'টি একটু আর্দ্র হ'য়ে এলো : এতোদিনে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বল্‌লে।

বরং এতোদিন ধরে' এই ছিলো শ্রীপর্ণার অভিযোগ। আদিত্যর আসার পর থেকে নিরঞ্জন কেমন দূরে সরে' গেছে, শীতকালের তির্য্যক সূর্য্যের মতো। আদিত্যর আসার পর থেকে সে কেমন হঠাৎ উদাসীন হ'য়ে পড়েছে, তার নেই সেই আগের উত্তাপ, আগের উৎসাহ। যেন আদিত্যকে সংসারের সমস্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে সে চলে' গেছে নির্ব্বাসনে : এ বাড়ি-ঘর যেন তার নয়। ছোট, একরত্তি এই ছেলেটার প্রতি তার এতো অভিমান, এতো ঈর্ষা। সে আজকাল হোটেলে খায়, প্রায় সমস্ত রাত তার ফেরবার প্রতীক্ষায় শ্রীপর্ণাকে আলো জ্বেলে' বসে' থাকতে হয়, এখান দিয়ে, ঘরের এই দুয়ার দিয়ে চলে' যাবার সময়ো তাকে সে একটিও কথা বলে' যায় না গায়ে পড়ে'। যেন ঘুমন্ত আদিত্য তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। একবারটিও কাছে ডাকে না, ফরমাজ করে না, ভুল ধরে' ভুল করে' একবার বকে না পর্য্যন্ত। আগে কতো-কতো জিনিস সে তাকে এনে দিতো ভারে-ভারে, আজকাল কল্‌কাতার সমস্ত দোকান-দামি

যেন দেউলে হ'য়ে গেছে। আদিত্য যেন তার কতো বড়ো শত্রু, আদিত্যকে কোলে নিয়ে নিরঞ্জনের কাছে তার জাত গেছে: সে অস্পৃশ্য, সে অশুচি। তার মাতৃস্নেহটা যেন নিরঞ্জনের কাছে প্রায় অসতীত্ব। অথচ, নিরঞ্জনো যদি মিশে যেতো এই সুধাস্রোতে, এই শৈশবারাধনায়, যদি আদিত্যকে করতো স্নেহ, শ্রীপর্ণাকে সম্মান, তবে কতো সুন্দর, সহজ হ'য়ে যেতো। জীবনের দশ দিক কেমন ভরে' উঠতো সৌরভে। তা নয়, আদিত্যকে নিরঞ্জন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না, নিষ্পাপ, অবোধ, সরল একটা শিশুর প্রতি যতো তার আক্রোশ, যতো তার প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ। মা হ'য়ে শ্রীপর্ণাই বা তা কী করে' ক্ষমা করতে পারে?

আজকে হঠাৎ এই অযাচিত অভ্যর্থনায় শ্রীপর্ণা সারা শরীরে খুসির ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাওয়া বুঝি ফিরলো এতোদিনে। কয়েদখানার দরজা গেলো খুলে।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তবু, কদ্দুর যাবে?

—ঠিক কী! আগে বেরিয়ে তো পড়ি, তারপর দেখা যাবে। মিসেস রায়ের ওখানে কতোদিন যাইনি। নিরঞ্জন খাটের রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে' প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়ালো: এই নাও, তোমার জন্যে দু'টো জিনিস কিনে এনেছি।

শ্রীপর্ণা ক্ষিপ্র হাতে প্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বল্‌লে,—কী ওটা?

—দেখই না খুলে।

ছাপ-মারা দড়িটা শ্রীপর্ণা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো: সাড়ি! ও বাবাঃ, কী গর্জাস রঙ!

—হ্যাঁ, যাও, তৈরি হ'য়ে নাও চট্ করে'।

—ও বাবাঃ, কে এ পরবে? শ্রীপর্ণা ঠোঁট উল্টোলো।

—কেন? কতো দাম, কিছু আন্দাজ করতে পারো?

—না-ই পারলুম, কিন্তু এ-সাড়ি আমি পরবো কবে?

—আজই।

—পাগল! শ্রীপর্ণা হেসে ফেললো: লোকে বল্‌বে কী! আমার এখন বয়েস হয়েছে না?

—কতো বয়েস? কতো বছর হ'লে মেয়েদের বয়েস হয়?

—যাই হোক্, আমি মা হয়েছি না? শ্রীপর্ণা তার চোখে রহস্যময় একটি আভা ফোটালো।

—মা হয়েছ তো আমার কী!

—তোমার কী মানে? শ্রীপর্ণা গাম্ভীর্য্যে অটল হ'য়ে দাঁড়ালো: তুমি জানতে না কখনো?

নিরঞ্জন মিইয়ে গেলো: তা, মা-রা কি আর সাজে না?

—আমিও তেমনি মায়ের মতোই সাজবো। সঙ্গে আরেকটা বাক্স ছিলো, শ্রীপর্ণা এবার সেটার মুখ টিপলে। বেরিয়ে এলো ঝক্‌ঝকে একটা নেকলেস। বল্‌লে,—কী সর্ব্বনাশ! এ করেছ কী? টাকা তোমাকে কামড়াচ্ছিলো নাকি?

শ্রীপর্ণার এই অহৈতুক গিন্নিপনা নিরঞ্জনের একদম সহ্য হ'লো না। সে ঝাঁজিয়ে উঠলো: আমার টাকার জন্যে তোমার মায়া করতে হ'বে না। তুমি এখন যাও, তৈরি হ'য়ে এসো। আমি গাড়ি বা'র করতে বলছি।

শ্রীপর্ণা হঠাৎ খিলখিল করে' হেসে উঠলো: এই সাড়ি আর

গয়না পরে' বেরুলেই হয়েছিলো আর-কি। সবাই আমাকে ঠিক পোদ্দারের বৌ ভাবতো।

—তাই তো চাই। নিরঞ্জন জোর দিয়ে বল্‌লে।

—কী চাও?

—তোমাকে যাতে লোকে কারুর স্ত্রী বলে' ভাবতে পারে।

রূঢ় ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে শ্রীপর্ণা ম্লান হ'য়ে গেলো। বল্‌লে, —আর কিছু আনো নি?

—আর আবার কী আনবো? পাঁচ শো টাকা আমার এতেই বেরিয়ে গেলো।

—অন্তত পাঁচ পয়সার একটা জিনিস। শ্রীপর্ণা করুণ গলায় বল্‌লে,—আদিত্যর জন্যে একটা কিছু আনলে না কেন?

—যাও, যাও, আমি পারি না অতো সোহাগ করতে। শিগ্‌গির তৈরি হ'য়ে নাও। নিরঞ্জন বাথরুমে ঢুকে গেলো: চা-টা আমরা বাইরেই খাবো।

শ্রীপর্ণা যখন তৈরি হ'য়ে ফিরলো, পরেনি সে সেই সাড়ি, গলায় নেই সেই হার, নিরঞ্জনের দু' চোখ উঠলো জ্বালা করে'। কিন্তু এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে তার আর ইচ্ছে হ'লো না। এমনিতে, হঠাৎ দেখলে, বেশ পরিচ্ছন্ন সাজ হয়েছে এ-কথা বলতেই হ'বে—সাদা গরদের জমির উপর কালো সতরঞ্চি পাড়, কিন্তু বলতে কি, তার সাড়ি-পরার ধরনটাই কেমন রূঢ়, কেমন সম্বৃত। আঁচলে সেই বিলোল আলস্য নেই, নেই সেই সিল্কের একটি নরম বিশৃঙ্খলা। সযত্নে সেই একটু শিথিল হ'য়ে থাকবার কৌশলটি সে হারিয়ে ফেলেছে। আজ আর সঙ্কেত নয়, সে যা, তা

যেন সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চায়, তার দেহ বহন করবার নির্লিপ্ততায়, এমন-কি তার সাড়িতে। খোঁপাটা সে আজ বেঁধেছে কোনোরকমে হাত-প্যাঁচ করে', তার চুলে নেই আর সেই পুঞ্জিত উজ্জ্বলতা। শরীরে কোথাও নেই একটুও স্পর্দ্ধা, যেন তলহীন গম্ভীর তৃপ্তি। তার লাবণ্যটি আজ নির্ঝরধারার মতো বর্ষমান নয়, দীঘির জলের মতো প্রশান্ত। গলায় সরু একটি হার, এতো ছোট যে, আগের মতো বুকের খানিকটাতে এসে টিক্‌টিক্ করছে না, ফুল্-হাতা সাদা সিল্কের ব্লাউজে কাঁধ থেকে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ঢাকা, কোথাও নেই সেই লীলা, সেই দ্যুতি, হাতার নিচেই চাপা পড়েছে হাতের চুড়ি ক'গাছ, চাপা পড়ার জন্যে থেকে-থেকে আর তাদের সেই চমকিত বাজনা নেই। সমস্ত সজ্জাটিকে সে আজ বেঁধেছে যেন উদাস ভৈরবীর সুরে। চারপাশের আবহাওয়ার আভাটিকে সে এতো নামিয়ে এনেছে যে, তার সঙ্গে এখন কথা বলতে হ'লে গলার স্বর পর্য্যন্ত কোমল, বিষণ্ণ করে' তুলতে হ'বে। গাম্ভীর্য্যে ও নিঃশব্দতায় সে এতো পবিত্র, এতো অব্যাহত যে, তাকে যেন এখন স্পর্শ পর্য্যন্ত করা যাবে না।

শ্রীপর্ণার বাঁকা ঠোঁটে সেই পিছল হাসিটি কিছুতেই ফুটলো না, আর এলো না সেই গ্রীবার বঙ্কিমা। বল্লে,—কী, কিছু খারাপ হয়েছে দেখতে?

নিরঞ্জন ত্বরান্বিত হ'য়ে বল্লে,—জানি না। চলো। শিগ্‌গির।

কিন্তু নিচে, সদরের কাছে এসে, নিরঞ্জন আপদমস্তক পাথর হ'য়ে গেলো। শোফার মোটর বা'র করেছে রাস্তায়, হুড্‌টা তোলা,

তার ভিতর কোট ও ধুতি পরে', সিঁথি পেড়ে, ফিতে-বাঁধা জুতো এঁটে, আদিত্য সিটে হেলান দিয়ে বসে' আছে।

বিরক্তির বিষে নিরঞ্জন জর্জ্জর হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,—এ কী? ও কোথায় যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে?

শ্রীপর্ণা শান্ত মুখে বল্‌লে,—কোথায় আবার যাবে! আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে।

নিরঞ্জন প্রতি তন্তুতে ছট্‌ফট্ করে' উঠলো: বা, ওকে কেন সঙ্গে নিয়ে চলেছ? ও সঙ্গে গেলে চলবে কেন?

শ্রীপর্ণা গাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে বল্‌লে,—তবে ওকে কোথায় রেখে যাবো? ও সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী? ও-ও না-হয় আমাদের সঙ্গে একটু ঘুরে এলো। এসো, নিরঞ্জনকে শ্রীপর্ণার ডাকতে হচ্ছে: মিসেস রায়ের ওখানেই যদি যাও, বেশ তো, তাঁর ছেলেদের সঙ্গে ও স্বচ্ছন্দে খেলা করতে পারবে।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে, আস্তে-আস্তে, গাড়িতে এসে উঠলো। নইলে ভালো দেখায় না, কিছু মানে হয় না না-গেলে। সামান্য একটা শিশুর কাছে হার মেনে যাওয়ায় কোনো পৌরুষ নেই।

এক ধারে শ্রীপর্ণা, আরেক ধারে নিরঞ্জন, মাঝখানে আদিত্য। গাড়ি ছেড়ে দিলো। সামান্য একটা শিশু, তার দুই তীরে সঙ্কীর্ণ একটা সেতু নয়, পরিব্যাপী, বিশাল একটা পর্ব্বতের ব্যবধান।

শ্রীপর্ণা আদিত্যর সঙ্গে খোলা গলায় নানা রকম আলাপ করে' চলেছে। তাদের দু'জনের খুসি মোটরের শব্দকে উঠেছে ছাপিয়ে।

সার্কুলার-রোড দিয়ে উত্তরে কতোদূর যেতেই কি-একটা জায়গা বেছে নিয়ে নিরঞ্জন স্তোফারকে থামতে বল্‌লে।

শ্রীপর্ণা অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো: কী হ'লো?

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে' স্তোফারকে বল্লে,—একটু দাঁড়াও। আমি এখান থেকে একটু ঘুরে আসছি।

বলে' সামনের একটা বড়ো ফটক-ওলা বাড়িতে সে ঢুকে পড়লো।

যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনাটার সে একটা ভদ্র চেহারা দিতে চেষ্টা করলো। ফিরে এলো সে কয়েক মিনিট পরেই, এবং আশ্চর্য্য, এবার কিনা হাসিমুখে। নিখুঁত, নির্ভুল ব্যস্ততায়। গাড়ির দুয়ার ঘেসে এসে দাঁড়ালো যে-দিকটায় শ্রীপর্ণা বসেছিলো। সরল, স্নিগ্ধমুখে বল্লে,—ভারি মুস্কিল হ'লো, আমি এখন যেতে পারবো না। এখানে এসে একটা কাজে পড়ে' গেলুম হঠাৎ। কাজটা আজই হওয়া চাই।

শ্রীপর্ণার মুখে কোনো প্রতিবাদের রেখা ফুটবার আগেই নিরঞ্জন স্তোফারের কাছে সরে' এলো। বল্লে,—তুমি এদের নিয়ে যাও, মা-জী যেখানে যেতে বলেন। আমার জন্যে ফিরে আসতে হ'বে না, আমি ম্যানেজ করে' নিতে পারবো।

বলে' সে আর কোথাও ভ্রূক্ষেপ না করে' সোজা সেই ফটক-ওলা বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'লো।

আস্তে-আস্তে মোটরটা গেলো গড়িয়ে।

নিরঞ্জন রাস্তার দিকে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখলে গাড়িটা কদ্দুর গেছে। নিরাপদ দূরত্ব অতিক্রম করে' গেছে দেখে তৎক্ষণাৎ সে একলাফে একটা চলন্ত ট্র্যামে উঠে পড়লো।

বারো

আদিত্যকে শ্রীপর্ণা নানা ছল-ছুতোয় নিরঞ্জনের কাছে পাঠিয়ে দেয় নিরন্তর, নিঃসহায়, তার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে। শ্রীপর্ণাকে যদি সে সত্যিই ভালোবেসে থাকে, শ্রীপর্ণার দৃঢ় বিশ্বাস, তবে আদিত্যকেও সে ফেলতে পারবে না। আদিত্যকে নিয়েই তো সে যা, তা; আগেও যেমন ছিলো, আজকেও। এ যদি তার মহিমা না হ'য়ে একটা অসম্পূর্ণতাই হয় নিরঞ্জনের কাছে, তবে তার প্রেম এই অসম্পূর্ণতাকেই বা মার্জ্জনা করতে পারবে না কেন? প্রেম যদি পাপকে মেনে নিতে পারে, কলুষিত কদর্য্যতাকে, তবে এই তার ঐশ্বর্য্যময় রিক্ততাকেই বা সে কেন গ্রহণ করতে পারবে না—শুধু এই অকিঞ্চিৎকর একটা ছন্দ-পতন। আজ যদি শ্রীপর্ণার দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে হ'তো, এবং এই নিরঞ্জনেরই সঙ্গে, আর নিরঞ্জনের থাকতো একটি ছেলে, তবে শ্রীপর্ণা তাকে নিতো না কোল ভরে', দিতো না তাকে স্নেহ, তার এই দেহস্পন্দিত উত্তপ্ত স্নেহ? সে কি তখন উপন্যাসের বিমাতা হ'য়ে থাকতো? তবে এই বেলাই বা কেন বিপর্য্যয় ঘটছে?

শ্রীপর্ণার প্রচুর বিশ্বাস আছে, আদিত্যর ছোঁয়া লেগে নিরঞ্জনের এই ঔদাসীন্য খসে' পড়বে। নিজের প্রেরণায় না হোক্, নিষ্ক্রিয় অভ্যাসের বশে, প্রতিদিনের এই নিঃশব্দ চলমানতায়, আদিত্যকে সে স্বীকার করে' নেবে। তাই সে ঘন-ঘন কাজে-অকাজে নিরঞ্জনের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয়, এটা-ওটা এগিয়ে দেবার জন্যে, যেমন ধরো বাড়ির ঠিকানায় চিঠি এসে পড়লে চিঠি, হঠাৎ দেয়াশলাই ফুরিয়ে গেলে দেয়াশলাই, খাওয়ার পর পানের ডিবে। তার সঙ্গে আদিত্যর সে একটা গিঁট পাকাতে চেষ্টা করে। আজকাল নানা সাংসারিক ব্যাপারে নিরঞ্জনকে শ্রীপর্ণার দরকার হয় ঘন-ঘন, সেই সব কথা নিজে না বলে' ইচ্ছে করে'ই আদিত্যর মুখ দিয়ে পাঠায়, বলে: যাও তো আদি, ভদ্দরলোককে গিয়ে বলো তো, মা দশটা টাকা চেয়েছেন। কিম্বা: ভদ্দরলোককে গিয়ে জিগ্‌গেস করে' এসো তো, রাতে তিনি কী খাবেন? আরো: আমার এখন হাত জোড়া, সেলাই করছি, ভদ্দরলোককে দিয়ে তোমার ইংরিজি হাতের লেখার প্রথম লাইনটি লিখিয়ে আনো গে। নিরঞ্জনকে ভদ্রলোক ছাড়া আর কোনো বিশেষণে সে আখ্যাত করতে পারে নি। সে ভদ্রলোক—ভদ্রলোকের মতোই সে ব্যবহার করবে আশা করি। কোনোখানে, কোনো সময়ে, সে নিরঞ্জনের অনর্থক বিরক্তির কারণ ঘটালে শ্রীপর্ণা ছুটে এসে তক্ষুনি আদিত্যকে শাসন করে; বলে: দেখছো না এখন তিনি কাজ করছেন, কেন এইখানে বসে' চেয়ার দোলাচ্ছ? কিম্বা: এমনি করে' যেখানে-সেখানে কমলানেবুর ছিবড়ে ফেলে রেখো না, উনি

দেখতে পেলে ভীষণ রাগ করবেন। আরো: গেঞ্জিটা শিগ্‌গির গায়ে দাও আদি, উনি বাড়ি এসেছেন, খালি-গায়ে থাকাটা উনি একদম ভালোবাসেন না। এমনি করে' প্রতি পদে তাকে সে ভয় করতে শেখায়, ভক্তি করতে শেখায়, কিন্তু শ্রীপর্ণা একমাত্র তার নিজের ভালোবাসা দিয়ে নিরঞ্জনকে ভালোবাসতে শেখাতে পারে না।

নিরঞ্জন হয়তো নিচে আপিস-ঘরে বসে' কাজ করছে, কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো আদিত্য, তার মায়ের কী ফরমাজ নিয়ে। নিরঞ্জন অনেক সময় আদিত্যর মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকে, হাসিতে উজ্জ্বল, ভয়ে গম্ভীর, বিস্ময়ে সুন্দর সেই মুখ—কথার আভা-ভরা তার সেই দু'টি চঞ্চল চোখের দিকে: ভেবে পায় না এই একবিন্দু শিশু, কী করে' তার জীবনের অপরাজেয় পরম শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! তার হাসি, তার কথা, তার মনোহরণ সরলতা, নিরঞ্জনের বুকের কোন গূঢ়তম অন্ধকার থেকে তাকে দংশন করতে থাকে। কিন্তু মুখে তাকে হাসি আনতে হয়, সঙ্ক্ষিপ্ত হ'লেও কথার সে দরকারি জবাব না দিয়ে পারে না, আর এই নিরীহ, নির্ম্মল সরলতার সামনে সাধ্য কি তুমি রাগ দেখাতে পারো? তা ছাড়া তুমি ভদ্রলোক, তোমার বয়সের একটা সুস্থতা আছে, স্নায়ুর একটা সংযম, তুমি ইচ্ছে করলেই রাগের রশি ছেড়ে দিতে পারো না। অন্তত তোমার একটা ধনমর্য্যাদাও তো আছে, তুমি কৃপণ হও কী করে', তুমি ভালোবেসেছ, হীনতা তোমাকে শোভা পায় না। অতএব মাঝে-মাঝে, প্রায় নিজেরো অলক্ষিতে,

আদিত্যকে সে কাছে ডেকে আনে, তাকে ছোঁয়, তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে। হায়, মনের ভাসমান দুর্ব্বল একটি মুহূর্ত্ত। পরক্ষণেই সমস্ত শরীর তার রাগে ও জ্বালায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—সে হার মানতে বসেছে এই শিশুর কাছে, দাবি ছেড়ে দিতে বসেছে তার সমস্ত পৃথিবীর—তার আপ্রাণ হ'য়ে-ওঠার সাধনা—তাড়াতাড়ি আদিত্যকে সে মন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয় দূরে, তার নিশ্বাসের বাইরে। মনে হয়, ও যেন তাদের উজ্জ্বল উৎসবে রক্তিম পানীয়ের পাত্রে মড়ার একটা খুলি। তাদের আগ্নেয় পর্ব্বতের উপর ও জমেছে যেন তুষার হ'য়ে। তাদের ছন্দ দিয়েছে ভেঙে, তাদের স্বাভাবিকতার নির্ম্মল অনাবৃত আকাশে নিয়ে এসেছে ঘোরালো ঘনঘটা, তাদের স্বপ্নের উপর নিয়ে এসেছে রূঢ় রশ্মি। নিরঞ্জন অন্তরের অন্তরালে বসে' আর সহ্য করতে পারে না, সহসা সবলে তাকে ঠেলে দিয়ে একেক সময় ধমকে ওঠে: যা বলছি শিগ্‌গির এখান থেকে। সময় নেই, অসময় নেই, কেবল বিরক্ত করতে আসা! তোর মা নিজে আসতে পারে না?

একেক দিন শ্রীপর্ণারো আর সহ্য হয় না। একেক দিন তারই চোখের উপর নিরঞ্জনের অন্তরের অন্তরালটা কখন খসে' যায়।

নিচে, গারাজের পাশের ছোট কম্পাউণ্ডটিতে আদিত্য মালি আর শোফারের সাহায্যে নতুন সাইকেল চড়তে শিখছে। যতো পড়ে'-পড়ে' যাচ্ছে, ততোই সে হেসে উঠছে অনর্গল, আর বারে-বারে উপরের জানলার দিকে তাকাচ্ছে, যেখানে শ্রীপর্ণা দু'হাতে চুল খুলতে-খুলতে উপভোগ করছে তার ছেলের এই অমানবীয় কৃতিত্ব। মাঠ ভরে' শীতের সুন্দর রোদ।

হঠাৎ উপরে, পিছন থেকে, নিরঞ্জন এসে দাঁড়ালো সেই জানলায়। তারই সঙ্গে এই দৃশ্যটি উপভোগ করতে এসেছে ভেবে শ্রীপর্ণা তার দিকে তৃপ্ত নয়নে তাকালো।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—ওকে এ বাইক কে কিনে দিলে?

কথার সুরে শ্রীপর্ণা ঘাবড়ে গেলো। বল্‌লে,—কে আবার দেবে? আমি—আমিই দিয়েছি।

—এটুকু ছেলের আবার বাইক চড়বার সখ হ'লো কী করে'?

চাপা একটু গুমোট, হেসে শ্রীপর্ণা সেই ভার তরল করে' দিতে চাইলো। বল্‌লে,—ওর বহু ছেলেবেলায়, আমি যখন কলেজে পড়তুম, তখন ওকে একটা ট্রাইসিকেল কিনে দিয়েছিলুম। তার কথা ও এখনো ভোলে নি—সেই ট্রাইসিকেলের সম্পর্কেই আমাকে ওর প্রথম চেনা—তা যদিও ওর মনে নেই। শ্রীপর্ণা জানলা দিয়ে তাকালো: কয়েক দিন থেকেই বায়না ধরেছে ওকে এবার একটা দু'-পেয়ে গাড়ি কিনে দিতে হ'বে—আদিত্য ফের পড়ে' গেলো দেখে শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো: ও এখন বড়ো হ'য়ে উঠেছে যে।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—এতো মোটর চড়ে'ও তোমার ছেলের গাড়ি চড়ার সখ মিটছে না?

কথাটা শ্রীপর্ণাকে লাগলো। গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—মোটরে চড়লে মানুষের পায়ে হাঁটার অধিকারো চলে' যায় নাকি?

—তা যায় কিনা জানি না, নিরঞ্জন ঘরের মধ্যখানে চলে' এলো: কিন্তু বাইকটার কতো দাম পড়লো জিগ্‌গেস করি?

শ্রীপর্ণার মুখের সমস্ত রক্ত ম্লান হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,—

টাকা পঁচিশ-তিরিশ হয়তো হ'বে। যুগলবাবু এখনো আমাকে চেঞ্জটা ফিরিয়ে দেন নি।

—তিরিশ টাকা! নিরঞ্জন ফিরে যেতে-যেতে থামবার একবার দুর্ব্বল চেষ্টা করলো; বল্‌লে,—এমন একটা বাজে খেয়ালে তুমি এতোগুলি টাকা উড়িয়ে দিলে এককথায়?

শ্রীপর্ণার নাকের ডগাটা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো: তোমার মুখে এ-কথা নতুন শোনাচ্ছে বটে। তিরিশ টাকা তোমার এতোগুলি হ'লো? কোনটা তোমার বাজে খেয়াল নয় জিগ্‌গেস করি? সেই লাল, গালে, চিবুকে, কানে পড়লো ছড়িয়ে: সেই যে সেদিন আমার তুচ্ছ একটা সাড়ি ও গয়নার পিছে পাঁচ-পাঁচ. শো টাকা উড়িয়ে দিয়ে এলে, সেটা তোমার কোন খেয়াল? মুহূর্ত্তে সেই লাল আবার সাদা, কাগজের মতো সাদা হ'য়ে গেলো এক ফুঁয়ে: আদিত্যর জন্যে কিছু খরচ করলেই সেটা বাজে খরচ হ'লো? তোমার পার্স থেকে তিরিশটা টাকা এমনি খোয়া গেলে তুমি টের পাও কখনো? আজ ওকে একটা বাইক কিনে দিয়েছি বলে'ই তোমার লাগছে!

—নিশ্চয়। কথাগুলি বলতে ও শুনতে নিরঞ্জনের নিজেরই মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু একবার যখন সুরু করেছে, তখন তার শেষ পর্য্যন্ত না পৌঁছে আর উপায় নেই: নিশ্চয়। তিরিশ টাকা এমন কিছু কম নয়। এই তিরিশ টাকার জন্যে অনেক বেকার রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে, তিরিশ টাকা পেলে তারা সন্তুষ্টি বর্ত্তে' যেতো। নিরঞ্জন দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, এখানে আর সে দাঁড়াতে পারছে না, তারই নীচতার

মুখোমুখি হ'য়ে, তবু সে বললে,—নিশ্চয়। টাকা আমার তুমি এতো সস্তা পাও নি যে হাতের মুঠোয় পেয়ে তা নিয়ে এমনি ছিনিমিনি খেলবে।

শ্রীপর্ণা, ঠিক কী করছে বুঝতে না পেরে, আঁচলের থেকে চাবির রিঙটা খুলে নিয়ে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো : কে চায় তোমার টাকা ? কে আর ও-ময়লা তোমার ছোঁবে ?

যেন চাবির সেই তোড়াটা সবেগে নিরঞ্জনের মুখের উপর এসে পড়লো, এমনি সে দাঁড়ালো স্তম্ভিত হ'য়ে। কী যেন একটা কঠিন কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো, কিন্তু মুহূর্ত্তে মনে পড়ে' গেলো তার পদমর্য্যাদার কথা, তার ধনগৌরবের কথা—তেমন কিছু কেলেঙ্কারি সে করতে পারে না। চোটটা সে অতি কষ্টে সামলালো. যা হোক্, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—এতে এতো চটে' ওঠবার কি হয়েছে ? আমি এমন কি মন্দ কথাটা বললুম শুনি ? নিরঞ্জন আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগলো : এইটুকুন ছেলে সাইকেল চড়ে' রাস্তায় বেরুলে যে-কোনো সময়ে য়্যাকসিডেণ্ট হ'তে পারে। ভালোর জন্যই বলা! টাকা গেছে তো গেছে, নিরঞ্জন আর কোনো দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে : কতো দিক থেকেই তো যাচ্ছে জলের মতো।

কিন্তু, দু'দিন গেলো, শ্রীপর্ণাকে কিছুতেই চাবি ফিরিয়ে নিতে রাজি করানো গেলো না।

—তা কী করে' হয় ? এতো সব হিসেব-পত্তর কে রাখতে যাবে ? আমি তার মাথা-মুণ্ডু কী বুঝি বলো ?

—আমি রাখলে তো, শ্রীপর্ণা চোখ নিচু করলো : আরো বেশি

খরচ হ'য়ে যাবে। হিসেবের আর তল খুঁজে পাবে না। সামান্য তিরিশটে টাকার জন্যে সেদিন যা করলে—

—হয়েছে, হয়েছে, থামো। নিরঞ্জন সবলে কথাটা চাপা দিতে গেলো: দাও না, দাও না তোমার আদিত্যকে কী কিনে দেবে! যা তুমি চাও, যা কিনে দিলে তোমার শান্তি হয়, নিয়ে এসো না এক্ষুনি। নিরঞ্জন চাবির গোছাটা তার দিকে এগিয়ে দিলো: টাকার কী অভাব! টাকা রোজগার তো করছি এরি জন্যে!

পাকে-প্রকারে আদিত্যর একটা কথা উঠলেই নিরঞ্জন কেমন সব আবার ঘুলিয়ে ফেলে।

—তুমি তো খোঁটা দেবেই। শ্রীপর্ণা তার চারপাশে কঠোর একটা বিচ্ছিন্নতা আনলে: কিন্তু আদিত্য যদি তোমার ছেলে হ'তো, আর আমি যদি তার সামান্য একটা সাইকেলের জন্যে হিংসেয় এমনি ফেটে পড়তুম, তা হ'লে তোমার কাছ থেকে খুব বেশি শ্রদ্ধা আদায় করতে পারতুম না আশা করি। রাখো, চাবির গোছাশুদ্ধ নিরঞ্জনের হাতটা সে ঠেলে দিলো: তোমার ঐশ্বর্যে আর আমরা ভাগ বসাতে চাই না।

হঠাৎ চারদিকে অন্ধকার দেখে, কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার হাত দু'টো চেপে ধরলো, অবোধতরো শিশুর মতো অবচনীয় অসহায়তায়।

নিচে, সিঁড়ির কাছে, আদিত্যর গলা শোনা গেলো, কোথা থেকে একটা ছাগল ধরে' এনেছে। বিকট উল্লাসে মায়ের কাছে তাই সে করছে ঘোষণা।

হাতের থেকে শ্রীপর্ণা ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো। বারান্দার

রেলিঙ দিয়ে নিচে ঝুঁকে প'ড়ে' বল্‌লে,—কা'র না কা'র ছাগল, শিগ্‌গির ছেড়ে দাও বলছি।

আদিত্য তাতে বিশেষ রাজি নয়। অগত্যা নিচেই শ্রীপর্ণা নামতে যাচ্ছিলো।

নিরঞ্জন এসে আবার তাকে বাধা দিলো, বল্‌লে,—দেরাজের চাবি না নাও, অন্যান্য তোমার সব বাক্স-তোরঙ্গের চাবিও তো এতে মেলাই আছে দেখছি। এগুলি নিয়ে আমি কী করবো? এগুলি নিয়ে যাও।

—রাখো, নিচ্ছি। ছেলের চোখের উপর দাঁড়িয়ে শ্রীপর্ণা ঝগড়া করতে পারে না, পারে না নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি করতে। তাই সে বল্‌লে, স্বাভবিক সাধারণ গলায় বল্‌লে,—টেবিলের ওপর রেখে দাও, আমি খুলে নেবো'খন। বলে'ই তর্‌তরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গেলো নেমে।

তবু, কয়েক দিনে, নানারকম কোমল কৌশলে শ্রীপর্ণাকে সে নরম করে' এনেছিলো, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে' গেলো। সাধারণ অবস্থায় হ'লে নিরঞ্জন হয়তো এতে ততো গ্রাহ্য করতো না, কিন্তু বাড়িতে আদিত্যর বিদ্যমানতাটাই ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে' তুললো।

অসাময়িক একদিন দুপুরবেলা আপিস থেকে ফিরে উপরে উঠবার সময় নিরঞ্জন দেখতে পেলো রান্নাঘরের রোয়াকে শ্রীপর্ণা কোন-একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অত্যন্ত নিচু গলায় কথা কইছে। নিরঞ্জন যেন দেখেও দেখলো না, তবু চোখের ধারালো কোণ দিয়ে যেটুকু সে দেখলো তাতে তার ভুরু উঠলো কুঁচকে।

প্রথম এটা সে স্পষ্ট লক্ষ্য করলো যে, স্ত্রীলোকটি নিতান্তই নিম্নশ্রেণীয়, এবং তাকে দেখে দু'জনেই কেমন একটু বিশেষ ভাবে সচকিত হ'য়ে উঠলো। যেমন ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে বসে' আলাপ করছে, তাতে তাদের মধ্যে মর্য্যাদার এতোটুকুও তারতম্য দেখা গেলো না—নিরঞ্জনের মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে' উঠলো—শ্রীপর্ণা কী বলে' যে একটা ছোটজাতের মেয়েমানুষের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে ভাব-বিনিময় করতে পারছে, শত বিকটতম দুঃস্বপ্নের মাঝেও নিরঞ্জন তা কল্পনা করতে পারতো না। রাগের চেয়ে কুটিল একটা সন্দেহই যেন সে বেশি কালি হ'য়ে উঠলো।

নিরঞ্জন আদিত্যকে পাকড়াও করলে। বল্‌লে,—একটা জিনিস নিবি? আয় আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোকের এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে আদিত্য একেবারে গলে' গেলো। বাঁশের বাঁখারি দিয়ে সে একটা ধনুক তৈরি করছিলো। সব সাজ-সরঞ্জাম ফেলে রেখে সে ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকলে।

নিরঞ্জন একটা বাক্স খুলে কতোগুলি রঙিন পেন্সিল, কাগজ-পত্র বাঁধবার কতোগুলি লাল ফিতে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—নিবি এগুলো?

লজ্জায় ও লোভে আদিত্য হেসে ফেল্‌লো। বল্‌লে,—দিলে নেবো না কেন?

—দিচ্ছি, কিন্তু, নিরঞ্জনের এখানে গলা নেমে এলো: তোর মা কা'র সঙ্গে নিচে বসে' কথা কইছে জানিস?

এর জন্যে আদিত্যকে ঘুষ দেবার দরকার ছিলো না।

সোজাসুজি তাকে জিগ্গেস করলেই সে বলে' দিতো। বল্বার মতোই সে খবর।

—জানি না? আদিত্য খুসিতে চোখ বড়ো করে' বল্লে,—ও আমাদের সারদা-দিদি।

—কে সারদা?

—আমাদের আর একটা বাড়ি আছে না—সেই বালিগঞ্জে? তুমি তো দেখনি সেই বাড়ি, না, এটার মতো সুন্দর নয়, আদিত্য ঠোঁট কামড়ে খানিক ভাবলে: কিন্তু এটার চেয়ে অনেক বড়ো—সেই বাড়ির উঠোনেই তো আমরা ফুটবল খেলতে পারি। দাদু ভয়ানক বকে, বল একবার উপরে গিয়ে পড়লে কিছুতেই দেয় না, পাম্প খুলে ফেলে।

—হ্যাঁ, তোর সারদা-দিদি সেই বাড়ির কী হয়? নিরঞ্জন তাকে কথাটা ধরিয়ে দিলো।

—বা রে, কী আবার হ'বে! আদিত্য হো-হো করে' হেসে উঠলো: দিদি বলে' সত্যি-সত্যি ও আমাদের দিদি নাকি? ও তো আমাদের বাড়ির ঝি ছিলো। আমরা সবাই ওকে দিদি বলে' ডাকি।

—কিন্তু এ-বাড়ি এলো কী করে'?

—বা রে, আসবে না? মা যে ওকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। ও যে এখানে থাকবে এখন থেকে। আদিত্য গলা থেকে একটা বুড়োটে সুর বা'র করলে: মাইনে ওর খুব বেশি নয় তাই বলে'। আর ও থাকলে, জানো, বাড়িতে একটা কাকও কখনো ডাকতে পারে না।

নিরঞ্জন রাগে একেবারে অসহায় হ'য়ে গেলো। ঝি সত্যিই শ্রীপর্ণা রাখছে কিনা, এবং রাখলেও কী উদ্দেশ্যে রাখবে তা সে একটিবার চিন্তা করে'ও দেখলো না। সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু চিন্তা করবারো তার সময় নেই।

ফিতের বাণ্ডিল আর পেন্সিলগুলি আদিত্যর হাতে দিয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—নে, পালা।

মাকে দেখাতে আদিত্য এক দৌড়ে নিচে চলে' গেলো। কোনো কারণ নেই, ভদ্রলোক যে তাকে গায়ে পড়ে' এতোগুলি জিনিস দিয়ে দিলেন অনায়াসে, এই আনন্দ রাখবারই তার জায়গা নেই।

রাত্রে মশারি ফেলতে এসে শ্রীপর্ণা হঠাৎ আজ ইজিচেয়ারটায় বসলো। বল্‌লে,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আজকাল সেই কথাটা আগে বলে' নিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করতে হয়। নিরঞ্জন জানলার কাছের অন্ধকারটিতে বসে' একটা সিগ্‌রেট খাচ্ছিলো। বল্‌লে,—বলো।

—আমি একটি ঝি রাখবো ভাবছি।

কথাটা শ্রীপর্ণাকে সে শেষ করতে পর্য্যন্ত দিলো না। ধারালো দাঁতে একটা নেকড়ের মতো খেঁকিয়ে উঠলো : ঝি? ঝি এ-বাড়িতে কী হ'বে? ও-সব নুইসেন্স আমি সইতে পারবো না।

শ্রীপর্ণা একটুও গায়ে মাখলো না। ঠাণ্ডা গলায় বল্‌লে,—আদিত্যর জন্যে রাখবো, আদিত্যকে দেখা-শোনা করতে পারবে।

নিরঞ্জন দপ্‌ করে' জ্বলে' উঠলো—কথার গূঢ় অন্তরালে কোনো ইঙ্গিত ছিলো কিনা তা পর্য্যন্ত সে ভেবে দেখলো না,

সোজাসুজি তাকে জিগ্‌গেস করলেই সে বলে' দিতো। বল্‌বার মতোই সে খবর।

—জানি না? আদিত্য খুসিতে চোখ বড়ো করে' বল্‌লে,—ও আমাদের সারদা-দিদি।

—কে সারদা?

—আমাদের আর একটা বাড়ি আছে না—সেই বালিগঞ্জে? তুমি তো দেখনি সেই বাড়ি, না, এটার মতো সুন্দর নয়, আদিত্য ঠোঁট কামড়ে খানিক ভাবলে: কিন্তু এটার চেয়ে অনেক বড়ো—সেই বাড়ির উঠোনেই তো আমরা ফুটবল খেলতে পারি। দাদু ভয়ানক বকে, বল একবার উপরে গিয়ে পড়লে কিছুতেই দেয় না, পাম্প খুলে ফেলে।

—হ্যাঁ, তোর সারদা-দিদি সেই বাড়ির কী হয়? নিরঞ্জন তাকে কথাটা ধরিয়ে দিলো।

—বা রে, কী আবার হ'বে! আদিত্য হো-হো করে' হেসে উঠলো: দিদি বলে' সত্যি-সত্যি ও আমাদের দিদি নাকি? ও তো আমাদের বাড়ির ঝি ছিলো। আমরা সবাই ওকে দিদি বলে' ডাকি।

—কিন্তু এ-বাড়ি এলো কী করে'?

—বা রে, আসবে না? মা যে ওকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। ও যে এখানে থাকবে এখন থেকে। আদিত্য গলা থেকে একটা বুড়োটে সুর বা'র করলে: মাইনে ওর খুব বেশি নয় তাই বলে'। আর ও থাকলে, জানো, বাড়িতে একটা কাকও কখনো ডাকতে পারে না।

নিরঞ্জন রাগে একেবারে অসহায় হ'য়ে গেলো। ঝি সত্যিই শ্রীপর্ণা রাখছে কিনা, এবং রাখলেও কী উদ্দেশ্যে রাখবে তা সে একটিবার চিন্তা করে'ও দেখলো না। সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু চিন্তা করবারো তার সময় নেই।

ফিতের বাণ্ডিল আর পেন্সিলগুলি আদিত্যর হাতে দিয়ে নিরঞ্জন বল্লে,—নে, পালা।

মাকে দেখাতে আদিত্য এক দৌড়ে নিচে চলে' গেলো। কোনো কারণ নেই, ভদ্রলোক যে তাকে গায়ে পড়ে' এতোগুলি জিনিস দিয়ে দিলেন অনায়াসে, এই আনন্দ রাখবারই তার জায়গা নেই।

রাত্রে মশারি ফেলতে এসে শ্রীপর্ণা হঠাৎ আজ ইজিচেয়ারটায় বসলো। বল্লে,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আজকাল সেই কথাটা আগে বলে' নিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করতে হয়। নিরঞ্জন জানলার কাছের অন্ধকারটিতে বসে' একটা সিগ্‌রেট খাচ্ছিলো। বল্লে,—বলো।

—আমি একটি ঝি রাখবো ভাবছি।

কথাটা শ্রীপর্ণাকে সে শেষ করতে পর্য্যন্ত দিলো না। ধারালো দাঁতে একটা নেকড়ের মতো খেঁকিয়ে উঠলো : ঝি ? ঝি এ-বাড়িতে কী হ'বে ? ও-সব নুইসেন্স আমি সইতে পারবো না।

শ্রীপর্ণা একটুও গায়ে মাখলো না। ঠাণ্ডা গলায় বল্লে,—আদিত্যর জন্যে রাখবো, আদিত্যকে দেখা-শোনা করতে পারবে।

নিরঞ্জন দপ্ করে' জ্বলে' উঠলো—কথার গূঢ় অন্তরালে কোনো ইঙ্গিত ছিলো কিনা তা পর্য্যন্ত সে ভেবে দেখলো না,

বল্‌লে,—তোমার আদিত্যর জন্যে আমি আর ক'টা ঝি রেখে দেবো?

অসহ্য। শ্রীপর্ণা বোবা হ'য়ে গেলো।

সেই স্তব্ধতা নিরঞ্জন গায়ের উপর জন্তুর একটা নিশ্বাসের মতো অনুভব করলে। সিগ্রেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে নিরঞ্জন বল্‌লে,—যদি বলো তো একটা হোল-টাইম গার্ডিয়ান-টিউটার রেখে দিতে পারি—ভদ্রলোকে যা পারে। এ-বাড়িতে ঝি-গিরি চলবে না, এ তোমাকে আমি স্পষ্ট করে' বলে' দিচ্ছি।

শ্রীপর্ণা বললে,—কিন্তু এ ঝি-টি খুব ভালো। তার কাছে আদিত্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারবে। মা'র ছেলের মতো।

—সেই সুবাদে বুঝি দু'টি বোনে মিলে খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে' বসে' গল্প করছিলে?

—দুই বোন? শ্রীপর্ণা খাড়া হ'য়ে উঠে বসে' চেয়ারের প্রান্তে প্রায় সরে' এলো: তুমি এ সব কী বলছ পাগলের মতো?

—পাগলের মতো! নিরঞ্জন বিকৃত মুখে বললে,—যে এসেছিলো সে তোমার দিদি না, তোমার সারদা-দিদি না?

—তুমি কী করে' জানলে?

—কোনো-কিছুই আমার জানতে বাকি থাকে না। চেয়ারের হাতলটা নিরঞ্জন শক্ত করে' মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো: বলো, সত্যি কিনা? তুমি তোমার আগের শ্বশুর-বাড়ির পুরোনো সারদা-ঝিকে এখানে এসে থাকবার জন্যে চিঠি দিয়েছ কিনা?

—দিয়েছিই তো। তাতে কী হয়েছে? এর মাঝেও শ্রীপর্ণা

হাসবার চেষ্টা করলো : আদিত্যকে সারদা-দিদিই একরকম কোলে পিঠে করে’ মানুষ করেছে। সারদা-দিদিকে পেলে ও আর কিছু চায় না।

—তুমিও আর কিছু চাও না। তাই সমস্ত রাজ্যে তোমার পুরোনো শ্বশুর-বাড়ির ঐ এক সারদা-ঝিকেই চিনেছিলে।

—তাতে কী দোষ হয়েছে ?

—না, কী আবার দোষ হ’বে! নিরঞ্জনের চোয়াল দুটো দৃঢ় হ’য়ে উঠলো : তারপর কোন দিন দেখবো একটা চাকর ধরে’ এনেছ, বলবে, এ আদিত্যকে চান করিয়ে দিতো, কোন দিন বা আর-কাউকে, বললেই হ’লো, এ আদিত্যর মাথায় ছাতা ধরতো, এ দিতো তার জুতোর ফিতে বেঁধে। নিরঞ্জন হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—তোমার ঐ একটা ছেলের জন্যে আমি তো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখানে পুষতে বসি নি।

—বেশ তো, শ্রীপর্ণাও আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো বিশীর্ণ বিবর্ণতায়, বল্‌লে,—বেশ তো, সারদা-দিদিকে না রাখলেই হ’বে। এর জন্যে এতো কী কথা! সারদা-দিদি না থাকলেই ওর যত্ন কিছু কম হ’বে, এমন তো কোনো কথা নয়।

শ্রীপর্ণা আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। নিরঞ্জন রইলো চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে।

আশ্চর্য্য, মশারিটা পর্য্যন্ত ফেলে দিয়ে গেলো না। আলোটা নির্লজ্জের মতো জ্বলছে।

তেরো

নিরঞ্জন এতোদিনে এটা স্পষ্ট, নিঃসন্দেহ বুঝেছে যে নারীর জীবনে প্রেমই মহত্তম নয়, মহত্তম হচ্ছে সন্তান। সন্তানের জন্মে তাদের প্রেমের অবসান, দিনের আবির্ভাবে যেমন রাত্রির মৃত্যু। সন্তানেই তারা কৃতকার্য্য, তারা চরিতার্থ, এর পরে আর কিছু নেই। এর আগে প্রেম হচ্ছে শুধু শেষ-রাত্রের অন্ধকারের আলোড়ন, সূর্য্যের প্রতীক্ষায় : তারপরে তাদের দিন, নিশ্চিন্ত, নিরাপদ দিন, অনির্ব্বাপিত প্রাত্যহিকতা। এর পরে প্রেম শুধু একটা সুবিধে, সহজ একটা অভ্যাস, যদি উপমা বদ্‌লানো যায়, ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না : পূর্ণিমার চাঁদ পড়েছে ঢলে'। প্রেম হচ্ছে তাদের জীবন্ময় এই সার্থকতারই প্রেরণায় স্পন্দিত, যদি প্রেম তাকে বলো ; এবং প্রেমের জন্যে তারা আর তপস্যা করতে রাজি নয়, প্রেম না হ'লেও তাদের চলে, যদি তারা পেয়ে গিয়ে থাকে তাদের সন্তান, যদি তারা পেয়ে গিয়ে থাকে নিজেকে, নিজের বিশ্বকে। কথাটা ভেবে নিরঞ্জনো একটু চম্‌কালো না : এ পাপের মতোই আদিম, শিশুর সরলতার মতোই পুরোনো। চম্‌কালো না, কিন্তু চোখের

সমুখে সমস্ত দিন-রাত্রি যেন শুকনো ও শূন্য হ'য়ে গেলো। সে—সে কী নিয়ে থাকবে, কোথায় তার শেষ সম্পূর্ণতা, আর সমগ্র সমাপ্তি?

সব কিছু জেনে-শুনেই শ্রীপর্ণাকে সে বিয়ে করেছিলো, তার প্রেমের সামনে দাঁড়াতে দেয়নি সে কোনো বাধা, কোনো অন্ধতা। সেদিন তাদের জগতে, তাদের সম্মিলিত মহান একটি অস্তিত্বের অতীতে আর কোনো সত্য ছিলো না; তারা দুই দেহে ছিলো এক দেবতা, দুই আত্মায় ছিলো এক অখণ্ডমণ্ডল। কিন্তু এইখানে, তার বেলায়ো, প্রেমই হ'লো না শ্রীপর্ণার আদ্যন্ত সর্ব্বস্ব: প্রেম একটা আপাতরম্য উপক্রমণিকা মাত্র, চাই একটা বিরাট পরিণাম, সসমারোহ উপসংহার। সম্ভব একটা সময় পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করলো না, ডাক পড়লো আদিত্যর, তার সেই প্রাতস্তন সূর্য্যের শোণিমা—তার স্ফুরিত কামনার প্রথম কবিতা! অপেক্ষা সে করতে পারে, কিন্তু আদিত্যকে সে বর্জ্জন করতে পারে না: আদিত্যই তার প্রথম, আদিত্যই তার পরম। না, নিরঞ্জন গোড়ায় কিছু আপত্তি করে নি, কখনোই সে পারতো না আপত্তি করতে, এতো বিশাল-পরিপূর্ণ, এতো দুর্দ্ধর্ষ-দুঃসহ ছিলো তার প্রেম—তার সঞ্চয়ের সামনে সংসারে কোনো ক্ষতির অঙ্কই সে অনুপাতে বড়ো করে' দেখতে শেখে নি। কিন্তু ভাগ্য হঠাৎ কোথায় পরিহাস করলে, সব ভোজবাজির মতো ওলোট-পালোট হ'য়ে গেলো। ছোট একটা শিশু, তার বিশাল অজ্ঞানে নিষ্পাপ, তার অসহায় সরলতায় অঘাতনীয় সেই শিশু, কোথা থেকে এসে তার এই আকাশ-পরিব্যাপী প্রেমকে দাঁড়ালো আড়াল করে',

তার নিশ্বাসে মুহূর্ত্তে সে দাবদগ্ধ অরণ্যের মতো শুকিয়ে গেলো। তার এই অপরিমাণ প্রেম, মধ্যরাত্রে ঘুম-ভাঙা শিশুর কান্নার মতো তার আত্মার এই কাকুতি, সব একটা ছোট, তুচ্ছ শিশুর স্নেহের কাছে গেলো হেরে, সে হ'য়ে দাঁড়ালো চিরস্থায়ী একটা মিথ্যে, তার মাত্র জীবনধারণের প্রয়োজনে। শ্রীপর্ণা পাখা গুটিয়ে মাটিতে নেমে এলো, পরিণতির তৃপ্তিতে, প্রাপ্তির সেই অন্ধকারে বন্ধ করে' দিলো তার জানলা, যে-জানলা দিয়ে দেখা যেতো আকাশের কোটি-কোটি ক্ষতমুখ, অগণন তারা। হায়, সীতা রইলো তপোবনে, রামেরই হ'লো নির্ব্বাসন। নিরঞ্জন হ'য়ে দাঁড়ালো তারাহীন একটা আগ্নেয় শূন্যতা।

শ্রীপর্ণার এই মনোবিবর্ত্তনটা নিরঞ্জন যেন অনায়াসে পড়ে' ফেলতে পারে। যতোদিন সে কলেজে পড়তো, অপরিচিত একটা অবস্থার পরিবেশে, নতুন তার ভাবের দীপনায়, ততোদিন তার আদিত্যকে দরকার হয় নি: তার হাতে ছিলো বই, বইয়ের ভিতর দিয়ে অনাবিষ্কৃত পৃথিবী। যখন ছুটি পড়তো ক্যালেণ্ডারে, মনটা তার ফাঁকা ঠেকতে সুরু করতো, তার অভ্যাসের একঘেয়েমিতে নিয়ে আসতো সে একটি উৎসবের সুর, ছুটতো কলকাতায়, আদিত্যকে একবার দেখে আসতে। তেমনি তার প্রেমের প্রাথমিকতায়ো আদিত্যকে তার দরকার পড়ে নি, সে ছিলো তখন মৃত্যুর ঝঙ্কারে, অতীন্দ্রিয়তার ইন্দ্রজালে। আজ হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করলে তার ছুটি। আদিত্যকে সে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে ডেকে নিলো—তার অভ্যাসের পৃথিবীর পরে উৎসবের আকাশ। আদিত্যকে নিয়ে আসা, কাছে এনে রাখা,

এখন তার পক্ষে অনেক সোজা—তার আছে এখন সামাজিক শক্তি, অর্থের প্রভুত্ব, পদমর্য্যাদার অহঙ্কার—সব মিলিয়ে এখন সে স্বাধীন, দুর্দ্ধর্ষ; আদিত্যকে তার কাছ থেকে আর কে কেড়ে রাখতে পারবে? নিরঞ্জন অস্থির হ'য়ে উঠলো: শ্রীপর্ণাকে সে সব দিয়েছে, যা সে চায়, সামাজিক শক্তি, অর্থের প্রভুত্ব, পদমর্য্যাদার অহঙ্কার, কেবল নিজেকেই দিতে পারলো না। শুধু সেই পেলো না স্থান, সেই পেলো না কোনো মূল্য।

সেদিন রাত্রে, তেমনি ঘড়ির কাঁটায় শ্রীপর্ণা চললো নিরঞ্জনের ঘরে মশারি ফেলে দিতে বা জল গড়িয়ে দিতে বা তেমনি দুয়েকটা কাজ করে' দিতে খুচরো, যেমন সে রোজ আসে। রাত অনেক হ'লেও নিরঞ্জন এখনো নিয়মমতো শোয় নি, ঘরে পাইচারি করে' বেড়াচ্ছে। দরজার কাছে এসে সে থম্‌কে দাঁড়ালো।

নিরঞ্জন দাঁড়ালো গিয়ে জানলায়। শ্রীপর্ণা ঘরে ঢুকলো।

নিরঞ্জন গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—চেয়ারটাতে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শ্রীপর্ণা চুপ করে' ইজিচেয়ারে এসে বসলো, বা, বলা যেতে পারে নিরঞ্জনের কথাটা তাকে ধাক্কা মেরে চেয়ারে বসিয়ে দিলে। নিরঞ্জনকে কেন-না-জানি অল্প-অল্প ভয় করতে লাগলো, সহজ অলস আরামে চেয়ারে নিজেকে সে মেলে দিতে পারলো না, ভঙ্গিটা উচ্চকিত, অসহিষ্ণু করে' রইলো।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে লাগলো পাইচারি করতে। কোনো কাজ নয়, একটা সিগ্রেট পর্য্যন্ত সে এখন খাচ্ছে না। তাতে নিঃশব্দতাটা যেন আরো ভারি, আরো ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীপর্ণা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : বলো, কী কথা!

নিরঞ্জন তার দিকে মুখ করে' ঘুরে দাঁড়ালো। বসলো একটা চেয়ার টেনে, দূরে, মুখোমুখি : এবার ধরালো একটা সিগ্‌রেট। তার চোখের মতো জ্বলতে লাগলো সিগ্‌রেটের মুখ।

দেখলো সেই শ্রীপর্ণা আর নেই। যেন কতো দীর্ঘ দিনের রোগশয্যা থেকে সে উঠে এসেছে। রোগে মুখ চিরকালের জন্যে বিকৃত হ'য়ে গেলে পরমা সুন্দরীও যেমন সময়ের একটি বিন্দুতে 'এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যায়, পুড়িয়ে ফেলে দেয় তার সাজ-সজ্জা, ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার আভরণের বোঝা, আর যেমন দাঁড়াতে হয় না তাকে আয়নার সামনে রূপের অহঙ্কারের স্ফীতিতে, আর করতে হয় না তাকে ভয়, কারুর কামনা বা কারুর বিশ্বাসঘাতকতা, আর করতে হয় না তাকে ঈর্ষা, কারুর সৌন্দর্য্য বা সম্পদ, যেমন সে চলে' আসে একটি অনাবৃত অনায়াস উদ্‌ঘাটনে, তেমনি শ্রীপর্ণাও যেন তার জীবন-ভঙ্গির সমস্ত শৈথিল্য নিয়ে চলে' এসেছে একটি শীতল নিশ্চিন্ততায়। আর কিছু তার চাইবার নেই, ভয় করবার নেই, সংগ্রাম করবার নেই—সে এসে পড়েছে অবসানের চমৎকার মুক্তিতে। দেখতে-দেখতে সে কেমন বুড়োটে হ'য়ে এসেছে, তার গলাটা দেখাচ্ছে সরু, কাঁধ দু'টো ঢিলে, চোয়াল দু'টো ভাঙা—কী হ'বে তার বয়েস দিয়ে, আর কী হ'বে তার দেহটাকে বয়েসের কম করে' দেখিয়ে? আয়নার সামনে গিয়েও আর সে দাঁড়ায় না, একবার দেখেও না ভুল করে', তার চুলে সেই ঢেউ

নেই, সেই উজ্জ্বল অন্ধকার নেই, সেই সাপের মসৃণতা নেই, কেমন একরাশ আবর্জ্জনার মতো হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো, —কী হ'বে আর তার রূপচর্চ্চা করে', যা সে সত্যিকারের, মেকি প্রসাধনে তাই সযত্নে ঢেকে রেখে? আর তার কিছু লজ্জা নেই, এতোটুকু কুণ্ঠা: সে মা, তাইতেই সে খুসি, তাইতেই সে ভরপুর। পরনে সাধারণ, উদাসীন একটি সাড়ি, তাতে না আছে দীপ্তি, না আছে পারিপাট্য, পরিধানের ভঙ্গিতেও নেই সেই বিসর্পিত অবকাশ; আর কী-ই বা হ'বে তার সাড়ির শ্রী দিয়ে? সে যে মা, তা এতেই রয়েছে প্রকাশিত। তার জন্যে কোনো আয়োজনের দরকার করে না, দরকার করে না কোনো উপকরণের বিজ্ঞাপন। শ্রীপর্ণার কোনো-কিছুতে আর উৎসাহ নেই, সে সাজলো কি না-সাজলো, পার্টিতে-নেমন্তন্নে গেলো কি না-গেলো, নিরঞ্জনের সঙ্গে আর বেড়ালো কি না-বেড়ালো: কোনো-কিছুতে নেই কৌতূহল, সে সুন্দর কি কুৎসিত, সে যুবতী না প্রৌঢ়া, সে শরীরকে বহন করছে, না শরীর তাকে বহন করে' চলেছে। সে নিশ্চিন্ত, প্রায় নিরুপায়ের মতো নিশ্চিন্ত, মরবো ঠিক জেনে যেমন অন্তিমতম মুহূর্ত্তে মানুষের মনে স্নিগ্ধ নিশ্চিন্ততা আসে। সে যেন নিজের কোনো প্রমাণ চায় না, সে চায় নিজের পরিচয়। সে যখন এই পরিচয়ই পেয়ে গেছে, তখন জগৎ-সংসারে আর কী তার খোঁজবার রইলো? শ্রীপর্ণা চেয়ারের মধ্যে একটুখানি খস্‌খস্‌ করে' উঠে ফের স্থির হ'য়ে গেলো। তার শরীরের সেই অবসন্ন শীর্ণতা যেন মনে হ'লো নিরঞ্জনেরই নিরুচ্চার একটা হাহাকার।

শ্রীপর্ণা আবার উঠলো খস্‌খসিয়ে। বল্‌লে,—চুপ করে' রইলে কেন? কী কথা আছে, বলো।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—চুপ করে' থাকাটা বুঝি কথা হ'তে পারে না?

—না, সত্যি বলে' ফেল, শ্রীপর্ণা তার ছুই পায়ের পাতায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: আমার সময় নেই।

—সময় নেই মানে? নিরঞ্জন ক্রুদ্ধ গলায় বল্‌লে,—প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের সময় আছে। চুপ করে' বসে' থাকো। সময় যতো সরে' যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে আবার ততো সময়, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। উঠো না বলছি।

—বেশ, তবে বলো। শ্রীপর্ণা অল্প একটু হেসে হাতের উপর চিবুক রেখে বসে' রইলো।

বলবার কথা নয়, শোনবার কথা।

শ্রীপর্ণা আর বসে' থাকতে পারছে না। কোনো আভাস না দিয়ে আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় সে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—মুখ বুজে বোবার মতো এমনি বসে থাকতে পারি না।

নিরঞ্জন অমনি চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে বল্‌লে,—যেতে পাবে না।

—সে কী? শ্রীপর্ণা হটে' গেলো ছু'পা: আদিত্যর আজ বিকেল থেকে জ্বর—

—হোক্ জ্বর। তুমি যেতে পাবে না ও-ঘরে।

—যেতে পাবো না মানে?

—আমি বলছি তুমি যাবে না। নিরঞ্জনের কণ্ঠ হঠাৎ

কেমন অবসন্ন হ'য়ে এলো : তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আবার কী কথা! শ্রীপর্ণা নির্ভয়ে এবার এগিয়ে এলো সেই দু'পা, গম্ভীর মুখে বল্‌লে,—পথ দাও বলছি। আমি যাবো ও-ঘরে। আদিত্য হয়তো আমাকে খুঁজছে।

নিরঞ্জন আলগোছে সরে' দাঁড়ালো; বল্‌লে,—সংসারে আদিত্যই তোমার সব, আমি তোমার কেউ নই?

শ্রীপর্ণা দরজার কাছে এসে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো, তখুনিই চলে' যেতে পারলো না।

হ্যাঁ, নিরঞ্জন আজ বলবে, এতোক্ষণে বলবে। শুধু দেবতারা শুনতে পাবেন, শুধু ঘরের এই দেয়ালগুলো শুনতে পারে। বাইরের পৃথিবী, বৃহৎ সেই লোকারণ্য, এই দৃশ্যের বিন্দুতম আভাসও জানবে না। জানবে না, নিরঞ্জন গুপ্ত, এতো যার অর্থ ও সামর্থ্য, প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, এতো যার সুখ ও সুযোগ, —সে কিনা সব-কিছু ফেলে দিয়ে সামান্য প্রেমের জন্যে, সামান্যতরো স্ত্রীর প্রেমের জন্যে কাতরতা করছে। হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেউ তারা জানবে না, তাই লজ্জা কী, নিরঞ্জনো সত্য হ'য়ে উঠবে, শ্রীপর্ণার মতো লজ্জা দেবে ছুঁড়ে ফেলে— সেও হ'বে তার মতো নিশ্চিন্ত, তার উপলব্ধির তীব্রতায়।

নিরঞ্জন আবার বল্‌লে,—আমার প্রতি তোমার কোনো ভালোবাসা, কোনো কর্তব্য নেই?

শুধু দেবতারাই শুনতে পেলেন, শুধু দেয়ালগুলিই শুনলো।

শ্রীপর্ণা চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—কী করবো, আদিত্যর হঠাৎ

আজ জ্বর এসে গেছে। কী রকম বেহুঁস হ'য়ে পড়ে' আছে বিছানায়।

নিরঞ্জন আস্তে-আস্তে তার চেয়ারে গিয়ে বসলো। কোনো কথা বল্‌লো না।

শ্রীপর্ণা চৌকাঠটার কাছে এসে থামলো। বিদ্রূপ করে' বল্‌লে,—তোমার প্রতি কর্ত্তব্যের কোথায় ত্রুটি দেখলে শুনি? কোথায় তোমার ওপর আমার ভালোবাসার অভাব ধরা পড়লো?

—যাও, যাও, চলে' যাও এখান থেকে।

আর, শ্রীপর্ণা ঘর ছেড়ে চলে' যেতেই নিরঞ্জন দরজাটা ছ'হাতে বন্ধ করে' দিলে।

আর-আর দিন তবু-বা খোলা থাকতো উৎকণ্ঠিত একটি প্রতীক্ষার মতো; আজ সম্পূর্ণ বন্ধ, নিরুত্তর প্রত্যাখ্যান।

মধ্যরাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখন অনেক দূর উঠে এসেছে, দরজায় হঠাৎ কা'র করাঘাত হ'লো। প্রথমে মৃদু, পরে দ্রুত, ব্যস্ত, ঘন-ঘন।

নিরঞ্জন ঘুমিয়ে ছিলো তার শূন্য বিছানায়, বাশীভূত শ্রান্তিতে। হঠাৎ সেই আঘাত যেন লাগলো এসে তার হৃৎপিণ্ডে। উঠলো ধড়মড় করে'। চেয়ে দেখলো তারই ঘুমের মতো আকাশে নেমেছে জ্যোৎস্না, সমস্ত-কিছু যেন তার ঘুমে রয়েছে ভিজে। রাত্রির অপার রহস্যে নিরঞ্জন মুগ্ধ হ'য়ে গেলো—নিঃশব্দতার এই কল্লোল। এ রাত্রি যেন পৃথিবীর নয়, অন্য একটা কোনো অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রের।

আবার শব্দ হ'লো। দরজাটা তাকে খুলিয়ে তবে ছাড়বে।

হ্যাঁ, যা সে ভেবেছিলো, যা না হ'য়েই যায় না। শ্রীপর্ণা—শ্রীপর্ণা দাঁড়িয়ে, তার এতোকালের ঘুম দিয়ে তৈরি।

নিরঞ্জন আলো জ্বাললো না, যেন সে স্বপ্ন দেখছে।

শ্রীপর্ণা ব্যস্ত হ'য়ে শুকনো মুখে বল্‌লে,—আদিত্যর জ্বরটা ভীষণ বেড়ে গেছে, প্রায় একশো চার।

নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

—ভারি ছট্‌ফট্ করছে, কোঁকাচ্ছে, থেকে-থেকে কেবল তেষ্টা—

নিরঞ্জন বল্‌লে,—জ্বর—তা আমি কী করবো?

—কোনো ডাক্তার নিয়ে আসা যায় না?

নিরঞ্জন তার বিছানায় ফিরে গেলো: ডাক্তার! এতো রাতে ডাক্তার! হাত দিয়ে মাছির মতো কথাটা সে উড়িয়ে দিলে।

—কেন হ'বে না? টাকা দিলেই হ'বে। শ্রীপর্ণা সাহসে বুক বাঁধলো: আমাদের তবে টাকা আছে কী করতে? যুগলবাবুকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, তোমার নাম শুনলেই চলে' আসবেন।

—যাও, যাও, আর আদেখ্‌লেপনা করতে হ'বে না। নিরঞ্জন দেয়ালের দিকে পাশ ফিরলো: পৃথিবীতে কেবল একা তোমারই ছেলে আছে! আর-কারুর ছেলের কোনোদিন অসুখ করে না! রাত-দুপুরে অমনি তাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে ডাক্তার ডাকতে হয়? কল্‌কাতা সহরে কেবল তোমারই একমাত্র টাকা আছে! নিরঞ্জন নাকের মধ্য দিয়ে হেসে উঠলো।

শ্রীপর্ণা স্পষ্ট কণ্ঠে বল্‌লে,—কিন্তু অসুখ কঠিন হ'লে ডাক্তারই বা ডাকতে হ'বে না কেন?

—তোমার অসুখ কঠিন হ'তে পারে, আমার টাকাটাও এমন কিছু তরল পদার্থ নয়। নিরঞ্জন পা ছড়িয়ে আরাম করে' শুলো। চোখ বুজে আপন মনে বল্‌লে,—তুচ্ছ একটা কথার জন্যে আমার এমন সুন্দর ঘুমটা দিলে ভেঙে।

প্রেতায়িত একটা ছায়ার মতো শ্রীপর্ণা রইলো দাঁড়িয়ে।

নিরঞ্জন ঝাঁজিয়ে উঠলো: কী আর এখানে দাঁড়িয়ে আছো বোকার মতো? ছেলে তোমার ছট্‌ফট্‌ করছে, যাও, দেখ গে, এখনো বেঁচে আছে কিনা, না, ডাক্তারের অভাবে এক রাত্রেই টেঁসে গেছে একদম।

চোদ্দ

শ্রীপর্ণা তার ঘরে ফিরে এসে আদিত্যর মাথায় পাখা করতে বসলো, একটা পেয়ালায় করে' জল নিয়ে পাতলা দু'ফালি ন্যাকড়া ভিজিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দিতে লাগলো জল-পটি।

বিবর্ণ জ্যোৎস্না উঠেছে অস্পষ্ট স্মৃতির মতো, সেই জ্যোৎস্না এসে পড়েছে আদিত্যর বিছানায়, শ্রীপর্ণার পিঠের পাশটিতে। জানলার ভিতর দিয়ে বাড়িয়ে-দেয়া ঠাণ্ডা, সাদা, অসহায় হাত। সেই জ্যোৎস্নার ছোঁয়া লেগে শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর মধুর ম্রিয়মাণতায় অবশ হ'য়ে এলো, তবু, আজ কিছুতেই জানলাটা সে বন্ধ করতে পারলো না।

আদিত্যর এখানে আসার পর দিন থেকে, যেদিন থেকে সে তার বাহুর ঘনতায় এসে শুয়েছে, সেই দিন থেকে, শ্রীপর্ণার অচেতন মনের গূঢ় অন্ধকার থেকে নানা স্মৃতি অঙ্কুরের মতো প্রত্যহের পৃথিবীতে ফুটে উঠতে চাইছিলো। দেয় নি সে ফুটতে, শ্রীপর্ণা প্রাণপণে রক্ষা করেছে আপনাকে, সেই মনের দুর্লক্ষ্য গুহামুখে চাপা দিয়েছে সে তার প্রাত্যহিক পৃথিবীর

ভার। স্মৃতি হচ্ছে ধুলো, রাশি-রাশি জীর্ণ পাতার আবর্জ্জনা, প্রতি দিবসের বেগবান সম্মুখগতিতে পিছনের সেই ধুলো দিতে হ'বে উড়িয়ে, বাঁচতে যদি সে চায়, সব সময়েই সামনে তার নীল নির্ম্মুক্তি। শ্রীপর্ণা এমনি এতোদিন বাঁচতেই চেয়েছিলো উদ্দাম মুহূর্ত্ত-বিকীরণে, উন্মুখ সম্মুখীনতায়। উড়িয়ে দিয়েছিলো সে সমস্ত ধুলো, ঝরিয়ে দিয়েছিলো সমস্ত লালচে, হলদে পাতা—তার নতুন বসন্ত-বিদারণে। কিন্তু যক্ষ্মার বীজাণু যেমন একদিন অপরিপুষ্ট শরীরের জীর্ণতায় এসে গোপনে দেখা দেয়, তেমনি তার মনের এই দুর্ব্বল, অসহায় বিবণ্ণতায় সেই স্মৃতি আজ হঠাৎ বারে-বারে দংশন করতে লাগলো।

তার আজ মনে পড়লো ক্ষীরোদকে—সত্যি-সত্যি মনে পড়লো, শত অন্য কথা ভেবে, শত অন্য কাজ করে', কিছুতেই সে-স্মৃতি মন থেকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলে না; সে স্মৃতি তাকে বাতাসের মতো ঘিরে ধরেছে, রক্তের মতো ঘিরে ধরেছে, মৃত্যুর উপস্থিতির মতো ঘিরে ধরেছে—তাকে তাড়িয়ে দেয় আর শ্রীপর্ণার সাধ্য কী। তাকে আজ তার স্পষ্ট মনে পড়লো, বহুবিস্তীর্ণ জনতার থেকে আহরণ করে' আনা একটি মুখ: গর্জ্জমান সময়ের সমুদ্র থেকে ছিনিয়ে আনা একটি অবিনশ্বর মুহূর্ত্ত: তাকে মনে পড়লো আজ এই হলুদ জ্যোৎস্নায়, বিছানার উপর এই তার ম্লায়মান রেখায়, আকাশের এই গভীর নিঃশব্দ পরিব্যাপ্তিতে। তাকে মনে পড়লো: শ্রীপর্ণা কী করতে পারে যদি তার আজ হঠাৎ মনে পড়ে' গিয়ে থাকে? মানুষ কী করতে পারে, যখন তার থেমে পড়তে

হয়, যখন সামনে তার পথ গিয়েছে ফুরিয়ে? তাড়িয়েই বা সে দেবে কেন, যদি তার রূঢ় রৌদ্রে এই স্মৃতিটি বিষণ্ণ একটি ছায়া মেলে ধরে? তাড়িয়ে দেয় শ্রীপর্ণার সাধ্য কী?

ক্ষীরোদকে আজ তার মনে পড়ে' গেলো, হ্যাঁ, ক্ষীরোদকে, —নামটা সে মনে-মনে কয়েকবার উচ্চারণ পর্য্যন্ত করলে। তাকে মনে পড়ে' গেলো ক্ষণিক একটা মর্ম্মরিত বনহিল্লোলের মতো নয়, চকিতোদ্ভাসিত কল্পনার বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো নয়, মনে পড়লো স্থির, স্থায়ী, অবিনশ্বর একটি সত্যের মতো। বাতাস আমাদের বেষ্টনের করে' আছে, তেমন একটা সত্য: আকাশ আছে পৃথিবীর ভূমিকায়, তেমনি। মনে পড়লো, যেমন মাঝরাতে শূন্য বিছানায় ঘুম-ভাঙা শিশুর মাকে মনে পড়ে। মনে পড়লো আদিত্যর এই শুকনো, শীর্ণ মুখে। মনে পড়লো তার এই জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চুপ করে' জেগে বসে'-থাকার আলস্যে। তুমি কিছু বলতে পারো না, কারণ-অকারণ নেই মানুষের এমনি আবার একদিন মনে পড়ে' যায়—শ্রীপর্ণারো আজ মনে পড়ে' গেলো।

সে যেন স্পষ্ট দেখলে, আশ্চর্য্য, সে স্বপ্ন দেখছে না, কে-একটি লোক যেন জ্যোৎস্নার দীর্ঘ রেখায় ঘরের মধ্যে সন্তর্পণে ঢুকে পড়েছে। যেন আস্তে-আস্তে রোগের পাণ্ডুর বিশীর্ণতায় ভেঙে-ভেঙে সে শুয়ে পড়লো বিছানায়, দীর্ঘ বিশ্রান্তিতে। সেই নাক, সেই ভুরু, চোখের পাতায় তেমনি দু'টি চোখ বুজে থাকা। এ যেন আর আদিত্য নয়, আর কেউ, তার স্মৃতির

একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস। শ্রীপর্ণা ভয় পেয়ে বালিশের উপর ঝুঁকে পড়লো। ডাকলো: আদি।

আদিত্য জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'টো একটু চেটে কাতর গলায় বল্‌লে,—মা, জল!

চামচেয় করে' ঠাণ্ডা একটু জল শ্রীপর্ণা তার ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিলে।

যে মরে' গেছে মনে করে' আছো, সে মরে না, কক্‌খনো মরে না; সে চেয়ে থাকে, সে ডাকে, সে কথা কয়।

শ্রীপর্ণার একটি রাতের কথা মনে পড়ে' গেলো, সে-রাতের প্রতিটি তারা তার মুখস্ত। মনে পড়ে' গেলো, ক্ষীরোদের সেই অসুখের সময়, এমনি এক রাতে, ক্ষীরোদ অস্ফুট কান্নার সুরে অন্ধকারে কখন বলে' উঠেছিলো: মা, জল! বিভাবতী দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে' পাখা হাতে করে' ঝিমুচ্ছিলেন, শ্রীপর্ণা শিয়রের কাছে দুই চোখ ব্যথায় উন্নিদ্র করে' বসে' আইস-ব্যাগ দিচ্ছিলো। জল চাইতে শ্রীপর্ণা এমনি চামচেয় করে' জল ঢেলে দিয়েছিলো তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে, বালিশ-ঢাকা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়েছিলো তার মুখ। ক্ষীরোদ এই মুহূর্তে একটু জেগে আছে মনে করে' শ্রীপর্ণা আইস-ব্যাগটা সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে তার উত্তপ্ত ডান হাতখানি তার ভিজা কপালের উপর নামিয়ে এনেছিলো। কোমল একটি প্রার্থনার মতো সে হাত। তেমনি এখনো ডান হাতখানি শ্রীপর্ণা আদিত্যর কপালের উপর রাখলো। মনে পড়ে, পাছে বিভাবতী জেগে ওঠেন, সেই ভয়ে তার আঙুলগুলিতে ছিলো কী সঙ্কোচ, আঙুল থেকে বাহুমূল পর্য্যন্ত

তার হাতটা ছিলো বীনার তারের মতো টানা। ক্ষীরোদ বুঝতে পেরেছিলো কা'র এই ভাষা, আস্তে-আস্তে সেই হাতখানি সে টেনে নিয়েছিলো তার বুকের মধ্যে, সান্ত্বনার মতো, বিশ্বাসের মতো। তাড়াতাড়ি আদিত্যর গলার কাছে শ্রীপর্ণা তার হাত রাখলো, উঃ, হাতটা তার পুড়ে যাচ্ছে, জ্বরটা কী জোরেই যে এলো! শ্রীপর্ণার ভয় করতে লাগলো, ভয়ে তার মনে হ'তো লাগলো নিজেকে নিতান্ত একা, নিতান্ত অসহায় বলে'। তেমনি সে-সব রাতগুলিতেও তার ভয়ানক ভয় করতো, কিন্তু সে-ভয়ে তার এমন একা, এমন শূন্য লাগতো না : সে-ভয়ের অন্ধকার থেকে ফুটতো প্রার্থনার ফুল—তার গন্ধ যেন এই রাতেও লেগে আছে। শ্রীপর্ণা চেয়ে দেখলো, চাঁদ কখন হেলে গেছে পশ্চিমে, সেই জ্যোৎস্নার রেখাটি গেছে মিলিয়ে। সমস্ত ঘর খালি।

নিরঞ্জন অবিশ্যি তার কর্ত্তব্যের কোনো ত্রুটি করলো না। সকাল বেলাই সে ডাক্তার নিয়ে এলো—তার সকলবেলাকার পৃথিবীতে তার আয়োজন-ব্যবস্থার কোনো ব্যাঘাত ঘটতে পারে না, তার সামাজিক মর্য্যাদার কথাটা একবার মনে করো। ডাক্তার বুকে ষ্টেথিস্কোপ লাগিয়েই বুঝলেন, নিউমোনিয়া, দু'দিকই ধরে' গেছে। ব্যাপার গুরুতর।

নিরঞ্জন তার ব্যয়ের বন্যতায় উদ্দাম হ'য়ে উঠলো : তাতে কী? চিকিৎসা-পত্রের যাবতীয় ব্যবস্থা আমি দু'মিনিটে করে' ফেলছি।

এবং দু' ঘণ্টায় সে যা কাণ্ড করে' তুললো, তাতে বাইরের লোকের কাছে স্পষ্টই মনে হ'তে লাগলো, মিষ্টার গুপ্তর বাড়িতে

বিরাটকায় একটা উৎসব সুরু হয়েছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়, বড়ো লোকের বাড়ির ছেলের অসুখ, একটু ঘটা করতে হয় বৈ কি—বড়ো লোকের বাড়ির মৃত্যুশোকটাও সর্ব্বোচ্চকণ্ঠেই নিনাদিত হয়। হ্যাঁ, নিরঞ্জন সহরের সবগুলি সেরা-সেরা ডাক্তার আদিত্যর পিছে লেলিয়ে দিলে—অনেক ডাক্তারে মিলে পরামর্শ না করলে, এ-বাড়ির দরজায় অনেক গাড়ি একসঙ্গে না দাঁড়ালে নিরঞ্জনের মান থাকে না। আদিত্যকে বাঁচানোর চাইতে তার সম্মান বাঁচানোটাই আগে দেখতে হ'বে।

নিরঞ্জন শ্রীপর্ণাকে গিয়ে বল্‌লে,—তুমি একা পারবে না, এ ভারি শক্ত রোগ। দু'টো নার্স রেখে দি।

কুণ্ঠিত হ'য়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—কী দরকার!

বিরক্ত মুখে নিরঞ্জন বল্‌লে,—অন্তত রোগের বেলায় মাতৃস্নেহ নিয়ে কবিত্ব কোরো না। মা হ'য়ে কেবল কাঁদতেই তো পারবে—কাঁদবার সময় একদম কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না কারুর। আগে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে' দেখা যাক্ ছেলেটাকে বাঁচানো যায় কিনা। ডাক্তারদেরো তাই মত, নার্স চাই। উদগ্র উল্লাসে নিরঞ্জন প্রায় পাশবিক হ'য়ে উঠলো: এখন চাই কঠিন ডিসিপ্লিন, প্যাচপেচে সিন্টিমেণ্ট নয়। টাকা, টাকার জন্যে ভেবো না। নিরঞ্জন তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে' নিচে নেমে গেলো।

এলো দু'-দু'টো ফিরিঙ্গি নার্স উঁচু কিরায়ায়, মণে-মণে বরফ, চাকর লাগলো গোটা কয়েক, ওষুধে-পত্রে, ফলে-মূলে, নানান উপকরণে ঘরটা বোঝাই হ'য়ে উঠলো। আদিত্যর কাজে যতো না লাগুক, নিরঞ্জনের কাজে লাগছে, তার আত্ম-প্রচার, তার

বিলাসোৎসবের কাজে। এ-ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট বলে' নিরঞ্জন তাদেরকে তার শোবার ঘরটা ছেড়ে দিতে চাইলো, যতোদিন না কিছু সম্পূর্ণ একটা ব্যবস্থা হয়—এ নিরঞ্জনেরই মুখের কথা—ততোদিন না-হয় সে নিচে, বা পাশের লাইব্রেরি-ঘরটাতে গিয়ে শোবে—তার জন্যে ভাবনা কী! বলা বাহুল্য, শ্রীপর্ণা গম্ভীর মুখে জানালো, এ-ঘরটা এমন কিছু ছোট নয়, বেশ খট্‌খটে, ডাক্তাররা এর অননুমোদন করেন নি, এবং এ-ঘরটাই বেশ নিরিবিলি। তা, থাক্ ও-ঘরে, কিন্তু শ্রীপর্ণা চলে' আসুক সরে'। রোগীর কাছে নার্সরাই মা, মা নার্স না-ও হ'তে পারে সব সময়। রোগটা একটা বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়, এলোমেলো খানিকটা হা-হুতাশের নয়। বলা বহুলতরো হ'বে, শ্রীপর্ণা সে-ঘরে শিকড় গজালো।

নিরঞ্জনের এই নিষ্ঠুর নির্লজ্জতায় শ্রীপর্ণা ভিতরে-ভিতরে কালি হ'য়ে গেলো। আদিত্যর অসুখ করেছে, সে যেন তার একটা আসুরিক আস্ফালন। ঐশ্বর্য্যের বিদ্যুদ্দন্তে সে হাসছে। দীপ্তি নেই, শুধু তাপ, শুধু দাহ—দুঃসহ অপমানে শ্রীপর্ণা যেন খাক হ'য়ে যাচ্ছিলো। এতোদিনে নিরঞ্জন যেন তার উদারতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছে, তার বর্ব্বর উদারতা : শ্রীপর্ণা ও আদিত্যর জন্যে সে কতোখানি প্রসারিত হ'তে পারে, তারই একটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দেবার সুযোগ। আদিত্য যদি আজ মরে'ও যায়, তবে, শ্রীপর্ণা যদি বলে, তবে তার চিতায় সে একটা সোনার মঠ পর্য্যন্ত তৈরি করে' দিতে পারে। শ্রীপর্ণা যদি চায়, শ্রীপর্ণার জন্যে সে কী না করতে পারে সংসারে ? টাকায় কী না করা যায় !

শ্রীপর্ণাকে আদিত্যর পাশ থেকে সরানো গেলো না। কখন গায়ে দু'ঘটি জল ঢেলে দু'টি মুখে দিয়ে আবার সে এসে তার পাশ ঘেঁসে বসে, নিরঞ্জন ঘুণাক্ষরে তা জানতেও পারে না। চেহারা তার এ ক'দিনে আরো কাহিল, আরো কুৎসিত হ'য়ে গেছে—যেন ঢলঢলে মলাটে উইয়ে-খাওয়া একটা বই; তার দিকে তাকানো যায় না, পড়া যায় না একটিও আর লাইন। চোখ গিয়েছে বসে', গাল গিয়েছে তুবড়ে, কণ্ঠার হাড় দু'টো উঠেছে ঠেলে। আগে যদিও বা সে একটি দীঘি ছিলো, এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটা ডোবা। সমস্তটা শরীর পাকিয়ে গেছে গ্রন্থিল একটা দড়িতে। যেন শ্মশানের অন্ধকারে পাখা ঝাপ্‌টে বেড়াচ্ছে একটা শকুন।

নিরঞ্জন একদিন দাঁড়ালো তার মুখোমুখি। গলা ঠিক চড়াবে না নরম করে' আনবে বুঝতে পারলো না।

বল্‌লে,—তুমি রাতদিন এই রোগা ঘরে বসে' আছো কেন? পয়সা দিয়ে তবে নার্স রেখে দিলুম কী করতে?

শ্রীপর্ণা আর্দ্র চোখে চেয়ে বল্‌লে,—আমার জন্যে তো আর তোমার পয়সা লাগছে না।

নিরঞ্জন কঠিন স্তব্ধতায় গুম হ'য়ে রইলো: বল্‌লে,—তোমার জন্যে লাগছে না, না-হয় আর কারুর জন্যে লাগছে—সে যাই হোক্, ওতে আমার একটি আধলাও এসে যাচ্ছে না। কিন্তু, নিরঞ্জন তার মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলো: কিন্তু তোমার এ কী চেহারা হ'য়ে গেছে!

—চেহারা দিয়ে আমি কী করবো? শ্রীপর্ণা সর্ব্বাঙ্গে শিথিল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে' তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে' গেলো।

নিরঞ্জন নিদারুণ ঘৃণায় নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়ালো। তার সমস্ত চেতনা ঘৃণার কঠিন, উজ্জ্বল একটা স্ফটিকে গেলো রূপান্তরিত হ'য়ে। তার চোখের দৃষ্টি ঘৃণায় শানিত হ'য়ে উঠলো তলোয়ারের ব্যগ্রতার মতো। অভিভূত হ'য়ে গেলো সে সেই ঘৃণায়—সেই অশরীরী উত্তপ্ততায়। কেন যে তার ঘৃণা, স্পষ্ট কারণ সে কিছু খুঁজে পেলো না : ঘৃণা হ'লো শ্রীপর্ণার এই উৎসারিত স্বাভাবিকতাকেই। তাইতেই শ্রীপর্ণা তার শত্রু,—জল যেমন আগুনের। নিরঞ্জন ঘরে-বাইরে এই ঘৃণার আনন্দে বিভোর হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই ঘৃণা তাকে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে। এতো দিনে সে যেন তবু একটা কিছু পেলো, জীবনের একটা কিছু স্থূল, স্থাবর সম্পত্তি : তার এই ঘৃণা, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত। প্রেমের সেই গলিত মধুরতার চেয়ে ঘৃণার এই বিষাক্ত তিক্ততায় অনেক বেশি স্বাদ, অনেক বেশি মত্ততা। প্রেমে তবু একটা নিরবয়ব আতঙ্ক থাকে, ঘৃণায় উদগ্র মুক্তি, নিশ্চিন্ত অবসর। ঔদাসীন্য নয়, তাতে প্রাণ নেই, উদ্দীপনা নেই, উল্লাস নেই : ঘৃণা, নির্ধূম, ঊর্দ্ধায়িত একটা শিখা, শব্দহীন অট্টহাস্য। সত্যি করে' বলতে গেলে, কোনো কারণ নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই : একটা অহৈতুক আনন্দ, নিরুদ্দেশ লোলুপতা। নিরঞ্জন জর্জ্জর হ'য়ে ফিরতে লাগলো এই ঘৃণার হিংস্রতায়।

শ্রীপর্ণাকে তার যে কী বীভৎস কুৎসিত লাগছে, বিশেষতো এই তার সাড়িতে, তার গয়নায়, যেন কঙ্কালও তার চেয়ে সুন্দর, তার চেয়ে শোভন—কঙ্কালেও একটা সত্য আছে, আছে একটা

অনুপাতের সুষাম্য। না, এই শ্রীপর্ণাকে সে কোনোদিন ভালোবাসে নি, এই তার দুর্ব্বল ভাবাকুলতায়। বরং সেদিনের শ্রীপর্ণা তার সেই রুক্ষ সুচারু কৃশতায় অনেক সুন্দর ছিলো। তার সাড়ির সেই শুভ্রতা ছিলো অনেক পবিত্র। মুখে তার সেদিন এমন একটা কুৎসিত কান্না ছিলো না, ছিলো একটি বিষাদের স্নিগ্ধতা। সেদিনো সে সম্পূর্ণ ছিলো, নিজের নিভৃত একাকীত্বে ছিলো সে ছন্দোময়। বরং, তবু সে ছন্দ বজায় রাখতে পারতো, যদি সে নিরঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারতো জীবনের বহুব্যাপী উপভোগের উচ্ছ্বাসে, দুই হাতে মুঠো-মুঠো মুহূর্ত্ত ছড়াতে-ছড়াতে। যদি সে দেহ-মনে নাগরিক, সভ্য হ'য়ে যেতে পারতো, যদি হাতে পতাকা নিতে পারতো এই শতাব্দীর সভ্যতার। কিছুই পারলো না সে, স্বর্গেও নয়, পৃথিবীতেও নয়, মাঝখানে শূন্যে সে লেগেছে দুলতে—এই তার কিছু-না-হওয়ার শূন্যে। ঘৃণায় নিরঞ্জন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। বরং সেই সে ভালো ছিলো তার সেই বিষণ্ণ শুভ্রতায়, সেই কোমল বিরতিতে। তার মুখে তখন শোক ছিলো না, ছিলো শান্তি। কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না, ছিলো বিস্তীর্ণ একটি সমর্পণ। সমস্ত শরীরে ছিলো তপস্যার একটি আভা, কঠিন একটি নির্ম্মলতা: তাকে ছোঁয়া যেন মন্দিরের গহ্বরে গিয়ে দেবতার বিগ্রহকে ছোঁয়া। রুক্ষ অগোছাল চুলে, নিরাকাঙ্ক্ষ গভীর দু'টি চোখে, উদাস কপালে, রিক্ত দু'খানি হাতে, তার অস্তিত্বের পরিব্যাপী নিস্পৃহতায় সে ছিলো নিরঞ্জনের আত্মার প্রশান্ত একটি প্রার্থনার মতো। তাকেই সে ভালোবেসেছিলো, এই বিলাসিনী শ্রীপর্ণাকে নয়। তার কাছে শ্রীপর্ণা আজ চলে'

এসেছে একটা তথ্যের নিশ্চল সীমাবদ্ধতায়। গয়না-সাড়িগুলো ঠিক তার গায়ে-গায়ে বসছে না, দেখাচ্ছে যেন রূঢ় বিজ্ঞাপনের মতো : যেন নির্ব্বাপিত চিতার উপর সারি-সারি মাটির বাতি বসানো হয়েছে।

শ্রীপর্ণাকে সে ঘৃণা করে, অথচ শ্রীপর্ণাকেই সে চায়।

এদিকে আদিত্যর অসুখটা ইদানি খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে স্ফীততরো হ'য়ে উঠছে নিরঞ্জনের অমিতব্যয়িতার পরিমাণ, কোথাও এক বিন্দু সে খুঁত রাখছে না, তার বিরুদ্ধে যাতে কারু কোনো বিন্দুতম নালিশ না থাকতে পারে। মাঝ-রাতের ঘুমের অন্ধকার থেকে মাঝে-মাঝে সে চম্‌কে উঠছে, যেন এক্ষুনি শ্রীপর্ণা কেন-কে-জানে আকস্মিক চীৎকার করে' উঠলো। নিরঞ্জন গা ঝেড়ে মাঝে-মাঝে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে : কই, কোথায় কী শব্দ, অন্ধকারে ঝিল্লি ডাকছে, হাতুড়িতে ছোট-ছোট বরফ-ভাঙার শব্দ, নার্সদের অস্ফুট ক'টি ফিস্‌ফিসানি। দূরে রাস্তায় জ্বলছে গ্যাস। নিরঞ্জন আবার শুয়ে পড়ে, ঘুম আসে না, এতো নিস্তব্ধতায় তার ঘুম আসে না।

একদিন, মাঝরাতে, নিরঞ্জন এমনি একটা স্পষ্ট চীৎকার শুনতে পেলো, হ্যাঁ, ঠিক শ্রীপর্ণার গলা। শ্রীপর্ণা ছাড়া এতো জোরে আর কে চেঁচিয়ে উঠবে! নিরঞ্জন ধড়মড় করে' বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলো। চটি-জুতোটা খুঁজে নিয়ে গায়ে সে জামা পরলে : শ্রীপর্ণাকে সে ঘৃণা করে বটে, তবু শ্রীপর্ণাকেই সে চায়— দরজা খুলে চল্‌লো সে আদিত্যর ঘরের দিকে।

পুরু সেডের তলায় ঘরে আলো জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ করে',

আদিত্যর শিয়রের কাছে শ্রীপর্ণা মলিন একটি রেখায় ঘুমে পড়েছে ভেঙে, চেয়ারে বসে' রাতের নার্স দিচ্ছে পাহারা।

কোথাও কিছু নয়।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনে নার্স বেরিয়ে এলো। ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—আপনি উঠে এসেছেন কেন?

নিরঞ্জন ক্লান্ত গলায় বল্‌লে,—বড্ড অস্থির লাগছে।

—না, না, কিছু চিন্তা করবেন না। মিসেস গুপ্তকে তো অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি, আপনিও যদি অবুঝ হ'ন, নার্স গম্ভীর হ'য়ে গেলো: তা হ'লে আর কী করে' চলে? যান, শুয়ে পড়ুন গে।

নিরঞ্জন জিগ্‌গেস করলে: এখন কেমন আছে?

—একই রকম। নার্স ঘরের মধ্যে চলে' গেলো: ভাবনার কিছু নেই। এই এখন একবার জ্বর নেবো।

জ্বরটা শোনবার জন্যে নিরঞ্জন আর সেখানে দাঁড়ালো না। নিজের ঘরে গিয়ে পাইচারি করতে লাগলো।

পরদিন সকালবেলা নিরঞ্জন আবার আরেকটা কান্নার শব্দ শুনলে। এবার স্পষ্ট দিনের বেলা, নিরঞ্জন নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে না। ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে সে আদিত্যর ঘরে গেলো, কিন্তু ব্যাপারটা সে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। আদিত্যর বুকের পাশে বসে' কে-একটি প্রৌঢ় মহিলা তার কপালে-চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর চোখে আঁচল চেপে কাঁদছেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে; নার্স তাঁকে হাতে ধরে' কাঁদতে বারণ করছে, আর দূরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে শ্রীপর্ণা রয়েছে দাঁড়িয়ে, অপরাধীর মতো, শুক্‌নো, শূন্য

চোখে। নার্সের অনুরোধে মহিলাটি অতি সহজেই নিবৃত্ত হ'লেন। নিরঞ্জন ফাঁপরে পড়লো। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে' জিগ্‌গেস করলে : কি, কী হ'লো ?

কেউ কোনো উত্তর দিলো না, শুধু মহিলাটি নিরঞ্জনের গলা শুনে তাড়াতাড়ি মাথায় প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টেনে দিলেন।

আদিত্য রোগা, বিশীর্ণ মুখে অস্ফুট হেসে উঠলো : ও ভদ্দরলোক। ভদ্দরলোককে দেখে লজ্জা কিসের, ঠাকুমা ?

সমস্ত ঘরে যেন আগুন লেগেছে এমনি দ্রুততায় নিরঞ্জন ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে।

মহিলাটি কতোক্ষণ পরে বাড়ি ছেড়ে চলে' গেলে নিরঞ্জন জরুরি কাজে শ্রীপর্ণাকে তার লাইব্রেরি-ঘরে ডেকে নিয়ে গেলো। বল্‌লে,—কে এসেছিলো ?

শ্রীপর্ণা নিস্তেজ, অবসন্ন গলায় বল্‌লে,—আদিত্যর মুখেই তো শুনলে, ওর ঠাকুমা।

—ওর ঠাকুমা মানে তোমার শাশুড়ি ?

শ্রীপর্ণা চুপ করে' রইলো।

—কী, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

—আদিত্যর ঠাকুমা বল্‌লে যদি চিনতে না পারো, শ্রীপর্ণা ঢোঁক গিল্‌লে : হ্যাঁ, আমার শাশুড়ি।

সহসা কী কথা বলে' বসবে নিরঞ্জন ভেবে পেলো না। বল্‌লে,—তাঁরা না তোমাকে ত্যাগ করেছিলেন ?

—আমাকে করেছেন, কিন্তু আদিত্যকে করেননি।

নিরঞ্জন সোজাসুজি চটে' উঠতে পর্য্যন্ত পারলো না। সেল্‌ফ্‌

থেকে একটা বই তুলে নিয়ে এলোমেলো পৃষ্ঠা উল্‌টোতে-উল্‌টোতে বল্‌লে,—তুমি বুঝি তাঁদেরকে খবর দিয়েছিলে ?

—না, খবর তাঁরা আপনা থেকেই পেয়েছিলেন।

—তা পান্‌, কিন্তু আমার বড়িতে এই সব চলবে না।

—কী সব ?

নিরঞ্জন চেয়ারে বসে' গভীর মনোযোগে বই বড়ছে।

শ্রীপর্ণা অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্‌লে,—আদিত্যকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন, তার অসুখ শুনে—

নিরঞ্জন বলে' উঠলো: এ আবার এমন কী অসুখ যে মান-সম্মান ভুলে', তক্ষুনি একেবারে ছুটে আসতে হ'বে এ-বাড়ি ?

শ্রীপর্ণা নির্লিপ্ত মুখে বল্‌লে,—মান-সম্মানের কথা আসে কী করে' ? তবে আদিত্যকে তিনি দেখতে এলে তুমি তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাও নাকি।

—তবে ও-বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পারো। ছেলে নিয়ে, শাশুড়ি নিয়ে, গুষ্টিবর্গ নিয়ে। বইয়ের পৃষ্ঠায় নিরঞ্জনের মুখ ঢাকা: তবে আর এখানে পড়ে' আছো কোন দুঃখে ? এটা আমার বাড়ি—আমার বাড়িতে চলবে না এ-সব নুইসেন্স। আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে' রাখছি।

শ্রীপর্ণা দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ হাতের বইটা আরেকটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো: আমি চলে' যাবো এ বাড়ি ছেড়ে!

—তোমার বাড়ি, তুমি যাবে কেন? শ্রীপর্ণা কুটিল করে' তাকালো একবার নিরঞ্জনের মুখের দিকে: বরং আমাদেরকেই তাড়িয়ে দিয়ো। বলে' দ্রুত পা ফেলে সে চলে' গেলো নিরঞ্জনের দীর্ঘশ্বাসেরো আগে।

সন্ধের দিকে শ্রীপর্ণাকে সে আবার ডাকালে।

—আমি আজ রাত্রেই চলে' যাবো ঠিক করলুম।

শ্রীপর্ণা ভীত, পাংশু মুখে বল্‌লে,—কোথায়?

—তা জানি না।

—জানো না মানে?

—জানি না মানে যাবো।

শ্রীপর্ণা কথাটাকে আমোলেই আনবার চেষ্টা করলো। না: পাগল! আদিত্যর এমন অসুখ, তুমি এখন যাও কী করে'?

—কেন, আমি থেকে কী এগিয়ে দিচ্ছি? তোমার টাকার দরকার, রেখে যাচ্ছি যথেষ্ট।

—কিন্তু, শ্রীপর্ণা প্রশান্ত, পরিষ্কার গলায় বল্‌লে—তুমি এখন গেলে ভালো দেখায় না।

—ভালো দেখায় না?

—না। শ্রীপর্ণার গলা আরো শুকনো, আরো প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠলো: কাল ডাক্তাররা এসে তোমাকে বাড়ি দেখতে না পেলে কী বলবেন? কাল সকালে-সন্ধেয় দলে-দলে তোমার বন্ধু ও বন্ধুনিরা যখন আদিত্যর খবর নিতে আসবে, তখন তোমার অনুপস্থিতি তাদের কী বোঝাবে?

নিরঞ্জন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো, একটি কড়ে' আঙুলও সে তুলতে পারলো না।

আমাকে কেউ ভালোবাসে তার মধ্যে গৌরব আছে, কিন্তু আমার ভালোবাসা কেউ প্রত্যাখ্যান করলো, তার মধ্যে গভীর, দুঃসহ লজ্জা। সভ্য মানুষ প্রাণপণে তা লুকিয়ে রাখে, যা ভালো দেখায় না, তেমন কোনো জিনিস দেখিয়ে সেই দুঃখহীন লজ্জাকে কেউ উদঘাটিত করতে পারে না।

শ্রীপর্ণার এক নিশ্বাসে নিরঞ্জন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। একমাত্র গাড়িটা নিয়েই সে এখানে-সেখানে ঘুরে আসতে পারে।

পনেরো

একটুও আশ্চর্য্য নয়, নিরঞ্জনের নিখুঁত বিধি-ব্যবস্থার জোরে, টাকার জোরেই বলতে পারো, আদিত্য ভালো হ'য়ে উঠলো। এতো সেবা, যত্ন ও অর্থব্যয়ের এই একমাত্র ফল দাঁড়াতে পারে, অনিবার্য্যরূপে। আদিত্য ভালো হ'য়ে উঠলো। এখন শুধু তার আস্তে-আস্তে সবল হ'য়ে ওঠবার প্রতীক্ষা। তাই তাকে এখনো দীর্ঘ দিন বিছানার বিশ্রামে থাকতে হচ্ছে।

এর পরে, এখন থেকে, সংসারের আকাশে লঘু পাখায় শ্রীপর্ণার ছড়িয়ে পড়ার কথা। এখন থেকে ঘটনার পাথরে একেক করে' পা ফেলে-ফেলে সময়ের ঝর্ণাটা সে অনায়াসে পার হ'য়ে যেতে পারে। আর কী, আবার শরীরে নিয়ে আসতে পারে পুরোনো সেই ভঙ্গিমা, মনে সেই মসৃণ মুক্তি।

কিন্তু ব্যাপার ঘটলো উল্টো। শ্রীপর্ণা আদিত্যর ঘরের মধ্যে নিজেকে আরো ঘন করে' গুটিয়ে নিলে।

সংসারের বদ্‌লে গেছে সুর: বদ্‌লে গেছে পৃষ্ঠপট। তাতে শ্রীপর্ণা আর না পাবে সঙ্গতি, না পাবে সমানুপাত। সে

এখন নিতান্ত খাপছাড়া, অবান্তর চিঠির শেষে ইতির মতোই নিরর্থক।

নিরঞ্জন আজকাল আর বাইরে বেরোয় না, সমস্ত বাহিরটাকেই সে একরকম তার বাড়ির মধ্যে টেনে এনেছে। বাড়ির মধ্যে মানে নিচের তলায়, তার ড্রয়িং-রুমে। সেইখানে উত্তাল হ'য়ে উঠেছে তার ঘৃণা, তার ঘৃণার মদির মহোৎসব। সেইখানে উড়ে-উড়ে আসে সহরের সব রঙিন প্রজাপতিরা, মদের গ্লাস থেকে উপ্‌চে-পড়া ফাল্‌তু খানিকটা ফেনার মতো সমাজের সেই ফেনবিন্দুগুলি—যারা 'আমি বেঁচে আছি' এই খবরটা জানাচ্ছে শুধু তাদের শরীরে, যারা সৌন্দর্য্য ও রূপকে নিয়ে এসেছে একটি সমতল সমার্থকতায়, যারা জীবনকে পেয়েছে প্রকট স্পষ্টতার মধ্যে, প্রচ্ছন্ন রহস্যের মধ্যে নয়। কাচের বাসনের মধ্যে ভাসমান কতোগুলি মাছ, কাগজের কতোগুলি ফুল। বেড়াল চুরি করবে না বিশ্বাস করা যায়, প্রেমে পড়বে না বলে' যাদের বিশ্বাস করা যায় না। যারা হাসতে হ'বে বলে' হাসে, কী কায়দায় কখন কাঁধ নাড়তে হ'বে জেনে কাঁধ নাড়ে, ঠোঁট কুঁচকোনোটাকে যারা একটা মুখের কারুকার্য্য হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে। তাদের ও তাদের অনুষঙ্গগুলিকে নিয়ে নিরঞ্জন প্রতি সন্ধ্যায় হাট জমায়। কখনো গান, কখনো হাসি, কখনো হুল্লোড়। ওড়ে চা, পোড়ে সিগ্‌রেট্‌, বাটিতে-বাটিতে, কৌটোয়-কৌটোয়। খিদমৎগাররা আঙুলের ইসারায় উঠছে-বসছে, সমস্ত বাড়ি তটস্থ। স্ফূর্ত্তির ঝড় বইছে উদ্দাম। অনেক—অনেক রাত পর্য্যন্ত।

শ্রীপর্ণা সেই সময়টা, অনেক রাত পর্য্যন্ত, উপরের ঘরের জানলায় চুপ করে' বসে' থাকে। এ-সময়টায় কোনো-কোনো রাতে জ্যোৎস্না থাকে, কোনো রাতে বা থাকে না। নিচের সেই আলোকিত কোলাহলের উর্দ্ধে শ্রীপর্ণার অন্ধকারে একটি স্তব্ধতা থাকে জেগে। কোনো কিছু মনে করতে গেলে, বহু দূর অতীতে মনের গভীর অন্ধকারে কিছু খুঁজতে গেলে সে পায় শুধু এই স্তব্ধতা। যারা মরে' গেছে তাদের যদি কেউ বা কখনো বাঁচে, তারা বাঁচে শুধু এই স্তব্ধতায়। মৃত্যুর তুমি আর কিছু মনে করতে পারো না, এই স্তব্ধতা ছাড়া।

সেই সব দিনগুলি তার জীবনের উপর শিশিরের মতো ঝরে' পড়ছিলো। শ্রীপর্ণার মনে পড়ে তার বিয়ের সেই রাত, শরীরের মধুর সেই লজ্জা: তার মৃত্যুর সেই দিন, শরীরের মধুর সেই রিক্ততা। সে-সব দিন পল্লবে-ঢাকা, বৃন্তবিনত ফুলের মতো কমনীয় ছিলো, ছিলো না আঙুর-নিঙড়ানো মদের মতো ঝাঁজালো। সে-সব দিনে সে সীমাস্খলিত বন্যাবেগ ছিলো না, ছিলো আপন পরিমিত রেখায় আঁকাবাঁকা একটি নির্ঝরিণী। সে-সব দিনে সে কতো সুন্দর ছিলো, কতো পবিত্র। উগ্র চোখের অন্তরালে বনের কিনারে ফোটা ছোট লাজুক একটি ফুলের মতো তার সেই শেষ কৈশোর, প্রতিপদের চাঁদের খানিক রেখার মতো তার প্রথম সেই উন্মোচন।

আজ আর তার সেই লজ্জা নেই, সেই শুচিতা। সবই যেন স্থির, স্পষ্ট, প্রতিপাদিত! আর সেই প্রতীক্ষা নেই, সেই ঘুমিয়ে জেগে থাকা। সবই যেন জানা, ফুরিয়ে ফেলা, দাগা

বুলোনো। একটা ধারাবাহিক সমাপ্তি। শ্রীপর্ণা এ কী হ'য়ে গেছে!

ক্ষীরোদের সঙ্গে তার টুকরো-টুকরো দেখা হ'তো, জলের ঢেউয়ে ভাঙা-ভাঙা ছায়ার মতো। চারদিকে ভাসুর আর শ্বশুর, গুরুজনের ভিড়, তারই মধ্যে হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় চপল একটি মুহূর্তে তাদের হয়তো দেখা হ'য়ে যেতো, চোখের বিশাল একটি চাওয়া, হয়তো ত্বরিত আঙুল এসে লাগতো আঙুলের মুখে, হয়তো বা কনুয়ের কাছে একটি চিম্‌টি, একটা গুলি-পাকানো কাগজের একটা টুকরো এসে পড়তো তার মুখের উপর। সমস্ত দিনে দিন যেন আর কাটতে চাইতো না; পৃথিবী থেকে রাতগুলি যেন উড়ে পালিয়েছে। ভাঙা-ভাঙা আলাপে তাদের তৃপ্তি হ'তো না: 'আধ গ্লাশ জল যেন নিদাঘের কালে।' তারপর, দীর্ঘতম দিনেরো শেষ আছে, নামতো রাতের অন্ধকার, তার গায়ের উপরে ঝল্‌মলে সাড়ির মতো। কখনো ক্ষীরোদ পড়েছে ঘুমিয়ে, জায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের পাট তুলে চুপিচুপি চলে' এসেছে সে ঘরে, হাতের মুঠিতে সাজা দু'টি পান নিয়ে। কখনো সে পড়েছে ঘুমিয়ে, ক্ষীরোদ টেবিলে জেগে একজামিনের পড়া করছে। তাদের সেই ঘুম, তাদের সেই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়া। অথচ ক্ষীরোদকে সে কোনোদিন 'ভালোবাসে নি'। সমস্ত রাত কী যে তারা এতো কথা কইতো একটি নিশ্বাসও আজ তার মনে নেই। শুধু শ্রীপর্ণা যে কতো সুন্দর ও ক্ষীরোদ যে কতো ভালো, নানা নীরবতায় তারই কেবল পুনরাবৃত্তি চলতো। যতোবার

আওড়াও, একেকটা কবিতা যেমন ততোবার নতুন মনে হয়, তেমনি শ্রীপর্ণা যে সুন্দর আর ক্ষীরোদ যে ভালো—দু'টি তথ্য একত্র হ'য়ে একটি সত্যে উঠতো অসীম হ'য়ে—এ-কথা তারা কিছুতেই ফুরিয়ে ফেলতে পারতো না। তখন তাদের মাঝখানে কতোগুলি উপকরণের স্তূপ ছিলো না: সজ্জা আর আভরণ, জিনিস আর জিনিস: তখন তাদের মাঝে চাঁদ জাগতো, তারা ফুটতো, আকাশ থাকতো অন্ধকার হ'য়ে। তাদের, তার সেই রাত। কিছুই জানতো না, কিছুই তারা বোঝে নি—তাদের সেই আদিম, অপার্থিব বিস্ময়, তাদের মধুর অজ্ঞানময় অন্ধকার। কী পেলো সে বুদ্ধি দিয়ে? কী দেখলো সে তার চোখের এই প্রখর উন্মীলনে?

কাটা-কাটা ভাবে কতো ছবি তার মনে পড়ছে। কতো চপল ছেলেমানুসি। কী করে' তার হাত থেকে চুলের খোঁপাটা সে আস্ত রাখতে চেষ্টা করতো, কতোবার সে তার চাবি রেখেছে লুকিয়ে, পরে চৌবাচ্চার জল-দেবতাকে পান-সুপারি মানতে যাবার সময় তার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে কেমন বা'র করে' দিয়েছে আস্তে-আস্তে, কেমন একেক দিন দুপুরে তার বাবার কড়া পাহারা এড়িয়ে এখানে-সেখানে তার জন্যে সে উঁকিঝুঁকি মেরেছে, অথচ মুখে এমন একখানি ভাব, যেন কিছুই হয়নি পৃথিবীতে, শুধু আজ হঠাৎ ভীষণ গরম পড়েছে কল্‌কাতায়। সময় চলে' যাচ্ছে, না, থেমে আছে, তাদের হিসেবেই আসতো না, পায়ে-পায়ে শুধু দিনগুলি ছিলো দীর্ঘ, রাতগুলি যেতো একটি ঘুমের পরেই ফুরিয়ে। সময় পর্য্যন্ত তার

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে, কেটে-কেটে দিনগুলিকে আনলো ছোট করে’।

মনে আছে কতোদিন ক্ষীরোদ ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতো, আর তার হাতার উপর বসে’ তার কাঁধের কাছে বেঁকে গিয়ে শ্রীপর্ণা আর কিছু করবার না পেয়ে চিরুনি দিয়ে ধরে’-ধরে’ তার চুল আঁচড়ে দিয়েছে। কতোদিন তারা দাঁড়িয়েছে এসে জানলায়, যখন কখনো আকাশ এসেছে মেঘে কালি করে’, যখন বড়ো-বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি এসে পড়েছে তাদের মুখের উপর। তাদের সে-সব দিনে কোনো কথা ছিলো না, ছিলো সুর: কোনো আস্বাদ ছিলো না, ছিলো অনুভব: তাদের ঘুমের উপর দিয়ে শুধু সময় গড়িয়ে যাওয়া! কতোদিন মা হয়তো লুকিয়ে তাকে একটা কিছু খেতে দিয়েছেন, সেটা সে আরো লুকিয়ে এনেছে ক্ষীরোদের মুখের গহ্বরে! কতোদিন সে হয়তো ব্যস্ত হ’য়ে যাচ্ছে কোনো সংসারের কাজে, দরজার কড়ার সঙ্গে কখন তার আঁচলটা গেছে জট পাকিয়ে। হাতের বাসনটাই সে নামিয়ে রাখবে, না, দরজার ফাঁসটাই সে আগে ছাড়াবে, শ্রীপর্ণা কিছু ভেবে উঠতে পারছে না। দাঁড়াও, সে-ও প্রতিশোধ নেবে: দুই চোখ প্রাণপণে বুজে এমন সে আজ ঘুমুবে—ভাবতেই শ্রীপর্ণা হেসে উঠতো: দাঁড়াও, তবু সে ছাড়বে না।

বনের অন্ধকারে সব সময়েই যেমন মনে হয় কিসের একটা ছায়া ঘুরছে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে, তেমনি শ্রীপর্ণা তার মনের অন্ধকারে ক্ষীরোদের ছায়া দেখতে লাগলো—তার সেই মৃত্যুর তুহিনতা!

মরবার পর ক্ষীরোদকে যে কতো সুন্দর দেখিয়েছিলো আজকে সময়ের এতো দূরে বসে' শ্রীপর্ণার প্রথম মনে হচ্ছে। জীবদ্দশায় তোমার রূপের জন্যে তোমাকে হয়তো অনেক আয়োজন করতে হয়, তোমার বেশভূষা, তোমার শরীর-শ্রী, তোমার কতো কী, কতো কী নয়,—কিন্তু মৃত্যুর বেলায় তোমার রূপের জন্যে তোমাকে নির্ভর করতে হয় একান্ত তোমার চরিত্রের উপর। মৃত্যু আর সব ধুয়ে-মুছে এই সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন চরিত্রটিকে শুধু ফুটিয়ে রাখে তার অসীম অব্যক্ততায়। মৃত্যুর বেলায়, শুধু মৃত্যুরই বেলায়, যা তুমি হয়েছ নয়, যা তুমি ছিলে। ক্ষীরোদের মৃতদেহের সেই শিলাময় অপার নিশ্চিহ্নতায় স্পষ্ট রেখায় তার চরিত্রটি ছিলো লেখা—এতোকাল পরে প্রথমে যেন শ্রীপর্ণা তার পাঠোদ্ধার করতে পারলো।

শ্রীপর্ণা মাঝে-মাঝে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ওপারের ছায়াটা সত্যি সে নিজে কিনা চেনবার জন্যে তাকিয়ে থাকে। সে কী অপরিচেয় কুৎসিত হ'য়ে গেছে, কী অশুচি! যে দেহ ছিলো তার একদিন গুণীর হাতের বীণা, তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কতোগুলি হাড় আর মাংস। তার আর নেই সেই লজ্জা, সেই শুচিস্মিতি: এখন কেবল দাহ, এখন কেবল মুখরতা। আনন্দকে নিয়ে এসেছে সে স্ফূর্তিতে, সেই পরিচ্ছন্ন লাবণ্যটিকে নিয়ে এসেছে আবিল লবণাক্ততায়। সমস্ত শরীর যেন তার একসঙ্গে ছি-ছি করে' উঠলো। চুলই বা আর সে বাঁধে কেন, শরীরে দোলায় সাড়ির হিল্লোল, কেনই বা সে আবার নতুন করে' সংসার পেতেছে—ঘরের দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত তাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে

ধিক্কার দিয়ে উঠলো। সে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটা তথ্য, খবরের কাগজের খবর, কেনা-কাটার একটা হিসেব—কোথায় তার সেই কবিতার মতো সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠা, কবিতার মতোই অসীম থেকে যাওয়া! এরই নাম বুঝি প্রেম—যা তার মাতৃস্নেহের চেয়েও প্রচণ্ড! শ্রীপর্ণা সরে' আসে আয়নার থেকে। তার চেয়ে, তার এই গ্লানি, এই পরাভবের চেয়ে, উলঙ্গ, উদ্ধত পাপেও বুঝি বেশি মহত্ত্ব ছিলো।

শ্রীপর্ণার সময় আর কাটে না, সময়ের সেই রেখাটা আর দীর্ঘায়মান না হ'য়ে বৃত্তাকার হ'য়ে উঠেছে।

পার্টির মাঝখান থেকে নিরঞ্জন একদিন ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উপরে উঠে এলো। শ্রীপর্ণা আদিত্যর ঘরে, আদিত্যর পাশে বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে কী কতোগুলি কাগজ-পত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিলো, চম্‌কে উঠলো।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—তোমাকে ওঁরা নিচে ডাকছেন।

—কেন? বালিস দিয়ে কাগজ-পত্রগুলিকে সে চাপা দিলে।

—কেন আবার কী! তুমি আমাদের পার্টিতে জয়েন্ করবে না?

শ্রীপর্ণা রইলো চুপ করে', অপরাধীর মতো।

—আদিত্য তো এখন দিব্যি সেরেই উঠেছে, তবে আর বাধা কী? নিরঞ্জন এক পা এগিয়ে এলো: চলো, বাড়িতে তোমার এতো গণ্যমান্য গেষ্ট এসেছেন—

—প্রথমতো বাড়িটা আমার নয়, বালিসটাতে জানুর ভর

রেখে শ্রীপর্ণা গম্ভীর,' একটু-বা ভীত মুখে বল্‌লে,—দ্বিতীয়তো এঁরা কেউই আমার কাছে আসেন নি।

নিরঞ্জন পিছু হট্‌লো না, সে-সব আধো-আলো আধো-ছায়ার ভাব তারা কাটিয়ে উঠেছে। স্পষ্ট করে' বল্‌লে,—হ'লোই বা। অন্তত appearance তো রাখতে হয়। যা ভালো দেখায় না, তাই বা তুমি কী করে' করতে পারো?

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তারো আর দিন নেই।

নিরঞ্জন সেটা গায়েই মাখলো না: খুব আছে। তুমি চলো, নিরঞ্জন হাসলো: ড্রেস করে' নিলেই তোমাকে আবার ভালো দেখাবে।

—পোষাকে আর আমার স্পৃহা নেই একটুও।

—পোষাক! কোনটা তোমার পোষাক নয় শুনি? নিরঞ্জন ঘৃণায় ঝল্‌সে উঠলো: এই ছেলে, ছেলে নিয়ে এই তোমার গদ্গদ ভাব—এটা একটা পোষাক নয়? নিরঞ্জন সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো: সব কিছুরই একটা সীমা আছে, ভদ্রতা আছে। উঠে এসো বলছি।

—তাঁরা কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, শ্রীপর্ণা স্নিগ্ধ মুখে বল্‌লে,—এখানে চলে' এলেই তো পারেন।

—তবু তুমি যাবে না?

—সত্যি, আমাকে কারুর ভালো লাগবে না। শ্রীপর্ণার মুখ বেদনায় ধূসর হ'য়ে এলো: আমি পারবো না সেখানে সুর মেলাতে।

—তুমি এই ছেলে আঁকড়ে পড়ে' থাকবে? নিরঞ্জন নীল হ'য়ে উঠলো।

শ্রীপর্ণা কথা কইলো না।

কী যে করবে, নিরঞ্জন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুই তার করবার নেই। নিচে পার্টি চলেছে তুমুল।

দরজার দিকে সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলো কুটিল, বিকৃত মুখে অদ্ভুত হেসে উঠে সে বল্‌লে,—শুধু একটা ছেলে থাকলেই মায়ের সম্মান পাওয়া যায় না। সেই অর্থে পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েই মা হ'তে জানে। তাতে কোনো কৃতিত্ব নেই।

নিরঞ্জনের তিরোধানের সঙ্গে ঘরের অন্ধকারও যেন সেই সুরে হেসে উঠলো।

ষোলো

নিরঞ্জন পার্টি ভেঙে দিলো। সোফা-সেটিগুলি এলোমেলো, কুশনগুলি নিপীড়িত—শূন্য ড্রয়িং-রুম। ঘরময় পোড়া সিগ্রেটের টুকরো, বাতাসে উড়ে’ বেড়াচ্ছে সেণ্টের ঝাঁজ, চাপা হাসির কঙ্কাল। কাউকে আর ডাকলো না সে বাড়িতে। যারা কাল এখানে-সেখানে ভুল করে’ রুমাল ফেলে রেখে গিয়েছিলো, তারা আজ ডাকতে এসে দেখলো নিরঞ্জন বাড়ি নেই। নিরঞ্জন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। Labrador-এর জমির কথা সে শুনেছিলো, যেখানে মাটির উপরে রাশি-রাশি রঙিন ফুল রয়েছে ফুটে, কিন্তু এক হাত নিচেই যেখানে জমানো বরফ। নিরঞ্জন ছেড়ে দিলো সেই প্রজাপতিপনা। দিন কয়েক আবার সে আপিস নিয়ে খুব মাতামাতি সুরু করলে, কতোগুলি লোকের চাকরি কেড়ে নিলো। ভীষণ কড়া, ভীষণ হুঁসিয়ার—নিরঞ্জনের হাতের কলমটা পর্য্যন্ত বুঝতে পারে তার এই রক্তের ধার। চুনোপুঁটি থেকে আপিসের ম্যানেজার পর্য্যন্ত তার এই মেজাজের চাকচিক্যে হক্‌চকিয়ে গেছে। আগে সে কখনো-সখনো আপিসে

এলে সবাই খুসি হ'য়ে উঠতো, এখন সে সময় ধরে' রোজ আসছে বলে' সবাই গেছে ভয় পেয়ে। তার মোটরের শব্দ শোনা মানে চোখে সর্ষেফুল দেখা। আগে যদি বা আসতো চেয়ে-চিন্তে কিছু টাকা কুড়িয়ে নিতে, এখন আসছে সে হিসেব মেলাতে। আগে যদি বা ভিক্ষা, এখন লুণ্ঠন।

কিন্তু তারপর? তারপর কোথায় সে যায়?

ম্যানেজারকে গোপনে ডেকে এনে নিরঞ্জন বল্‌লে,—ব্যবসা আমি তুলে দেবো।

তার চেয়ে ম্যানেজারের মুখে একটা চড় মারলে সহজে সে সেটা বুঝতে পারতো। ম্যানেজার আম্‌তা-আম্‌তা করে' বল্‌লে,—সে কী বলছেন! এমন চল্‌তি ফ্যালাও কারবার, বছরে এতো মুনফা দিচ্ছে—তুলে দেবেন কী?

—হ্যাঁ, তুলে দেবো। আমার ভালো লাগে না কিছু, আমি বিরক্ত হ'য়ে গেছি।

কথাটার কোনো কিনারা করা ম্যানেজারের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সে শুধু বল্‌লে,—কিন্তু এতোগুলো টাকা ঘরে এসে যাচ্ছে—

—টাকা! টাকা! টাকারো কি একটা সীমা নেই? ম্যানেজার যেন কী ঘোরতর অপরাধ করে' বসেছে, নিরঞ্জন এমনি তার উপর মুখিয়ে উঠলো: টাকা দিয়ে কী হ'বে? টাকাগুলি আমি কী করে' খরচ করবো বলতে পারেন? যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটা নতুন কিছু করা যাক্।

—কিন্তু আপনার আপিসে এতোগুলি লোক খাটছে,

ম্যানেজার মুখ কাঁচুমাচু ক'রে' বল্‌লে,—তারা ভাতে মারা যায় যে। ব্যবসা তুলে দিলে তাদের কী উপায় হ'বে ভাবুন? এতোগুলি পরিবার—

নিরঞ্জন চম্‌কে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। সে অসহায়, টাকা তার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত কিনে নিয়েছে।

ম্যানেজার বল্‌লে,—আপনার শরীরটা বিশেষ ভালো দেখছি না। দিন কয়েকের জন্যে কোথাও চেঞ্জে-টেঞ্জে—

—দেখি।

নিরঞ্জন তার মোটরে বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু কেনই বা সে যাবে? তার হারবার কথা নয়, সংসারে যার টাকা আছে সে কখনো হারে না, তাকে হার কখনো শোভা পায় না বলে'। সে যাবে কোথায়? এ তার বাড়ি, তার সমস্ত। এতো যার টাকা, সে এ-কথা ভোলে কী করে'? ব্যবসা তুলে দিলে দেশ তাকে কী বলবে—ব্যবসাবিমুখ এই বাঙলা দেশ? অন্তত দেশের কাছে একটা কীর্ত্তি, একটা উদাহরণ খাড়া করে' রাখবার জন্যেও তো তার ব্যবসাটাকে সাজিয়ে রাখা চাই। আর এমন কিছু সে শ্মশান সাজিয়ে বসছে না। না, সব তাকে বহন করে' বেড়াতে হ'বে যান্ত্রিক বাধাবাধি কানুন। এর মাঝে বিরক্তি নেই, বিলাস নেই, শুধু অভ্যাসের আবর্ত্তনা, নিশ্ছিদ্র দুর্ভেদ্যতা। বিরক্ত হ'য়েই বা সে কী করতে পারে?

আর কিছু নাই হোক্, চাই শুধু ব্যক্তিত্বের বিস্ফারণ—অতিকায় একটা যন্ত্রের মানবিকতা।

যন্ত্র নিষ্ঠুর, যন্ত্র অপক্ষপাত, যন্ত্র চলেছে আপন নিয়মে, আপন যন্ত্রণায়।

অসুখের থেকে উঠে আদিত্যকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা কাঁকলাশের মতো। লিক্‌লিকে পায়ে এ-ঘর ও-ঘর, উপরে-নিচে এখন সে এক-আধটু চলা-ফিরা করতে পারছে। ঠেলে-বেরিয়ে-আসা মস্ত বড়ো রোগা চোখে সে সমস্ত আকাশটাকে যেন গিলে খাচ্ছে। যা কিছু দেখছে, তাই তার কাছে লাগছে অভূতপূর্ব্ব সুন্দর : যা কিছু দেখছে, তারই উপর তার লোভও হচ্ছে অভাবনীয়। তার যেমন বেড়ে গেছে দৃষ্টি, তেমনি তার গ্রাস। নড়বড়ে হাতে সে এটা ধরে, ওটা ভাঙে, সেটা খায়।

নিরঞ্জন তাকে দেখতে পারে না চোখের কোণায়। তাকে দেখলেই তার গায়ের রক্ত হ'য়ে আসে নীল, তার স্নায়ু-শিরায় সবুজ, সূক্ষ্ম কতোগুলি সাপ ওঠে কিল্‌বিল্ করে'।

—তোকে বলেছি না আমার ঘরে কখনো আসতে পারবি না? আবার ঘাঁটছিস আমার টেব্‌ল্? নিরঞ্জন খেঁকিয়ে উঠলো : যা বেরো, বেরো বলছি শিগ্‌গির।

হাতের জিনিসটা টেবিলের উপর ফেলে রেখে আদিত্য কুণ্ঠভরো মুখ করে' দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ নিরঞ্জনের কী মনে হ'লো, হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকলে : শোন্।

আদিত্য গেলো আরো ভয় পেয়ে।

নিরঞ্জন যথাসাধ্য চোখ দু'টো তরল ও মুখাভাস কোমল করে' তুললো। বল্‌লে,—কাছে আয়, একটা জিনিস দেবো।

আদিত্য কৌতূহলী হ'য়ে বল্‌লে,—কী জিনিস?

নিরঞ্জন টানা খুলে তাকে ছোট একটা ঘড়ি দেখালো।

—সত্যি দেবে?

—দেবো, নিরঞ্জন তার দিকে হাত দু'টো আরো ব্যাকুল করে' দিলো: যদি আমার একটা কথা শুনিস।

—কী কথা? আদিত্য এবার নির্ভয়ে এলো ঘেঁসে।

তাকে দুই হাঁটুর মধ্যে ঘন করে' জড়িয়ে ধরে' তার রোগা আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে-করতে নিরঞ্জন বল্‌লে,—তোর মা ও-গুলি কী পড়ছিলো রে?

আদিত্য ভীষণ অবাক হ'য়ে বল্‌লে,—কখন? কই কী পড়ছিলো?

—ঐ যে সকাল বেলা, তুই তোর মা'র কাছে বসে' খিদে পেয়েছে বলে' কাঁদছিলি, নিরঞ্জন বিশদ করে' তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো: তোর মা কী পড়ছিলো বলে' তোর কথায় কান দিচ্ছিলো না, আমি তখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম, আমার সাড়া পেয়ে তোর মা কেমন চম্‌কে উঠে কাপড়ের তলায় সেগুলো লুকিয়ে ফেললো,—সেই যে—

—হ্যাঁ, ব্যস্ততায় দীপ্ত হ'য়ে উঠে আদিত্য বল্‌লে,—সেই কতোগুলি ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ?

—হ্যাঁ, আমাকে সেগুলো এনে দিতে পারিস?

—এক্ষুনি। আমাকে ঘড়িটা ঠিক দেবে তো তা হ'লে? কী করে' দম দিতে হয় শিখিয়ে দেবে তো?

—দেবো। কিন্তু কোথায় সেগুলো আছে জানিস?

—কেন, মা'র বিছানার তলায়! ছাড়ো না, দেখ না একবার আমি ঠিক নিয়ে আসতে পারি কি না।

—কিন্তু তোর মা কোথায়? তোর মা যদি দেখে ফেলে?

—কী করে' দেখবে? মা তো এখন চানের ঘরে। ছাড়া পাবার জন্যে আদিত্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো: মা'র আসবার আগেই আমি নিয়ে আসছি।

নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে দিলে।

এক মিনিটের মধ্যে আদিত্য দুই হাতে এলোমেলো কতোগুলি কাগজ-পত্র কুড়িয়ে এনে নিরঞ্জনের সামনের টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলে: কই, আমার ঘড়ি?

নিরঞ্জন সে-কথায় কর্ণপাতও করলো না। চিঠিগুলি গুছিয়ে নিয়ে সে পড়তে বসলো একেক করে'।

সব ক্ষীরোদের চিঠি। তার একখানাও শ্রীপর্ণা ছিঁড়ে ফেলে নি, তারিখ মিলিয়ে পর-পর নম্বর দিয়ে সাজানো। চিঠির স্তূপের মাঝে ক্ষীরোদের ছোট একখানি আবাঁধা ফটো, যে-টুকুই সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো—এতোদিন পর্য্যন্ত সে যা তার বাক্সের তলায় সযত্নে রক্ষা করে' এসেছে।

আদিত্য চেঁচাতে লাগলো: আমার ঘড়ি! আমার ঘড়ি!

চিঠিগুলি নিরঞ্জন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। লাইন-কে-লাইন সবগুলি সে পড়বে, তবে ছাড়বে।

আদিত্য হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো: বা রে, আমার ঘড়ি কোথায়? তখন বললে ওগুলো এনে দিলে আমাকে ঘড়ি দেবে, এখন দিচ্ছ না কেন? বা রে, আমাকে আমার ঘড়ি দিয়ে দাও।

নিরঞ্জন তবু চিঠিগুলি পড়ে' চলেছে। তার আর কোনো বোধ নেই, কোনো ইন্দ্রিয় নেই, তার সমস্ত চেতনা তার চোখের দৃষ্টিতে হয়েছে কেন্দ্রীভূত।

এগিয়ে এসে নিজেই ঘড়িটা নেবার জন্যে আদিত্য এবার টেবিলের টানা ধরে' টান মারলো।

চিঠিগুলির উপর পড়লো এসে কা'র বাধা, মুহূর্তে নিরঞ্জনের মাথা ঘুরে গেলো, আদিত্যকে সে সবলে একটা ধাক্কা মারলে।

মেঝের উপর পড়ে' গিয়ে আদিত্য প্রবল গলায় চীৎকার করে' উঠলো; আর তার চীৎকার শুনে একপিঠ ভিজে চুল নিয়ে শ্রীপর্ণা এলো ছুটে।

মুহূর্তে শ্রীপর্ণার সমস্ত রক্ত রাগে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। তাড়াতাড়ি আদিত্যকে কোলের মধ্যে টেনে তুলে নিয়ে নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে মড়ার মতো ঠাণ্ডা অথচ ভয়ঙ্কর গলায় বল্‌লে,—একে কে মারলো?

নিরঞ্জন দেয়ালের মতো নিশ্চল। দেয়ালের মতো সাদা, স্পষ্ট গলায় বল্‌লে,—ঘরে তো আমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

কোলের উপর আদিত্যর মুখ চেপে ধরে' তার মাথায় ও পিঠে শ্রীপর্ণা হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ রুখে উঠলো: তুমি, তুমি রোগা, একফোঁটা এই ছেলেটাকে ধরে' মারলে? মোটে তিনদিন আজ ও ভাত খেয়েছে। কেন, কী করেছে ও শুনি?

—ও কিছু করতে যাবে কেন? নিরঞ্জন হঠাৎ শব্দ করে' হেসে উঠলো: আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি মেরেছি।

আদিত্য মা'র কোলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো : আমাকে আগে ঘড়ি দেবে বললে, পরে যেই চাইতে গিয়েছি, অমনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো।

—খবরদার, শ্রীপর্ণা চোখে-মুখে, শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় ধারালো হ'য়ে উঠলো : তুমি আমার ছেলের গায়ে কোনোদিন হাত তুলতে পারবে না।

—তা তো হ'লো। ছেলে নিয়ে অনেক ন্যাকামো করেছ, নিরঞ্জন চাপা, বাঁকা ঠোঁটে একটা কলুষিত ঠাট্টা করলে : কিন্তু এগুলো কী জিগ্‌গেস করতে পারি?

টেবিলের দিকে নজর পড়তে শ্রীপর্ণা সমস্ত শরীরে ধূসর, বিবর্ণ একটা ছায়া হ'য়ে গেলো। ছায়ারই মতো যেন শূন্যের উপর দিয়ে এগিয়ে এলো দুই পা। ছায়ায়িত, নীরক্ত গলায় বললে,—এ—এ-সব তুমি কোথায় পেলে?

—আমাকে আনতে বলে' দিলো, মা, আদিত্য ভয়ে-ভয়ে আরেকবার কেঁদে উঠলো : বললে ঘড়ি দেবে একটা। ঐখানে, ওটার মধ্যে ঘড়িটা আছে, মা। এখন দিচ্ছে না। নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে আদিত্য ভুরু বাঁকালো : মিথ্যে কথা বলে! ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকায়!

নিরঞ্জন প্রখর চোখে চিঠিগুলিকে প্রায় ছাই করে' দিয়ে বললে,—এগুলি কী? কা'র, কা'র চিঠি?

শ্রীপর্ণা সরে' দাঁড়ালো। বললে,—কা'র আবার! আমার।

—তা তো হ'লো। কিন্তু কে লিখেছে?

—নিচেই নাম আছে।

—নিচেই নাম আছে! খল্‌খল্‌ করে' নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সে-হাসি পাথরের টুকরোর মতো শ্রীপর্ণার গায়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো : নিচেই নাম আছে ! এ-চিঠিগুলি বুকের পাঁজরের মতো পুষে রেখেছিলে এতোদিন ?

শ্রীপর্ণা লজ্জার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে যেখানে মানুষের আর কোনো লজ্জা থাকে না। তাই তার গলার স্বর দৃঢ়তর হ'য়ে উঠলো : হ্যাঁ ; আমার চিঠি তুমি ফিরিয়ে দাও।

কাগজের সেই রাশীকৃত আবর্জ্জনা নিরঞ্জন দুই হাতে নিয়ে শ্রীপর্ণার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলো। বল্‌লে,—কিন্তু সেই কথা আমাকে এতোদিন বলো নি কেন ?

চিঠিগুলি কুড়িয়ে নিতে-নিতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—সেই কথা কি আমিও জানতুম ?

নিরঞ্জন আবার একটা কৃত্রিম, শুকনো হাসিতে ফেটে পড়লো।

মা চলে' যাচ্ছে দেখে আদিত্য আরেকবার, শেষবার চেষ্টা করলো। মিন্‌মিনে গলায় বল্‌লে,—আমার ঘড়ি ! আমার ঘড়ি !

সহসা টানাটা খুলে ফেলে নিরঞ্জন ঘড়িটা বা'র করলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আদিত্যর প্রসারিত, লোলুপ হাতের মধ্যে ঘড়িটা গুঁজে দিয়ে বল্‌লে,—এই নাও ঘড়ি। আমি কাউকে কোনোদিন ঠকাই না, যাকে যা যখন দেবো প্রতিজ্ঞা করি, তক্ষুনি তা তাকে দিয়ে দিই।

—আমিও তোমাকে ঠকাতে চাই নি। শ্রীপর্ণা বল্‌লে।

নিরঞ্জন হেসে উঠলো : সেইটেই তো তোমার বিশেষত্ব।

সামান্য একটা—কী বলবো, তবু তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলুম, শ্রীপর্ণা, সামান্য একটা—তারো তোমার চেয়ে বেশি সাধুতা আছে। সেও ঠকায়, কম-বেশি সব মেয়েই ঠকায়, কিন্তু, যাক্, তুমি যাও, কিন্তু—

নিরঞ্জন চেয়ারের উপর ভেঙে পড়লো।

সমস্তটা দিন যে কী করে' কাটলো নিরঞ্জনের কোনো খেয়াল নেই। বিকেলবেলা, নিচের আপিসে কাগজে-পত্রে রাশীভূত হ'য়ে সে চুপ করে' বসে' ছিলো, যখন সে যথার্থ অনুপাতে পৃথিবীকে প্রথম চেয়ে দেখছে।

তারই দরজার পাশে শোনা গেলো শ্রীপর্ণার গলা। আদিত্যকে সে কী বলছে, আদিত্য রাজি হচ্ছে না।

নিরঞ্জন কান খাড়া করে' রইলো।

আস্তে-আস্তে বিকেলের সেই ম্লানায়মান আলোয় শ্রীপর্ণা আদিত্যকে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

শ্রীপর্ণা বল্লে,—আমরা যাচ্ছি।

যেন এতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, নিরঞ্জন অনড় হ'য়ে বসে' রইলো চেয়ারে।

কিন্তু, এ কী—শ্রীপর্ণার এ কী পোষাক! সাড়িটা একদম সাদা, বিষাদের মতো সাদা, তার শেষ প্রান্তে সেই নরুন-পাড়টিও আর নেই, তার ফের ফিরে আসবার সেই ক্ষীণতম আশার চিহ্ন। হাত দু'টি রিক্ত, গলাটি করুণ, চোখের দৃষ্টিটা যতোদূর শুষ্ক, যতোদূর তীক্ষ্ণ করে' তাকানো যায়, তার কপালে রুক্ষ, নির্ম্মম ঔদাস্য। মোটা খদ্দরের সাদা একটা চাদর গায়ের উপর আবার